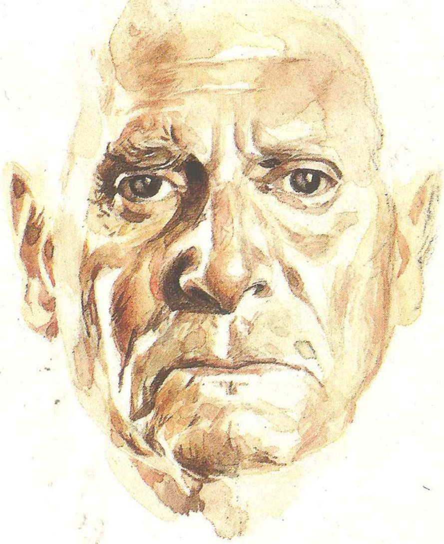

জন-যাজক

সমরেশ মজুমদার

THIS BOOK IS BROUGHT TO YOU BY ANI-LEN,YOUR BOOK FRIENDLY GREEN ALIEN

SEE AT THE END OF THIS BOOK FOR HIS OTHER RELEASES

লিফটের দরজাটা খুলে সন্তর্পণে যে লোকটি নামল তার ডান হাতের সুদৃশ্য ট্রেতে টি পট, পেয়ালা, ডিস, দুধ চিনির চীনেপাত্র, কাচের বাটিতে আলাদা করে মাখন এবং জেলির পাশে হালকা সেঁকা পাউরুটির ফালি তারের জাল দেওয়া ঢাকনার নিচে বন্দী। কয়েক পা হেঁটে বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু শব্দ তুলল সে। এই সকালেও লোকটির স্নান হয়ে গেছে। পরনের সাদা আলখাল্লার মত পোশাকে বিন্দুমাত্র ময়লা নেই। দ্বিতীয় বারের আওয়াজের পরেও ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে লোকটা ঈষৎ অসহিষ্ণু হল। তৃতীয়বারে সে একটু জোরেই আঘাত করল।

লোকটি ডান দিকে সরে গিয়ে একটা টুলের ওপর ট্রে রেখে পকেট থেকে চাবির তোড়া বের করল। তারপর নম্বর মিলিয়ে চাবি বেছে দরজার গর্তে ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই সেটা ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। পুরো না খুলে লোকটা থেমে গেল। তারপর খুব বিনয় মিশিয়ে উচ্চারণ করল, 'ছোটে মহারাজ!'

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। লোকটা দরজাটা খুলে দিল। তিনটে ঘর। কোথাও ছোটে মহারাজের পাত্তা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে আতঙ্কিত মুখে ছুটে গেল টেলিফোনের দিকে। বোতাম টিপতেই নিচের রিসেপশন থেকে সাড়া মিলল। লোকটা তড়িঘড়ি জানাল ছোটে মহারাজ তাঁর ফ্ল্যাটে নেই। যে শুনল সে চিৎকার করে উঠল।

এই বাড়ির সিঁড়ি দোতলা পর্যন্ত। তিনতলাটা পুরো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ওই তলায় লিফটের দরজা কালেভদ্রে খোলে। চারতলার ফ্ল্যাটের সামনে মিনিট চারেকের মধ্যে চারজন চিন্তিত লোক একত্রিত হল। এদের ওপর নির্দেশ আছে ছোটে মহারাজের দেখা-শোনা করার। ছোটে মহারাজ যখন কলেজে যান তখন এদের একজন গাড়িতে সঙ্গে থাকে। তিনি কলেজ থেকে না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। এ বাড়িতে ছোটে মহারাজের কোন বন্ধুবান্ধবের প্রবেশ নিষেধ। সেই ছোটে মহারাজ সিঁড়িবিহীন চারতলা থেকে উধাও হয়ে গেলে বড় বা মেজ মহারাজের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? বাবা বলেছেন, 'তোমার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব তোমার। দায়িত্বহীনতা কোন ক্ষমা পেতে পারে না।' শূন্য ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে চারজন পরস্পরকে দায়ী করতে লাগল। একজন গতরাতে ছোটে মহারাজের খাবার দিয়ে যাওয়ার পর ঘুমাবার আগে নামগানের ক্যাসেটটা বন্ধ করে যায়নি। আর একজন সকাল বেলায় সেই ক্যাসেটটা চালিয়ে দিতে ওপরে ওঠেনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যে ভয়ঙ্কর বিপদ সামনে থাবা তুলেছে তা

থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করতে ওরা শেষপর্যন্ত একত্রিত হল। ছোটে মহারাজকে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ছোটে মহারাজের যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না চারজনেরই। কিন্তু ওরা ভেবে পাচ্ছিল না ছোটে মহারাজ এই সিঁড়ি বিহীন চারতলা থেকে বেরিয়ে গেল কি করে। রাত্রের খাওয়া শেষ হবার পরেই লিফটের দরজায় চাবি পড়ে যায়। একমাত্র চারতলা থেকে লাফিয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ওরা আবার ঘরগুলো দেখল এবং নিঃসন্দেহ হল ছোটে মহারাজ ধারেকাছে নেই। শেষপর্যন্ত টয়লেটের পেছনে এসে ওরা পালাবার কৌশলটা আবিষ্কার করল। টয়লেটের জানলা থেকে গোটা আটেক ধুতিকে গিঁট পাকিয়ে দড়ি বানিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাপড়টাকে ওপরে তুলে শিউরে উঠল চারজন। মেজ মহারাজ এই দামী বস্ত্র গত সপ্তাহে এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর যে কোন একটা গিঁট আলগা হয়ে গেলে— ! চারজন পরস্পরের দিকে তাকাল। এখনই খবরটা তিনু মহারাজকে জানানো দরকার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বড় মহারাজের সঙ্গে। বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার অধিকার কারো নেই। বড় মহারাজ জানলেই ছোটে মহারাজ যদি বেঁচে থাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

ওরা লিফটে চেপে নিচে নেমে এল। নিচের বিশাল হলঘরে তখন কয়েকজন শিষ্য বাবার ছবির সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন। ওরা চারজন বাবাকে প্রণাম করল। প্রায় দেওয়াল জোড়া ছবির ওই মুখখানি এমন জীবন্ত যে তাকালেই মনে হয় তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। আসলে বাবা তা পানও। মনের কথা যিনি বলে দিতে পারেন তিনিই অন্তর্যামী। বাবার ক্যাসেট প্রতি সন্ধ্যায় এখানে বাজানো হয়। অনেক সারগর্ভ কথার পরে সবশেষে বাবা বলে থাকেন, 'তোরা যা করিস, কাছে কিংবা দূরে যেখানেই থাকিস, আমার দুটো চোখ তোদের পেছনে সবসময় আছে। তোরা দেখতে পাস না, কারণ দেখার জন্যে মুখ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোদের পেছনে চলে যাই যে।' চারটি লোক একই সঙ্গে মনে মনে ককিয়ে উঠল, 'বাবা আমি কি করব ?'

এখন দুপুর। সর্বত্র নির্জনতা। মেজ মহারাজ তার কক্ষে বসে আশ্রমসংবাদের সম্পাদকীয় কলম লিখছিলেন। প্রতি মাসে প্রায় তিন কোটি শিষ্যের জন্যে এই আশ্রমসংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের যে কোন কাগজ তো বটেই,ভারতবর্ষের সব কাগজের চেয়ে আশ্রমসংবাদের প্রচার সংখ্যা বেশী। সেদিন কে যেন বলছিল কলকাতা থেকে যত বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক বের হয় তাদের মিলিত সংখ্যার সঙ্গে সাপ্তাহিক পাক্ষিক এবং মাসিক যোগ করলেও এই প্রচার সংখ্যার অনেক নিচে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা প্রতিদিন অনুনয় বিনয় করছে তাদের বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য। কিন্তু বাবার নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারো নেই। পঞ্চাশ লক্ষ শিষ্য নগদ আট টাকা খরচ করে এই কাগজটি সংগ্রহ করে থাকে। এতে শুধু বাবার বাণী এবং তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কথাই ছাপা হয় না, আশ্রমে যেসব জনহিতকর কাজকর্ম করা হয় সেইসব খবরও ছাপা হয়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্যে সৎ থাকার নির্দেশ

দেওয়া হয়। এই সংখ্যার মলাটে বাবার বাণী স্থান পেয়েছে, 'গৃহস্থের কর্তব্য পূর্ণাঙ্গ। যেখানেই নামগান, আমার কীর্তন সেখানেই যাবে। আমি মানে হাত পা-ওয়ালা মানুষ নই, আমি মানে সত্য।'

আশ্রমসংবাদ পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব মেজ মহারাজের ওপর ন্যস্ত। প্রকাশের পর প্রথম কপিটি নিয়ে তাঁকে যেতে হয় বাবার কাছে বড় মহারাজের অনুমতি নিয়ে। বাবা স্পর্শের মাধ্যমে পত্রিকাটিকে আশীর্বাদধন্য যতক্ষণ না করছেন ততক্ষণ প্রচারের আদেশ দেওয়া হয় না। মেজ মহারাজ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সম্পাদকীয় লিখছিলেন। সম্প্রতি আর একটি ধর্মীয় সংস্থা থেকে কিছু অপপ্রচার করা হয়েছে। তার জবাব নয় কিন্তু তাকে উপেক্ষা করার জন্যে শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি আহ্বান করা কর্তব্য। মেজ মহারাজ লিখলেন, 'তোমার গুরু সবার গুরু। কিন্তু সবার গুরু তোমার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন যখন গুরু বলে অভিহিত সেই প্রধান পুরুষেরা তোমার গুরুকেই পিতা বলে স্বীকার করে নেবেন। মনে রেখ শুধু প্রজনন করলেই পিতা হওয়া যায় না। এক দঙ্গল বানরের মধ্যে যেমন পিতা ও পুত্রকে আলাদা চিহ্নিত করা অসম্ভব।' এবং এই সময়েই অপারেটার টেলিফোনে জানাল কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে। ঈষৎ উষ্ণ গলায় মেজ মহারাজ বলেন, 'তোমার ওপর নির্দেশ ছিল এইসময় আমাকে বিরক্ত না করার। এই মুহূর্তে কলকাতায় এমন কোন মূল্যবান মানুষ নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি। দ্বিতীয়বার আর বিরক্ত করো না।'

অপারেটার প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তিনু মহারাজ জোর করছেন যে!'

মেজ মহারাজ একমুহূর্ত নীরব হলেন। তিনুর ওপর দায়িত্ব আছে বেশ কয়েকটি বিষয়ে। তার অন্যতম হল আশ্রমের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা দেখাশোনা করা। কিন্তু ওই ব্যাপারে কোন সমস্যা হয়ে থাকলে তিনু বড় মহারাজকেই জানাবে। ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে তিনি লাইনটিকে সংযুক্ত করতে বললেন। পরক্ষণেই তিনুর গলা শোনা গেল, 'জয় বাবা! আমি তিনু, নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি!'

মেজ মহারাজ বললেন, 'তিনু, তিন কোটি শিষ্যের মধ্যে আমরা দু'জন ছাড়া তোমরা মাত্র দশ জন মহারাজ হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলে। কিন্তু মনে হচ্ছে সেই যোগ্যতা ঠিক জরিপ করা হয়নি। তিরিশ বছর ধরে বাবার স্নেহ লাভের পর তুমি বলছ আমার শরণাপন্ন হয়েছ? তুমি কি জানো না আমরা মাত্র একজনেরই শরণ নিতে পারি?'

তিনু মহারাজের গলা কেঁপে উঠল, 'ক্ষমা করুন। আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। বাবাকে অশ্রদ্ধা করার আগে যেন আমার জিভ খসে পড়ে।'

'কি কারণে তুমি অস্থির হয়েছ?'

'মেজ মহারাজ—।' তিনু মহারাজের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

'সময় নষ্ট করো না, আমার সম্পাদকীয় লেখা শেষ হয়নি।'

'ছোটে মহারাজ, ছোটে মহারাজকে পাওয়া যাচ্ছে না।' তিনু মহারাজ প্রায় কেঁদে ফেললেন।

'কি বললে? হা বাবা!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মেজ মহারাজ।

‘এইমাত্র সেবকরা সংবাদ দিয়েছে আমাকে। ছোটে মহারাজ কাল রাত্রে কাউকে না জানিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি সম্ভাব্য সব জায়গায় খবর নিচ্ছি।’

‘কি করে বুঝলে সে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাকে তো ইলোপ করা হতে পারে।’

‘না। আপনি যে বস্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন তাই পাকিয়ে দড়ি বেঁধে তিনি নেমে গিয়েছেন।’

মেজ মহারাজ এবার উত্তপ্ত হলেন, ‘কি প্রলাপ বকছ ? যে ছেলে কখনও কায়িক পরিশ্রম করেনি সে চারতলা থেকে দড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারে ?’

তিনু মহারাজ বললেন, ‘আমি নিজের চোখে সেই দড়ি দেখে এসেছি। লিফট বন্ধ ছিল। কোন মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই দড়ি বেয়ে নামানো যায় না। আমি দু জন সেবককে বরখাস্ত করেছি।’

‘তারা কোথায় ?’

‘এখানেই আছে।’

‘ওদের ঘরেই আটক করে রাখ। আমি চাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছোটেকে তুমি খুঁজে বের করবে। আর এই খবরটা যেন পুলিশ না জানতে পারে। দু ঘণ্টা পর পর ফোন কর।’ টেলিফোন নামিয়ে রেখেই তিনি আবার বোতাম টিপলেন। অপারেটরের গলার স্বর পেয়ে বললেন, ‘এইমাত্র তিনুর সঙ্গে আমার যে কথা হল তার একটি শব্দও যদি প্রকাশিত হয় তাহলে—।’ লাইনটা কেটে দিলেন তিনি। শাস্তির পরিমাপ উচ্চারণ করার অধিকার একমাত্র বাবার।

কিন্তু সম্পাদকীয় লেখা হল না তাঁর। ছোটে মহারাজ নিরুদ্দিষ্ট। এ অবস্থায় তিনি স্থির চিত্তে অন্য কাজ করতে পারেন না। ধীরে ধীরে কক্ষের বাইরে এলেন। চার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই আশ্রমের ঠিক মাঝখানে উপাসনাগৃহ। উপাসনাগৃহের গায়ে তিনতলা আনন্দভবনে বাবা বাস করেন। তারই কাছাকাছি ভক্তিধামে বড় মহারাজ আর এক কিলোমিটার দূরে এই বিনয়ধামে মেজ মহারাজের বাসস্থান। নিচে ভক্ত এবং সেবকরা গল্প করছিল। তাঁকে দেখামাত্র ওরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করল। এখানে একমাত্র বাবা ছাড়া কেউ প্রণামের অধিকারী নন, এবং বাবার আদেশানুযায়ী বড় মহারাজ ইদানিং নমস্কার পাচ্ছেন। মেজ মহারাজ শান্ত স্বরে উচ্চারণ করলেন, ‘ভক্তিধামে যাব।’

সঙ্গে সঙ্গে নীল মারুতি এসে গেল। একজন সেবক দরজা খুলে তাঁর প্রবেশের সুবিধে করে দিলেন। পেছনের আসনে হেলান দিয়ে মেজ মহারাজ বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন। হয়তো দড়ি পাকানো কাপড়টি ভাঁওতা হতে পারে। হয়তো দুই সেবককে ষড়যন্ত্রের সঙ্গী করে ছোটে মহারাজকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে—! ওরা কি ছোটে মহারাজের জীবনহানি করতে পারে ? মেজ মহারাজের মুখে একটা কষ্টের ছায়া নামল। তিনি দেখলেন পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে। আশ্রমে আমিষের কোন স্থান নেই। কিন্তু পুকুর থাকলে মাছ থাকবেই। দু বছর অন্তর সেই মাছ বাইরে বিক্রী করে দেওয়া হয়। এই এলাকার ভেতরে যেমন ট্র্যাক্টরে জমি চাষ করে, ফসল ফলানো হয় তেমনি নানারকম কারখানায় শিষ্যরা জিনিসপত্র উৎপাদন করে থাকেন। বিজ্ঞানভবনের পাশ দিয়ে

যাওয়ার সময় কয়েকজন শিষ্য তাঁর গাড়ি দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মস্তক নত করল। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার মন নেই আজ। ছোটে মহারাজের মুখ মনে পড়ছিল বারে বারে। তাঁদের পরিবারে ওই একমাত্র সন্তান যার গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের মত, নাক চোখ চিবুক ঠিক গৌরাঙ্গ বসানো। বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওকে গৌর নামেই ডাকা হত। উপনয়নের পর বাবা আদর করে ছোটে মহারাজ নামে ডাকলেন। কিন্তু যেহেতু দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি তাই ওকে পূর্ণ মহারাজ বলা যায় না। সেই ছেলে যদি মারা গিয়ে থাকে— ! মেজ মহারাজ গাড়ি থামাতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ভক্তিধামের সামনে শিষ্য ও ভক্তদের ভিড় বেশী।

আনন্দভবনের সামনে অযাচিত ভিড় করা নিষেধ। সেবকরা এ ব্যাপারে খুব কঠোর। ভক্ত এবং শিষ্যরা যাতে মনে আঘাত না পান তাই তাঁদের বড় মহারাজের ভক্তিধামের সামনে জমায়েত হতে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ নিয়মিত এখানে বাবাদর্শনে এসে থাকেন। অবশ্য দর্শন পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার।

মেজ মহারাজ গাড়ি থেকে নামতেই সেবকদলের চারজন এগিয়ে এসেছিল। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তারা তাঁকে নিয়ে গেল ভিতরে। উপস্থিত দর্শকরা মেজ মহারাজের পরিচয় জানতে পারামাত্র গুঞ্জন করে উঠল। মূল গেট থেকে একটা চাতাল পেরিয়ে ভক্তিধামের সিঁড়িতে পা রাখতে হয়। সেই চাতালে সেবকদলের কয়েকজন চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরায় থাকে। তাদের ডিঙিয়ে মেজ মহারাজ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন। তিনজন প্রধানা সেবিকা দরজার বাইরে অপেক্ষায় রয়েছেন। এই তিনজন নিয়ন্ত্রিত হন পূজনীয়া বউদিমণির ইচ্ছায়। মেজ মহারাজ দরজায় পৌঁছানোমাত্র এদের একজন ছুটে গেল ওপাশে। সম্ভবত পূজনীয়া বউদিমণিকে খবর দিতে। দ্বিতীয়জন নতমস্তকে জানাল, 'বড় মহারাজ একটু আগে নিদ্রায় গিয়েছেন।'

'আজ এই ব্যতিক্রমের কারণ ?'

দ্বিতীয়া উত্তর দিল, 'আনন্দভবন থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল।'

মেজ মহারাজ ফিরে দাঁড়ালেন। বড় মহারাজের দিবানিদ্রা বিলাসের কথা সবাই জানে। দুপুরে দু ঘণ্টা এবং মধ্যরাতে দু ঘণ্টা তিনি নিদ্রার জন্যে ব্যয় করলেও দুপুরেরটিকে তিনি বিলাস বলেই অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'শরীরের জন্যে নিদ্রার প্রয়োজন, নিদ্রার জন্যে শরীর নয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিশীথে শরীরকে নিদ্রামগ্ন করলে সমস্ত ক্লান্তির ময়লা সাফ হয়ে যায়। সেই ময়লা সাফ করতে কারো আট ঘণ্টা প্রয়োজন, কারোর বা দু ঘণ্টাই যথেষ্ট। তাই দ্বিপ্রহরে নিদ্রামগ্ন হওয়া বিলাস ছাড়া কিছুই নয়।'

দু'বছর আগে বড় মহারাজের বুকে যখন যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই চিকিৎসকের নির্দেশে এই 'বিলাসের' ব্যবস্থা। কিন্তু ওঁকে না জানিয়ে বাবার কাছে যাওয়াও অসম্ভব। তিনি বড় মহারাজের মতামত জানতেই চাইবেন।

মেজ মহারাজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তেই পূজনীয়া বউদিমণি পাশের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। আশ্রমবাসিনীর পরিচয় তাঁর বেশবাসেও। ঘোমটা নেমে এসেছে চোখের ওপর। তিনি বললেন, 'উনি খুব ক্লান্ত। অবশ্য প্রয়োজনটা

আপনি বুঝবেন।'

'হ্যাঁ। সেটা বুঝেছি বলেই আসতে বাধ্য হয়েছি। দরজা খুলতে আদেশ দিন।'

পূজনীয়া বউদিমণির ইঙ্গিতে সেবিকারা দরজা খুলে দিতেই মেজ মহারাজ ভেতরে ঢুকলেন। প্রথম কক্ষ সর্বদা ধূপধুনায় আচ্ছন্ন থাকে। দ্বিতীয় কক্ষে তার ঘ্রাণ সামান্য পাওয়া যায়। বড় মহারাজ তৃতীয় কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পালঙ্কে নিদ্রামগ্ন। মেজ মহারাজ তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই কাকাতুয়া চিৎকার করে উঠল, 'জয় বাবা'।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললেন বড় মহারাজ। অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন তিনি। মেজ মহারাজ আজ বড় মহারাজের জুলপিতে সাদা ছোপ দেখতে পেলেন। সম্ভবত নিয়মিত কলপ করা হয়নি কোন কারণে। তিনি দুটো হাত যুক্ত করে নমস্কার করলেন, 'জয় বাবা'। সঙ্গে সঙ্গে কাকাতুয়া দ্বিতীয়বার বলে উঠল, 'জয় বাবা'। বড় মহারাজ তার দিকে তাকিয়ে খুব প্রশ্রয়ের গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আঙুর খাবি ? আত্মারাম ?'

পাখিটা জবাব দিল না। দাঁড়ে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ পাকিয়ে মেজ মহারাজকে দেখতে লাগল। সেটা লক্ষ করে বড় মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মনে দুশ্চিন্তা আছে মেজ ?'

মেজ মহারাজ চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে অনুমান করলেন ?'

'আত্মারামকে দেখে। সরল হৃদয় বা দুশ্চিন্তাবিহীন মানুষের সান্নিধ্যে ও আমার প্রশ্নের জবাব দেয়। দেখলে তো ও ওর প্রিয় খাদ্য আঙুরও প্রত্যাখ্যান করল। আত্মারাম মানুষকে বুঝতে পারে, বোঝাতে পারে না পাখি বলে, বুঝে নিতে হয়।' কথাগুলো বলে মৃদু হাসলেন বড় মহারাজ।'তাছাড়া আমার বিলাসের সময় তুমি নিশ্চয়ই সুচিন্তা নিয়ে প্রবেশ করোনি !'

মেজ মহারাজ আত্মারামের দিকে আর একবার তাকালেন। পাখিটার বিশেষত্বের গল্প তাঁর কানেও গিয়েছে। কিন্তু ওর কৃতিত্ব যে এতখানি তা জানা ছিল না। তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। কলকাতা থেকে তিনু টেলিফোন করেছিল— ।'

'কোন তিনু ? মহারাজ ?' বড় মহারাজ কথার মাঝখানে বাধা দিলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনু—' কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মেজ মহারাজ ইঙ্গিত দেখে।

-'দাঁড়াও। আগে তোমাকে জানিয়ে দিই তারপর তোমারটা শুনব। আজকাল স্মৃতি সবসময় সক্রিয় থাকে না। তিনুকে বলো শ্যামবাজারের অধীরচন্দ্র মল্লিকের বসতবাড়িটি অবিলম্বে অধিকার করতে। সে ওই বাড়িটি বাবার নামে উৎসর্গ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল মৃত্যুর আগে। এই মর্মে তিনখানা পত্র দিয়েছে আমাকে। আজ সকালেই তার মারা যাওয়ার খবর পেলাম। অধীরের কোন উইল নেই। অতএব ওই পত্রাবলীই যথেষ্ট।'

'কিন্তু ডিড না করে গেলে আইন মানবে ?'

'তোমার আমার সে-চিন্তা নয়। কি বলছিলে যেন ?'

মেজ মহারাজ আড়চোখে বড় মহারাজকে দেখে নিলেন, 'তিনু টেলিফোনে

আমাকে একটা খারাপ খবর দিয়েছে। গতরাত্রে কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে ছোটে মহারাজ উধাও হয়ে গেছে।'

'উধাও হয়ে গেছে মানে ?' বড় মহারাজ ধীরে ধীরে সোজা হলেন।

'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তিনু বলছে সে কাপড় দড়ির মত পাকিয়ে চারতলা থেকে নেমে গিয়েছে। ব্যাপারটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। খবরটা বাবাকে জানানো দরকার।'

'তোমার কি ধারণা ?' বড় মহারাজের মুখ শক্ত।

'বুঝতে পারছি না। যদি শত্রুপক্ষ আঘাত হানতে চায়—।'

'সেবকরা কি করছিল ? ওঃ। আমি এই ভয়ই করছিলাম। ছোটের সম্পর্কে আমার কানে কিছু উড়ো কথা ভেসে এসেছে। গতবার কলেজ ছুটির সময়েও সে এখানে আসেনি। মহিলাসংক্রান্ত ব্যাপারে সে যে এতখানি আত্মভ্রষ্ট হবে তা আমি ভাবতে পারছি না।'

'কিন্তু শত্রুপক্ষরা তো পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আপনার কি মনে হয় না এক্ষেত্রে তারা একটা ভূমিকা নিতে পারে ?' মেজ মহারাজ নিজস্ব সন্দেহের কথা বললেন।

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু তিনুকে কি বলেছ ব্যাপারটা গোপন রাখতে ?'

মেজ মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে।'

'ওই বাড়ির সেবকরা যেন বাইরে না যায়। কোন ভক্ত বা শিষ্য এই খবর জানুক, তা আমি চাই না। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি তৈরী হয়ে আসছি।' বড় মহারাজ শব্দ করতেই দু'জন সেবিকা ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বিশাল সাদা আলখাল্লা বাঁধতে বাঁধতে তিনি তাদের পিছু পিছু অন্তর্হিত হলেন। চোখ বন্ধ করেছিলেন মেজ মহারাজ। তিন কোটি শিষ্য যে বাবার, তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্ম এক। কিন্তু তার ব্যাখ্যা বোধ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সনাতননাথ অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তিনি দাবী করেন তাঁর শিষ্যসংখ্যা দশ লক্ষ। কিন্তু প্রলোভন দেখিয়ে নাকি সেই শিষ্যদের এই আশ্রমের অনুকূলে নিয়ে আসা হচ্ছে। এ যে নিতান্তই অপপ্রচার তা শিশুরাও বুঝবে। কিন্তু আরও কিছু গুরু সনাতননাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। একটা বিরুদ্ধ জনমত গঠনের চেষ্টাও সমানে চলছে। আজ দুপুরে তিনি ভেবেছিলেন ব্যাপারটা উপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু ছোটে মহারাজের ঘটনাটা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

'চুমু খাও। দুটো চুমু। তিনটে চুমু।'

ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন মেজ মহারাজ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন আত্মারাম নিরীহ মুখে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হওয়ামাত্র পাখিটা বলে উঠল, 'জয়বাবা।' ক্রুদ্ধ মেজ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বললি হতভাগা ?'

আর এইসময় বড় মহারাজ পোশাক পাল্টে কক্ষে প্রবেশ করলেন। মেজ'র দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত, 'কি হল ? উত্তেজনা কিসের ?'

'না। পাখিটা—মানে—আত্মারাম অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল।'

'অশ্লীল ? আত্মারাম ?' ধমকে উঠলেন বড় মহারাজ।

'জয় বাবা।' আত্মারাম নিরীহ স্বরে বলল।

বড় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করেছে মেজ ?'

মেজ মহারাজ বললেন, 'ও নিশ্চয়ই কোন পাপাচারীর কাছে কথা শিখছে। এই আশ্রমে চুম্বনের কোন জায়গা নেই। তবু আত্মারাম দুটো তিনটে চুমুর কথা বলছে।'

শোনামাত্র হো হো করে হেসে উঠলেন বড় মহারাজ। তারপর বললেন, 'তুমি নিতান্ত জাগতিক চোখে ওর কথা বিচার করলে হে। চুম্বন মানে মিলন। ও নিশ্চয়ই একটা চুম্বনের কথা বলেনি। একটা চুম্বন হল সুখরূপ মিলনাস্বাদন। দুটো চুম্বন হল আনন্দস্বরূপ আর তিনটে চুম্বন হল সত্যস্বরূপ। এই দুটোই হল পরমপিতার মূল্যায়ন। চল, অকারণে সময় ব্যয় হচ্ছে।'

বড় মহারাজের সঙ্গে ভক্তিধাম থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল। শতাধিক শিষ্য নমস্কার করছে, আশীর্বাদ চাইছে। মনে মনে আজ একধরনের তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল। বড় মহারাজ যেন অকারণে শিষ্যদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যা বাবার পক্ষে মানায়, তা ওঁর এই মুহূর্তে করা উচিত নয়। দূরত্ব বেশি না হলেও বড় মহারাজ তাঁর কনটেসা গাড়িতে উঠলেন। ওঠার আগে তাঁকে নির্দেশ দিলেন সহযাত্রী হতে। গাড়িতে উঠে বসামাত্র বড় মহারাজ বললেন, 'বাবাকে সকালে খুব চিন্তিত দেখেছি। সম্ভবত অধীরচন্দ্রের মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।'

মেজ মহারাজ মাথা নত করলেন। কখনও কখনও প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুর আগের মুহূর্তে বাবা সেটা অনুভব করেন। সেই মুহূর্তে তিনি যোগবলে শিষ্যের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। শিষ্য যাতে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে পরমপিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এই কাজের ফলে তাঁর শরীরে প্রচুর ক্লান্তি আসে। সেই সময়টা তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে থাকেন। এটা সমাধিস্থ হওয়ার ঘটনা নয়। যোগের মাধ্যমে এই যাতায়াতের প্রক্রিয়া বাবা বড় মহারাজকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। আজ ব্যাপারটা মনে পড়তেই মন এলোমেলো হয়ে গেল।

গাড়ি প্রধান ফটক পেরিয়ে যখন আনন্দভবনে প্রবেশ করছে তখন সেবকরা যুক্ত করে দাঁড়িয়ে। গতমাস থেকেই এখানে সেবকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। মেজ মহারাজ ঘড়ি দেখলেন। সান্ধ্যারাধনার এখনও দেরি রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে বড় মহারাজ প্রধান সেবককে বললেন, 'বাবার অনুমতি নিয়ে এস। অসময়ে সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়েছে।'

বড় সেবক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। পাশের উপসনামন্দিরে মৃদুস্বরে ঘণ্টা বাজছে। চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে শিষ্যরা ওই ঘণ্টা বাজিয়ে থাকেন। ওই সুশব্দ তরঙ্গ একটি পবিত্র আবহাওয়া তৈরি করে। প্রধান সেবক ফিরে এসে হাতজোড় করে নতমস্তকে বলল, 'বাবা অবিলম্বে আপনাদের যেতে আদেশ করলেন।' পথ চেনা। অজস্রবার যাতায়াত হয়েছে। তবু অসময়ে এলে এই শিষ্টাচার প্রয়োজন হয়। একতলায় লিফটের দরজা খুলে দিল এক সেবক। স্বয়ংক্রিয় সেই লিফটে উঠলেন দুই মহারাজ। তিনতলায় উঠে সেটি আপনি উন্মুক্ত হলে শীতল বাতাসের স্পর্শ এল যেন। যদিও মেজ মহারাজ জানেন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত তিনতলায় কোন বাতাস বইতে পারে না তবু অনুভূতি প্রথমে সেইরকমই হয়।

সেবিকারা এখন নতমস্তকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের উপেক্ষা করে দুই মহারাজ ধীরে ধীরে বাবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিশাল আরশির সামনে একটি বেতের ডেকচেয়ারে বাবা শায়িত। তাঁর শরীর সাদা আলখাল্লায় আবৃত। দু'জন সেবিকা তাঁর পদযুগলে চন্দনের রেণু মাখিয়ে দিচ্ছে। বাবার চোখ বন্ধ। সাদা দাড়িতে বাম হাত আলস্যভরে রাখা।

মেজ মহারাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন। বড় মহারাজ এগিয়ে গিয়ে নতজানু হলেন। বাবার চোখ তখনও বন্ধ। সেই অবস্থায় বড় মহারাজ বললেন, 'বাবা, আমরা বিপদগ্রস্ত!'

বাবা তখনও চোখ খুললেন না। এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে কোন শব্দ নেই। বড় মহারাজ যে কথা উচ্চারণ করলেন, তা বাবার কানে গিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। তাঁর বাম হাত তখন সাদা দাড়িতে মোলায়েম আদর রাখছে। সেই অবস্থায় তিনি আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার পাখিটির নাম কি যেন?'

'আজ্ঞে আত্মারাম।' বড় মহারাজ নিচু গলায় জবাব দিলেন।

'আত্মারাম। রাম মানেই আরাম। আত্মার আরাম। রাম না থাকলেই ব্যারাম। বড়, তুমি তোমার আত্মারামকে একবার এখানে নিয়ে এসো তো। শুনেছি, সে খুব কথা বলে।'

'এখনই নিয়ে আসব বাবা?' বড় মহারাজ তড়িঘড়ি বলে উঠলেন।

'না। এখন আমি স্নান করব।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন বাবা। সেবিকারা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। দ্বিতীয় দরজার দিকে যেতে যেতে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই মেজ। সম্পাদকীয়তে লিখবে অন্ধকারের কোন ছায়া নেই কারণ সে নিজেই ছায়া। সনাতননাথের শিষ্যরা যদি আলো ও অন্ধকারের ভেদাভেদ বুঝতে পারে সেটা তাদের কৃতিত্ব। তবে সনাতননাথের নাম উল্লেখ করবে না। তোমার কাগজ কি দিন তিনেকের মধ্যে প্রকাশিত হবে?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে বাবা কক্ষান্তরে চলে গেলেন। জবাব দিতে গেলে তাঁকে অনুসরণ করতেই হবে। বড় এবং মেজ মহারাজ সেই কক্ষটি পেরিয়ে একটি ঈষৎ উষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করে বাবার দর্শন পেলেন। এখানে অন্য কেউ উপস্থিত নেই। কক্ষের মাঝখানে দশ বাই পাঁচ ফুট একটি বাথটব। তাতে গোলাপের গন্ধ দেওয়া নির্মল জল টলটল করছে। বাবার শরীর দীর্ঘ। তিনি দুটো হাত ডানার মত সঞ্চালন করতেই আলখাল্লাটি মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর বয়স্কশরীর এখন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ধীরে ধীরে তিনি সেই বাথটবে প্রবেশ করলেন। দুই মহারাজ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাথটবে শরীর ডুবিয়ে বাবা স্থির হতেই মেজ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'দিন তিনেকের মধ্যে প্রকাশ যাতে হয় আমি সেই চেষ্টাই করব।'

'মেজ, হংসোপনিষদে নাদ কয়রকমের আছে?'

'আজ্ঞে দশ রকমের।'

'অষ্টম নাদটি কি?'

'মৃদঙ্গ নাদ।'

'চমৎকার। মৃদঙ্গের বোলের মত উত্তম বাক্‌শক্তি যেন হয়। কিন্তু এসব তো

ব্যক্তনাদ। জাগতিক। কিন্তু অব্যক্ত নাদ ? সেটা শুনতে চেষ্টা করো। বিন্দুনাদে পৌঁছে যাও। তৈলধারামিচ্ছিন্নং, দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ। বিন্দুনাদ কালাতীতং যস্তং বেদ স বেদচীত ॥' হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিয়ে শরীর জলে রেখে মাথার ভেজা চুল শুকনো করতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এবং তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড়, আমাদের বিপদ কোন ক্ষেত্রে ?'

'এখনই ক্ষেত্রটা বুঝতে পারছি না।' বড় মহারাজ এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রসঙ্গে আসতে পারলেন, 'ছোটে মহারাজ চারতলা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন।'

'কোথায় ?' হাতটা একবার থেমে আবার সক্রিয় হল বাবার।

'সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তিনু মহারাজ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।'

'কোন বান্ধবীর সঙ্গে সে মিশতো ?'

'কলেজে দু-একজন ছিল, কিন্তু তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয় না।'

'আমার সন্তানের স্বরূপ অত সহজে চেনা যায় না।'

বড় মহারাজ খোঁচাটা হজম করলেন, 'মেজ বলছিল শত্রুপক্ষের হাত থাকা অসম্ভব নয়।'

বাবা নিরাবরণ অবস্থায় বাথটব থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে দেওয়ালে ঝোলানো আর একটি আলখাল্লায় নিজেকে আবৃত করলেন, 'অসম্ভব নয়। খবরটা কজন জানে ?'

'তিনু কলকাতার কজনকে জানিয়েছে জানি না, কিন্তু এখানে অপারেটার ছাড়া শুধু আমরাই জানি। তিনু অবশ্য বলেছে সমস্ত গোপনীয়তা থাকবে।' বড় মহারাজ জানালেন। ধীরে ধীরে বাবা ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁরা দুজন আবার পিছু নিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বাবা বললেন, 'সুধাময়কে টেলিফোনে ধর।'

বড় মহারাজ দ্রুত টেলিফোনের কাছে চলে গেলেন। এস· টি· ডি-তে কলকাতা পেতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। সুধাময় সেন অফিসে ছিলেন। তাঁকে পাওয়া গেলে বাবা বললেন, 'ওকে বল, এখনই তিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করে ছোটেকে খুঁজে বের করতে। আমি ছ' ঘণ্টা সময় দিলাম।' বড় মহারাজ সেকথা সুধাময় সেনকে জানিয়ে দিলেন। মেজ মহারাজ সুধাময় সেনকে চেনেন। কলকাতার অন্যতম বড় প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্তা। বাবার অত্যন্ত অনুগত শিষ্য। টেলিফোন রেখে বড় মহারাজ ঘুরে দাঁড়াতেই বাবা বললেন, 'আর একটা লাইন নাও। পার্ক সার্কাসের ইউনিসকে বল ছোটের খবর আমি ছ' ঘণ্টার মধ্যে চাই। ঘটনাটা ওকে বল। কিন্তু তিনুর সঙ্গে যেন ইউনিস যোগাযোগ না করে।'

বড় মহারাজ একটি ডায়েরি খুলে ইউনিসের নাম দেখে নম্বর বের করলেন। দেখলেই বোঝা যায়, এই কাজে তিনি অভ্যস্ত। ইউনিসকে পাওয়া গেল না। খবর দেওয়া হল, সে যেন ফিরলেই এখানে যোগাযোগ করে। মেজ মহারাজ ইউনিসকেও চেনেন। বাবার ভক্তরা যে কেবল হিন্দু তা নয়। কিছু মুসলমান শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলেও বাবার অনুগত হয়ে আছেন। বিপদে-আপদে তাঁরা বাবার সাহায্য পেয়ে থাকেন। ইউনিস নামের মানুষটি অত্যন্ত প্রতাপশালী।

তাঁকে বাবা বলেছেন, 'ইসলাম হল সাম্য মৈত্রী আর ভালবাসার মন্ত্র। নামাজ, রোজা, হজ বা জাকাৎ হল তার অঙ্গ। একজন মুসলমান হিসেবে তোমার উচিত ইসলামকে পবিত্রভাবে অনুসরণ করা। ইসলাম ধর্মই তোমার জীবন ধারণের পথ।'

হঠাৎ বাবা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন, 'ছোটে এখানে কতদিন আসেনি ?'

'আট মাস।' বড় মহারাজ জবাব দিলেন।

'আমাদের আচার সে পালন করে ?'

'কলকাতার বাড়িতে তো পালন করতেই হয়।'

বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর দিকে, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ছোটে কোথায় আছে, আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু তুমি সনাতননাথকে জানাও, ছোটেকে যদি আট ঘণ্টার মধ্যে না ফেরত দেয় তাহলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে।'

'কিন্তু তাতে তো ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।' বড় মহারাজ বললেন।

'না। সনাতননাথ গোপন রাখবেই। নিজের স্বার্থে।'

মেজ মহারাজ না বলে পারলেন না, 'কিন্তু ছোটর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক যদি না থাকে ?'

বাবা হাসলেন, 'সেক্ষেত্রে সুধাময়, তিনু কিংবা ইউনিস ওকে ফিরে পেলে পাওয়াটাকে গোপন রাখতে হবে।'

মেজ মহারাজ যেন নিজের কানকেই অবিশ্বাস করলে ভাল বোধ করতেন। বাবা সংসার সম্পর্কে উদাসীন কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান প্রখর এইরকম ভাবনাই কাজ করত। নাহলে এই বিশাল আশ্রম ক্রমশ সম্পদশালী হত না। এই সম্পদ কার জন্যে তাও মেজ মহারাজ জানেন না। বাবার বয়স অবশ্যই পঁচাত্তরের নিচে নয়। মা গত হয়েছেন পনের বছর। এই মা বাবার দ্বিতীয় পক্ষের। ছোটে মহারাজ তাঁর সন্তান। কিন্তু বাবার আচরণ, বুদ্ধি এবং স্বাস্থ্য বার্ধক্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাঁরা যা চিন্তা করেন বাবা যেন কয়েকধাপ বেশি এগিয়ে যান। ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এটি বাবার কাছে যারা সরাসরি কথা বলার অধিকারী, তাদের জন্যে। বড় মহারাজ বাবার নির্দেশে রিসিভার তুলে জানতে চাইলেন ওপারে কে ? তারপর বাবাকে জানালেন, 'ইউনিস কথা বলছে।'

বাবা বললেন, 'জানিয়ে দাও।'

বড় মহারাজ তখন বিস্তারিত বললেন ইউনিসকে। রিসিভার রেখে দেওয়ামাত্র বাবা বললেন, 'আজ আমি উপাসনাগৃহে যাব। সেইমত ব্যবস্থা কর।' এটা নির্দেশ। নির্দেশ এই ঘর থেকে চলে যাওয়ার। বড় মহারাজ সেইমত নতজানু হয়ে প্রণাম সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মেজ মহারাজ যখন প্রণাম সারছেন তখন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনু আবার কখন টেলিফোন করবে ?'

'আজ্ঞে দু ঘণ্টা পর পর করতে বলেছি।'

'সময়টা পার হয়নি ?'

'না।'

'তিনু সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবতে হবে।'

মেজ মহারাজ প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালেন। বড় মহারাজ দরজায় তাঁর জন্যে

অপেক্ষা করছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনে হচ্ছে তোমার কিছু জানার আছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো ইচ্ছে করলে জানতে পারেন ছোটে মহারাজ এই মুহূর্তে কোথায় আছে। আমরা জানি আপনার অন্তর্দৃষ্টি বাধাহীন। কত ভক্তশিষ্যদের আপনি এই ধরনের কৃপা করে থাকেন। তাহলে এইক্ষেত্রে কেন নিজের শক্তি প্রয়োগ করছেন না?' মেজ মহারাজ এই প্রথম বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু জানতে চাইলেন, যা উচ্চারণ করার সাহস বড় মহারাজেরও কখনও হয়নি। বাবা হাসলেন, 'নিজের জন্যে কিছু করতে আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া ডাক্তাররা তো নিজের সন্তানের চিকিৎসা অন্য ডাক্তার দিয়েই করায়। এসো।'

আজ বাবা উপসাসনাগৃহে আসবেন। খবরটা এক মুহূর্তে আশ্রমের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ দৈনিক উপাসনা পরিচালনা করেন বড় মহারাজ। কোন কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে মেজ মহারাজ দায়িত্ব নেন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে বাবা উপাসনাগৃহে এসে শিষ্যদের দর্শন দেন। এখানে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। উপাসনান্তে বাবা কিছু উপদেশ দেবেন। তারপর মন্দিরাভ্যন্তরে থাকবেন রাত নটা পর্যন্ত। শরীর সুস্থ থাকলে সপ্তাহে এখন তিন দিন বাবা শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করেন। অনেক আগে থেকে চিঠি লিখে সাধারণ শিষ্যদের এ ব্যাপারে অনুমতি নিতে হয়। কি কি প্রশ্ন বাবাকে করা হবে, তাও আশ্রম-কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। ভি আই পি অথবা একান্ত জরুরী প্রয়োজন হলে বড় মহারাজ সিদ্ধান্ত নিয়ে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন ওই তিন দিনই। মন্ত্রী বা সচিব এলেও এই ঘটনার ব্যতিক্রম হয় না।

উপাসনাগৃহের সামনে ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে। বাবার বাণী শোনার, বাবাকে দর্শন করার জন্যে প্রথম দিকে বসতে চাইছে সবাই। বড় মহারাজ গাড়ি থেকে নামলেন। মেজ মহারাজকে বললেন, 'আজ তুমি উপাসনা না করলে কোন অন্যায় হবে না। বাবার আদেশ পালন করা উপাসনা করারই সামিল। তুমি সনাতননাথের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

নিজের গাড়ি নিয়ে বিনয়ধামে ফিরে এলেন মেজ মহারাজ। তিনি অকৃতদার। দু বছর পরে পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। প্রকৃত ব্রহ্মচারীর জীবন তাঁর। বড় মহারাজ জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে বাস করেন বলেই সেবিকা রাখার অধিকার পেয়েছেন। বাবা এসব নিয়মের উর্ধ্বে। যিনি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সন্ন্যাসী, আসক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেও চরম নিরাসক্ত সেই ঈশ্বরপুত্রের বিচার চর্মচক্ষে করা অসম্ভব।

মেজ মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন বিনয়ধামের সামনে কেউ অপেক্ষা করে নেই। শুধু কয়েকজন সেবক প্রহরায় আছে। তারা তাঁকে দেখামাত্র নতমস্তকে দাঁড়াল। তিনি ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। আশ্রমসংবাদের সম্পাদকীয় অর্ধসমাপ্ত রয়েছে। বাবার নির্দেশমত তাতে কিছু কথা সংযুক্ত করতে হবে। সংখ্যাটি যাতে তিন দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয় তার জন্যে এখনই উদ্যোগ নেওয়া দরকার। পত্রিকার সঙ্গে জড়িত প্রধান কয়েকজন

কর্মীকে তিনি ডেকে পাঠালেন। এবং এইসময় টেলিফোন বাজল। অপারেটর বলল, 'কলকাতার লাইন।'

এই আশ্রম-এলাকায় সমস্ত টেলিফোন নিয়ন্ত্রিত হয় অপারেটরের মাধ্যমে। একমাত্র আনন্দভবনেই সরাসরি লাইন আছে। মেজ মহারাজ রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে তিনুর গলা শোনা গেল, 'মেজ মহারাজ, আমি পনের মিনিট আগেও টেলিফোন করেছি। ছোটে মহারাজকে এখনও খুঁজে পাইনি। ওর ক্লাসের সমস্ত বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। তবে হাল ছাড়ছি না।'

'ঢোল পেটাতে আর কি বাকি রাখবে?'

মেজ মহারাজের গলা শোনামাত্র থমকে গেল তিনু। তারপর বলল, 'না-না, তিনি যে হারিয়ে গেছেন তা কাউকে জানাইনি। আর হ্যাঁ, অনেকভাবে যাচাই করে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, সেবকরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। কোন আদেশ আছে?'

'সুধাময় সেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'হ্যাঁ, মেজ মহারাজ। তিনি সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছেন।'

'শ্যামবাজারের অধীরচন্দ্র মল্লিক কবে গত হয়েছেন?'

'আজ ভোরে। খবরটা আশ্রমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'ওঁর বসতবাড়িটি উনি যেহেতু আশ্রমের কাজে দান করে গেছেন তাই তুমি ওটি অবিলম্বে দখল করবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'আদেশ পালিত হবে মেজ মহারাজ।'

'দু ঘণ্টার পরে যেন ভাল খবর পাই। বাবা তোমার ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। তোমার ওপর দায়িত্ব ছিল ছোটে মহারাজকে রক্ষা করা।' মেজ মহারাজ ও পক্ষের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তিনু মহারাজ আজ রাত্রে নিশ্চয়ই ভাল করে ঘুমাতে পারবেন না। তিনু খুব কাজের মানুষ কিন্তু অতিশয় ভোগী। মহারাজ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ভোগের স্বাদ হারাতে নারাজ। কোন কিছু হারাতে হবে শুনলে, সে ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

মেজ মহারাজ চোখ বন্ধ করে কর্তব্য স্থির করে নিলেন। সনাতননাথের সঙ্গে এখন তাকে যোগাযোগ করতে হবে। বাবা কোন কাজের গাফিলতি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু সনাতননাথ যে-সে মানুষ নন। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে তাঁর যে আশ্রম সেখানকার বর্ণনা শুনেছেন তিনি। হয়তো শিষ্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ বাড়িয়েই বলা হয়ে থাকে কিন্তু তাদের অনেকেই জঙ্গীপ্রকৃতির। আগে সনাতননাথ কদাচিৎ জনসমক্ষে বের হতেন। ইদানিং তাঁকে প্রায়ই প্রকাশ্য ধর্মসভা করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই যান তাঁকে ঘিরে রাখে শিক্ষিত দেহরক্ষী বাহিনী। মেজ মহারাজ জানেন তিনি চেষ্টা করলেও সনাতননাথের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। সনাতন নাথের প্রধান শিষ্য নিত্যনাথের মাধ্যমেই তাঁকে মতামত দেওয়া-নেওয়া করতে হবে। টেলিফোনে এত কথা বলা সমীচীন নয়। কলকাতা থেকে দূরত্ব রেল বা গাড়িতে প্রায় এগার ঘণ্টার। বিদেশী বা ধনবান শিষ্যভক্তদের সুবিধার জন্যে বাবা চেয়েছিলেন আশ্রমের

মধ্যেই একটি ছোটখাটো রানওয়ে তৈরী করতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই আবেদন নানান আইনের নজির দেখিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। হয়তো বাবার নামে আবেদন করা হয়েছিল বলেই সরাসরি বাতিল করতে পারেননি। কিন্তু একমাত্র বাবার ব্যবহারের জন্যে হেলিকপ্টার রাখার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য বাবার নির্দেশে অন্য কেউ ওটা ব্যবহার করলেও সরকারি তরফ থেকে কোন আপত্তি ওঠে না।

এই সময় ধ্যানেশের কথা মনে পড়ল। আজ সমস্ত দেশে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে ধ্যানেশের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিখ্যাত হবার পেছনে বাবার অবদান সর্বজনবিদিত। সাধারণ একজন কেরানি হিসেবে বেচারা জীবন শুরু করেছিল। গান গাইত কিন্তু তার শ্রোতা ছিল না। সেইসময়ে কপালগুণে রেডিওতে গাইবার সুযোগ পেয়ে গেল ধ্যানেশ। রেডিওর সি গ্রেড শিল্পী হয়ে সারাজীবন যারা কাটিয়ে দেয় ও তাদের সংখ্যাই বাড়াতো। একদিন সকালে গীত গাইছিল সে দশ মিনিটের জন্যে। বড় মহারাজের কানে রেডিওর সেই গান পৌঁছায়। ভাল লাগায় তিনি ওর নামটি মনে রাখেন। কিছুদিন পরে বাবা জানতে চান শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত জগতে উদীয়মান প্রতিভা তেমন কেউ আছে কিনা। বড় মহারাজ তখন ধ্যানেশের নাম করেন। বাবা ধ্যানেশের সন্ধান নিতে বলেন। সেই ধ্যানেশ এখন ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্পী। আর তাকে কেরানিগিরি করতে হয়নি। এগিয়ে যাওয়ার পথে যে কোন বাধা এলেই সে বাবার কাছে ছুটে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাধা অপসারিত। প্রতিটি পূর্ণিমার রাত্রে সে এসে বাবাকে গীত এবং ভজন শোনায়। যত ব্যস্ত থাক বাবার জন্মদিনে এখানে সে আসবেই। বাবার লেখা কিছু গীতিকবিতায় সুর দিয়েছে সে। লক্ষ লক্ষ কপি ক্যাসেট বিক্রী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মেজ মহারাজ অপারেটরকে বললেন ধ্যানেশকে ধরতে। অবিলম্বে। লাইন পাওয়া মাত্র অপারেটর যেন বোর্ড ছেড়ে চলে যায় পাঁচ মিনিট। এটা আদেশ।

মেজ মহারাজ সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলেন। সেটি শেষ করার মধ্যেই কর্মীরা এসে গেল। তাদের পুরো কর্তব্য বুঝিয়ে অবিলম্বে দিনরাত কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন তিনি। ওরা বেরিয়ে যাওয়া মাত্র টেলিফোন বাজল। ধ্যানেশের গলা পাওয়া গেল, 'জয় বাবা। কেমন আছেন মেজ মহারাজ ?'

'জয় বাবা। ভাল। বাবার আশীর্বাদে তো খারাপ থাকা উচিত নয়। তোমাকে খুব জরুরী প্রয়োজনে ডেকেছি। এখনই তুমি সনাতননাথের আশ্রমে চলে যাও। সম্ভবত তাঁর দর্শন তুমি পাবে না কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য নিত্যনাথের সাক্ষাৎ পাবে। তুমি যাচ্ছ বাবার প্রতিনিধি হয়ে। অতএব ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে বাধ্য।'

'আপনি আমাকে কি করতে আদেশ করছেন ?'

'গত পূর্ণিমায় এখানে এসে তুমি জেনেছিলে সনাতননাথ ঈর্ষাবশত আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে চলেছেন। তাঁর শিষ্যদের একাংশ বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় এই ঈর্ষা মাত্রা ছাড়িয়েছে। ব্যাপারটা এতকাল উপেক্ষা করা হয়েছিল। হঠাৎ আজ সকালে আমাদের কলকাতার বাড়ি থেকে ছোটে মহারাজ উধাও হয়ে গেছেন। আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এর পেছনে সনাতন-

ব্যাপারে ভূমিকা আছে। তুমি বাবার দূত হিসেবে ওদের সঙ্গে দেখা করবে। বলবে যে ছয় ঘণ্টার মধ্যে সনাতননাথ যেন ছোটে মহারাজকে ফিরিয়ে দেন। নইলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?' মেজ মহারাজ আচমকা প্রশ্ন করলেন।

'যদি ওঁরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাহলে কি— ?'

'না। তুমি দূত। অপমান সহ্য করে ফিরে আসবে। ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব আমাদের।'

'ছোটে মহারাজকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমাকে দেবেন ?'

'না। তার জন্যে অন্যলোক আছে। তুমি একজন সঙ্গীতশিল্পী। তুমি সেইমত আচরণ করবে। ফিরে এসেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।' মেজ মহারাজ টেলিফোন রেখে দিতেই উপাসনা সঙ্গীত শুনতে পেলেন। উপাসনাগৃহ থেকে মাইকে সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে ওই সুরতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেজ মহারাজ তাঁর নিজস্ব উপাসনা কক্ষে গিয়ে নতজানু হলেন। চোখ বন্ধ করে তিনি উপাসনাসঙ্গীত গাইতে লাগলেন। উপাসনাসঙ্গীতের পর ধ্যান। আধঘণ্টার জন্যে এই জগৎসংসার থেকে চিত্তের মুক্তি। তখন বোধ পৌঁছে যাবে সেই স্তরে যেখানে সেই মহান বর্তমান। আজকাল প্রথম পনের মিনিটের প্রয়োজন হয় মেজ মহারাজের মন স্থির করতে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে অতিক্রম করতে পারেন। একবার সেই স্তরে পৌঁছে গেলে আর ফিরে আসার বাসনাও লোপ পায়। ধ্যান সমাপ্তির ঘণ্টা মাইকে প্রচারিত হতেই যে শব্দতরঙ্গ চেতনায় আঘাত করে তাই বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ধ্যানের পর বাবা ভাষণ শুরু করলেন। মেজ মহারাজ তাঁর এই কক্ষে বসেও সেই ভাষণের প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। বাবা বললেন, 'কেউ কেউ বলে আমার কাছে এসেও নাকি আমার দেখা পাওয়া যায় না, কথা শোনা যায় না। তা আমি বলি আমাকে কি তারা সত্যি দেখতে চায় ? নাকি আমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে চায় ! তা তাঁকেই তো সরাসরি দেখলে হয়। আমি তাঁর দালাল না পাণ্ডা যে দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছি। বুদ্ধি যাদের বাড়াবাড়িরকমের তাদের কাছে আমি কে ? কিন্তু তাই বলে কি মা শিশুকে হাঁটতে শেখায় না ? অসুস্থকে নার্স পরিচর্যা করে না ? করে। অসহায় মানুষকেই তো সাহায্য করা দরকার। নইলে তুমি তো স্বার্থপর। এই মানুষেরা যখন আমার কাছে আসে তখন না দেখা দিয়ে আমি পারি। নিন্দুক যারা তারা ভোর হবার সময়েও মিথ্যে বলে যাবে। তা যা বলছিলাম, ওরা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বর ধ্বংস করেছেন, ঈশ্বর এই করলেন সেই করলেন। আরে ঈশ্বরের অত সময় কোথায় ? কোটি কোটি মানুষ রোজ জন্মাচ্ছে, অজস্র কোটি প্রাণ নিত্য পৃথিবীতে আসছে, একা ঈশ্বরের পক্ষে সব সামলে ওঠা সম্ভব ? তাহলে কি করে হচ্ছে ? না। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। এবং সৃষ্টি করেন না বলেই ধ্বংস করার ইচ্ছেও তাঁর হয় না। এই যে মানুষ, নানারকম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে মানুষের আকার নিয়েছে, নিজের প্রয়োজনমত যে বিন্যস্ত হয়েছে তার ভাল-মন্দ, দোষ-গুণই সৃষ্টি কিংবা ধ্বংসকে ডেকে আনে।'

সুধাময় সেনের বয়স হয়েছে। দীর্ঘকাল তিনি পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন। বাবার

আশীর্বাদে আইনসঙ্গত রিটায়ারমেন্টের বয়সে পৌঁছানোর আগেই তিনি স্বইচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এই ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। আজ তাঁর এজেন্সির নামডাক পশ্চিমবাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিত এবং দক্ষ গোয়েন্দাবাহিনী তাঁর অধীনে কাজ করে। অর্থ আসছে হু হু করে। পুলিশ যা পারে না তা তিনি ওই বাহিনীর সাহায্যে সমাধান করেছেন অনেকবার।

সুধাময় কিন্তু আজ সন্ত্রস্ত হয়ে টেলিফোনের সামনে বসে আছেন। তাঁর এই অফিসের টেলেক্স নিয়মিত আশ্রমে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। মেজ মহারাজ টেলেক্স ব্যবহার না করে কেন যে টেলিফোনে কথা বলতে গেলেন! হাজার হোক এতে গোপনীয়তা থাকে না। কিন্তু বাবা এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যে সময়সীমার মধ্যে ছোটে মহারাজকে খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে তার অর্ধেকটা খরচ হয়ে গিয়েছে। বাবার অবাধ্য হওয়া মানে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন! একটি একুশ বছরের ছেলে যদি স্বইচ্ছায় পালিয়ে যায় তাহলে তাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এই ক'ঘণ্টায় তিনি যেসব সংবাদ পেয়েছেন তাতে আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বাবার কনিষ্ঠ পুত্র এই কলকাতায় পড়তে এসে নিয়মিত ক্লাস করতেন না। সেবকরা গাড়ি নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসত কলেজে, আবার বিকেলে ফিরিয়ে আনত। এই সময়টুকু পাঠে ব্যবহার না করে ছোটে মহারাজ গোপনে বেরিয়ে যেতেন। কখনও কফি হাউসে কখনও খিদিরপুরে ওই সময়ে তাঁকে দেখা গিয়েছে। অবশ্য যেখানেই যান তিনি ফিরে আসতেন কলেজ ছুটির আগেই। সুধাময় জানেন অবশ্যই বাবা কিংবা বড় বা মেজ মহারাজ এই তথ্য পাননি। বাবা যে অন্তর্যামী সেই বিশ্বাস সুধাময়ও করেন। কিন্তু তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেন কোন লীলায় তাই বোধগম্য হচ্ছিল না। ছোটে মহারাজের খিদিরপুর অঞ্চলে যাতায়াতের ব্যাপারটাই তাঁকে চিন্তিত করছিল। আশঙ্কা হচ্ছিল আরও এমন খবর পাবেন যা শিহরিত করবে। এই কলেজ পালানোর ব্যাপারটা বড় মহারাজকে জানানো কর্তব্য। গাফিলতি ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না। সুধাময়ের মনে পড়ে আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগে একটি অপরাধের কিনারা করতে তিনি পুলিশ অফিসার হিসেবে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন। অপরাধী এত সেয়ানা ছিল যে তিনি কিছুতেই কূল পাচ্ছিলেন না। বিফল হয়ে কলকাতায় ফিরে আসার আগে তিনি বাবার কথা জানতে পারেন। বাবার নাম অবশ্য কলকাতাতেই কানে এসেছিল কিন্তু তেমন আগ্রহ তৈরী হয়নি। আশ্রমের এত কাছে এসে বাবাকে দেখার ইচ্ছে হল। তখনও লাইন পড়ত। তিনি লাইনে দাঁড়িয়েও ছিলেন। যারা আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে আসে, লাইনে দাঁড়ালে বাবার ইচ্ছানুযায়ী তাদের কেউ কেউ দর্শন পেয়ে যায়। প্রায় শেষ মুহূর্তে একজন সেবক এসে তাঁকে লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে বলল। কিছুটা মুগ্ধ হয়েই তিনি সেবককে অনুসরণ করে মেজ মহারাজের কাছে পৌঁছে গেলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে মেজ মহারাজ বড় মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। বড় মহারাজ তাঁর উত্তর বাংলায় আসার উদ্দেশ্য এবং কাকতালীয় ভাবে বাবাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সেই সময় একজন শিষ্য এসে কান্নাকাটি শুরু করায় সম্ভবত

তার প্রতি বিরক্ত হয়েই বড় মহারাজ সুধাময়কে নিয়ে বাবার কাছে উপস্থিত হন। বাবা তখন কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তার মধ্যেই একজন শিষ্য সাষ্টাঙ্গে বাবার শ্রীচরণে চুম্বন করছিল। সেই ভক্তিময় পরিবেশে সুধাময় নিজের অজান্তেই নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। শুধু দক্ষ পুলিশ অফিসার নয়, কর্তব্যে কঠোর হওয়ার জন্যে সুধাময়ের কুখ্যাতি বেড়েছিল অপরাধী মহলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে ভুলে গিয়েছিলেন। বাবার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল ওই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে তাঁর কোন কিছুই অজ্ঞেয় নেই। হঠাৎ বাবা বললেন, 'কাজ শেষ না করে ফিরে যাওয়া তোমায় মানায় না। দুষ্টের দমন তোমার মাধ্যমেই হবে। কিন্তু ছেলে, এখন থেকে নিজের ময়লা সাফ করার উদ্যোগ নিতে আর দেরি করো না। তোমার গাড়ি কখন ?'

সুধাময় কোনক্রমে সময়টা বলতে পেরেছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছিল। এত সুখ তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেননি। হঠাৎ মনে হল তিনি গভীর জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু ওপরে উঠে আসার কোন ক্ষমতা নেই। এবং সেই মুহূর্তে এক উজ্জ্বল আলো ওই গভীর জলের তলায় আবির্ভূত হল। তিনি শেষবার কোনক্রমে চোখ মেলে দেখলেন উজ্জ্বল আলো এক সুন্দর মূর্তি ধারণ করে তাঁকে সস্নেহে জলের ওপর টেনে তুলছে। বাতাসের স্পর্শ পেতেই সেই আলোকময় পুরুষ হেসে বললেন, 'যা। চলে যা।' ব্যাপারটা কি হল বোঝার আগেই মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি শুনতে পেলেন, 'ওরে,ওকে একটু পরমান্ন দে।'

সুধাময় চোখ মেলে দেখলেন বাবা অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করছেন। কারো নজর এদিকে নেই। সুধাময় বুঝতেই পারছিলেন না তিনি যা দেখলেন তা সত্যি না স্বপ্ন। এইসময় এক সেবক এসে পরমান্ন দিয়ে গেল। খুব সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি তা খেলেন। মনে হল অমৃতের স্বাদ এর কাছে কিছু নয়। এইসময় বাবা বললেন, 'আর দেরি করো না। ট্রেন তো বসে থাকবে না।' তিনি নতজানু হয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলেন। স্টেশনে পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর শরীরে যেন শক্তি ছিল না। টিকিট আগেই কাটা ছিল। সুধাময় দেখলেন আর বেশী দেরি নেই ট্রেন আসার। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দূরে একটা চায়ের স্টলের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা ঘুরে খবরের কাগজ পড়া শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় সেনের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি কোমর থেকে রিভলবার বের করে এগিয়ে গেলেন। লোকটির উল্টোদিকে পৌঁছে বুঝতে পারলেন ওটি দিন কয়েক আগের কাগজ। অপরাধীকে বন্দী করতে তাঁর কোন অসুবিধে হয়নি। এবং এই কাজের জন্যে ডিপার্টমেন্টে তাঁর সুখ্যাতি বেড়েছিল। সি সি রোলে ভাল কথা লেখা হয়েছিল। কিন্তু এসবে আর মন ছিল না সুধাময়ের। তিনি তখন প্রতি শনিবার কলকাতা ছেড়ে উত্তর বাংলায় আসা শুরু করলেন। গভীর জলের নিচে যে আলোকময় পুরুষ তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রকৃত রূপ তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। আজ সুধাময় জানেন কোন কিছুই তাঁর অজানা থাকে না। অতএব যে রিপোর্টই আসুক আশ্রমে পাঠানো তাঁর কর্তব্য।

এইসময় রায় তাঁর ঘরে ঢুকল। সুধাময় সেনের ডিটেকটিভ এজেন্সির এক নম্বর অফিসার হচ্ছে রায়। সুধাময় তাঁকে দেখে আশান্বিত হলেন। রায় চেয়ারে

বসে বলল, 'খুব অদ্ভুত ধরনের কেস স্যার। এই ছোটে মহারাজ কলকাতার ভূগোল ভাল করে জানেন না বলে তিনু মহারাজের ধারণা। কিন্তু ওকে ট্যাংরার কাফেলা রেস্টুরেন্টেও দেখা গিয়েছে।'

'কবে ?' সুধাময় সোজা হয়ে বসলেন।

'দিন সাতেক আগে। এক দুপুরে। ওঁর কলেজের নাম নির্মল ভট্টাচার্য। ছোটে মহারাজ হিসেবে বন্ধুবান্ধবরা চেনে না। খিদিরপুরের ব্রিজের নিচে এক সোর্স বলল নির্মলের ট্যাংরায় যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রেই কাফেলার খবর পেলাম।' রায় জানাল।

'কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কোথায় ?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না। কাপড়ের দড়ি বেয়ে নির্মল নামেন একাই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওর সবকটা বন্ধুকে ট্যাপ করেছি কিন্তু হদিশ পাইনি।'

রায়ের বক্তব্য শুনে বিরক্ত হলেন সুধাময়, 'রায়, আপনি আমার কাছে ওঁকে ছোটে মহারাজ বলে রেফার করবেন। আর হদিশ পাইনি বললে আমরা কোথাও পৌঁছাচ্ছি না। হদিশ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন সময়ে ছোটে মহারাজ ফ্ল্যাট থেকে চলে গিয়েছেন ?'

'মনে হয় ভোরের একটু আগে। ঠিক ভোরবেলায় ওই বাড়ির পেছনের খাটালে অনেকে দুধ নিতে আসে। সেইসময় বেরুলে নজরে পড়তই।' রায় জানাল।

'খিদিরপুরের সোর্স কি বলল ? ওখানে কেন যেতেন উনি ?'

রায় মাথা নিচু করল। তারপর বলল, 'স্যার, আমি অনুমান করছি ওঁর ব্যাপারে আপনার কোন সফ্‌টনেস কাজ করছে। কিন্তু ঘটনা হল ছোটে মহারাজ ট্যাবলেট খাওয়া শুরু করেছিলেন।'

'হা বাবা !' চিৎকার করে উঠলেন সুধাময়, 'কি যা-তা বলছেন আপনি ?'

'এটা সত্যি ঘটনা। তবে দেখা গিয়েছে মাত্র দুবার। সোর্স যা বলছে তাতে মনে হয় এখনও পাকাপাকি এ্যাডিক্ট হননি। প্রথমদিন গিয়েছিলেন সাপের ছোবল খাওয়া দেখতে।'

'কে খেয়েছিল ?'

'ওখানকার এক পুরোন খদ্দের। ছোটে মহারাজ এসেছিলেন আর একজন সঙ্গীর সঙ্গে।'

'সেই সঙ্গীটি কে ?'

'তাকে ট্রেস করেছি। কিন্তু ছেলেটা আউট অফ দি সিটি এই মুহূর্তে।'

'ফাইন্ড হিম। তবে তার আগে সমস্ত রিপোর্টটা টাইপ করে আমার কাছে দিয়ে যান। আমাকে ওটা এখনই পাঠাতে হবে।' সুধাময়ের ইঙ্গিতে রায় উঠে গেল। আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। সুধাময়ের বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড যেন সেই শব্দে নড়ে উঠল। তিনি জানেন টেলিফোন এসেছে আশ্রম থেকে। কি বলবেন তিনি, কি বলতে পারেন ! রিসিভার না তুলে যে এই মুহূর্তে এড়িয়ে যাবেন তাও সম্ভব নয়। কারণ তাঁর নজর এখন এখানেও রয়েছে। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে হেলো বলতেই ওপার থেকে গলা ভেসে এল, 'জয় বাবা। সুধাময় বলছেন ? আমি তিনু মহারাজ। কোন খবর পেলেন ? আমার মাথা

খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে!'

নতুন কেনা মারুতি এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বলল ধ্যানেশ। একটু আগে সনাতননাথের আশ্রমের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। সনাতননাথ তো দূরের কথা, তাঁর প্রধান শিষ্য নিত্যনাথ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি সে। আশ্রমের অধ্যক্ষকে সে জানিয়েছে বাবার প্রতিনিধি হিসেবে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। ব্যাপারটা খুব জরুরী। বাবার নাম শুনে অধ্যক্ষ খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। ধ্যানেশের নামও তিনি শুনেছেন। টেলিফোন নম্বর নিয়ে পরে জানাবেন বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই টেলিফোন বেজেছিল। অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন প্রভু তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীনিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ওই আলোচনা দশ মিনিটের বেশী স্থায়ী হবে না।

দশ মিনিটই সই। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কলকাতার ট্রাফিক কাটিয়ে ড্রাইভার নিপুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাবা যদি আদেশ দেন তাহলে সে চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের ছাদ থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারে। সনাতননাথ এখন তাদের শত্রুপক্ষ। কিন্তু দূতের কোন ভয় নেই। ইদানিং অনুষ্ঠান রেকর্ড আর ছবিতে গান গাইতে গাইতে এক ধরনের একঘেঁয়েমি এসে গিয়েছিল। বাবার গানগুলো গেয়ে ধ্যানেশের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে। তার কোন গানের ক্যাসেট পঞ্চাশ লক্ষ বিক্রি হয়নি। ধ্যানেশ চায়নি ওই বাবদ দক্ষিণা নিতে। কিন্তু বাবার ইচ্ছায় তাকে ক্যাসেট পিছু এক টাকা নিতে হয়েছে। এর পরিমাণ অনেক শিল্পীর সারাজীবনের স্বপ্ন। বাকিটা আশ্রমের কল্যাণে সে প্রণামী হিসেবে দিয়ে দিয়েছে। ধ্যানেশ জানে আজ ভারতবর্ষের অনেক নামজাদা শিল্পী তাকে ঈর্ষা করে। গতবছর লন্ডনে সমস্ত পৃথিবীর সেরা সঙ্গীতশিল্পীদের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে ওরা একজন পুরুষ শিল্পীকে চেয়েছিল। অবধারিতভাবে ধ্যানেশের নাম তখন উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রে ভজনের পর হঠাৎ বাবা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, মনে কোন কষ্ট হয়?' তখনই সে বলেছিল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে পৃথিবীর সবাইকে গান শোনাতে পারি। আপনার বন্দনা সবার সামনে করতে পারি।'

আর তার কয়েকদিন পরেই খবর এসেছিল ধ্যানেশ নির্বাচিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনের সম্মেলনে গান গাইবার জন্যে। একথা ঠিক, বাবা যদি তাকে সামান্য করুণা না করতেন তাহলে আজ তাকে লালদীঘিতে বাদাম খেতে হত। সেই দুঃসময়ে হঠাৎ বাবার এক শিষ্য এসে অনুরোধ করলেন আশ্রমে যাওয়ার জন্যে। তখন সংসারের হাল খুব খারাপ। গান গাওয়া প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল। দেবদ্বিজে কোন ভক্তি ছিল না। তবু কি মনে হল ধ্যানেশ রাতের ট্রেনে আশ্রমে পৌঁছালো। এত ভিড়, এত ধর্মীয় অনুশাসন, এত নিয়মকানুন যে সে শুধু বাবার দর্শন পেয়েছিল কিন্তু গান শোনাবার সুযোগ পায়নি। ফেরার সময় ট্রেনের জানলায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল। ওটাও ছিল রাতের ট্রেন। ধ্যানেশের একটা পুরোন অভ্যেস আছে। টাকা ভাঁজ করে সিগারেটের বাক্সে ভরে রাখত যাতে পকেটমার না বুঝতে পারে। আজ সেইসঙ্গে টিকিটটাও রেখেছিল। শেষ সিগারেট খাওয়া হয়ে গেলে অন্যমনস্ক হয়ে

প্যাকেটটাকে সে ছুঁড়ে দিল জানলা গলিয়ে। এবং তখনই তার খেয়াল হল টাকা ও টিকিটের কথা। টাকা বেশি ছিল না কিন্তু টিকিট ছাড়া যে দুরবস্থায় পড়তে হবে তা ভাবতেই শিউরে উঠেছিল। রাতের নিস্তব্ধতা চিরে হু হু করে ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল। ধ্যানেশ দেখতে পেল টিকিট চেকার এপাশে এগিয়ে আসছে। কি করবে বুঝতে না পেরে সে প্রাণপণে বাবাকে ডাকতে লাগল। পরে সে অনেকবার এই ব্যাপারটার কথা ভেবেছে। কেন তার ওই মুহূর্তে বাবার কথা মনে পড়েছিল কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু যেই বাবার সদাহাস্যময় মুখ মনে ভেসে উঠল অমনি ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল আচমকা। যাত্রীরা ট্রেন থামার কারণ জিজ্ঞাসা করছিল টিকিট-চেকারকে। সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ ফিরল ধ্যানেশের। একটি নির্জন প্রান্তরে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আকাশময় তারা আর অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে সে লাফিয়ে নেমেছিল দরজা দিয়ে। খোয়া বিছানো রেলপথ ধরে দৌড়ে যাচ্ছিল পেছনের দিকে। কেন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেই খেয়াল নেই তখন। ট্রেন ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর চেতনা হল। ট্রেন যে গতিতে এসেছিল তাতে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অন্তত সিকি মাইল পেছনে উড়ে পড়েছে সেটা। তাছাড়া ওটা লাইনের আশেপাশেই যে পড়বে তার কোন মানে নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ধ্যানেশের মনে হয়েছিল নামবার সময় জিনিসপত্র নিয়ে আসা হয়নি। তাহলে কাছাকাছি স্টেশনে পৌঁছে নতুন করে টিকিট কেনা যেত। পকেটে টাকা না থাকলেও হাতের ঘড়ি বিক্রী করে কিছু অন্তত পাওয়া যেত। সে ট্রেন পেছনে রেখে পাগলের মত রেললাইনের একপাশ খুঁজতে চেষ্টা করছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই সে প্যাকেটটাকে দেখতে পেল। একেবারে লাইনের ধারে পড়ে রয়েছে সোজা হয়ে। ছোঁ মেরে ওটাকে তুলে নিয়ে দেখল টিকিটটা আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে ধ্যানেশ আকাশের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বাবাকে ডাকল। তারপর প্যাকেটটাকে মুঠোয় নিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখল ট্রেনটা আবার ছাড়ার জন্যে গর্জন শুরু করেছে। নিজের কামরায় যখন পৌঁছাতে পারল তখন ট্রেন দুলকি চালে চলতে শুরু করেছে। টিকিট চেকার দাঁড়িয়েছিল দরজায়। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলেছিল, 'কি মশাই, অমন চোরের মত দৌড়ে গেলেন কেন ? ধান্দাটা কি ?'

ধ্যানেশ আমতা আমতা করেছিল। চেকার বলেছিল, 'সামনের ব্রিজটা একটু খারাপ বলে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। না পৌঁছাতে পারলে তো আপনাকে ছেড়েই আমরা চলে যেতাম। দেখি, আপনার টিকিট দ্যাখান।' হাত বাড়িয়েছিল লোকটা।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে যখন টিকিট বের করে এগিয়ে দিল ধ্যানেশ তখন বাবার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় মথিত। সেই শুরু। বাবার অস্তিত্ব তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এরকম প্রমাণ বারংবার পেয়ে আসছে সে। আজ যদি বাবার সেবার জন্যে সে কিছু করতে পারে তাহলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে। গত পূর্ণিমায় গান গাইতে গিয়ে শুনে এসেছিল যে সনাতননাথ আরও কিছু ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।

কিন্তু ওরা যে ছোটে মহারাজ পর্যন্ত হাত বাড়াবে তা কল্পনা করা যায়নি। ছোটে মহারাজ বাবার সংগঠনের মধ্যে কোন পদে নেই। ধার্মিক জীবন যাপন

করাতে গেলে যে শিক্ষাকে এড়িয়ে যেতে হবে এই বিশ্বাস বাবার নেই। তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হিসেবে ছোটে মহারাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আশ্রমের অনুশাসনের মধ্যে ওঁকে এখনই বাঁধতে চাননি। কলকাতার বাড়িতে গিয়ে ধ্যানেশ অনেকদিন গান করে এসেছে। ছোটে মহারাজকেও সে দেখেছে। একটি পবিত্র চেহারার তরুণ ছাড়া কিছু মনে হয়নি। কিন্তু তার এও জানা আছে পরবর্তীতে এই তরুণই সাধনার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছাবে। সিংহের সন্তান কখনই সারমেয় হয় না। এই উজ্জ্বল তরুণকে যদি সনাতননাথের শিষ্যরা আটকে রেখে কোন চাপ তৈরি করতে চায় তাহলে— ! ধ্যানেশ ভেবে পাচ্ছিল না, কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে যাচ্ছে। বাবা এখনই ব্যাপারটা প্রকাশ করতে চান না কিন্তু যদি তাঁর কোটি কোটি শিষ্য সত্য জানতে পারে, তাহলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে সনাতননাথের আশ্রমের ওপর। মহারাজ তাকে বলেছেন সে যেন দূত এবং সঙ্গীতশিল্পীর মত আচরণ করে। অতএব ওই সময় নিজেকে সংযত রাখলেই হবে।

সনাতননাথের আশ্রম কলকাতার উপকণ্ঠে। জায়গাটি নির্জন। বিশাল প্রাচীরে ঢাকা বাড়িটির সদরে চারজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে গৈরিক বস্ত্র। কোমর বন্ধনী থেকে ভোজালি ঝুলছে। প্রহরীদের প্রত্যেকেরই দাড়ি রয়েছে। ভঙ্গিতে উদ্ধত ভাব। গাড়ি থামা মাত্র একজন প্রহরী এগিয়ে এল। ধ্যানেশ বলল, 'আশ্রমাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে এইসময় আসতে বলেছেন।' প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম ?' প্রশ্নটি হিন্দীতে।

ধ্যানেশ অবাক হল। পশ্চিমবাংলার যে কোন জায়গায় সে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালে ভিড় জমে যায়। আগে থেকে জানা থাকলে লোকে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আসে। সবাই তাকে চেনে এই ধারণাতেই সে এখন অভ্যস্ত। যেন কোন বিদেশীর সামনে দাঁড়িয়েছে ধ্যানেশ এমন মনে হচ্ছিল। তবু নাম বলতে হল। প্রহরী বাংলাভাষাতেই বলল, 'ও, আসুন। আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে।' গেট খুলে গেল। একজন প্রহরী এগিয়ে এসে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে বলল, 'সোজা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে ঘুরতে হবে।'

গাড়ি চলছে কাঁকর বিছানো পথে। তীব্র আলোয় চারধার উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে বিদেশী বিদেশিনীদের দেখা যাচ্ছে। দেশী শিষ্য-শিষ্যারা দলবদ্ধভাবে ঘোরাফেরা করছে। প্রত্যেকের পোশাক গেরুয়া। একটি দোতলা বাড়ির সামনে পৌঁছে প্রহরী ড্রাইভারকে থামতে বলল। সে দরজা থেকে নেমে দাঁড়াতেই আর একজন প্রহরী সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে কথা বলল। ধ্যানেশ গাড়ি থেকে নেমে দ্বিতীয়জনকে অনুসরণ করল। এইসময় অন্য কোন ভবন থেকে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে এল। ধ্যানেশ দেখল দুজন প্রহরী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেই প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে। তার এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই। সামনের লন, পথে যারা ঘোরাফেরা করছিল তারাও এই মুহূর্তে স্থির। যেন সমস্ত কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রার্থনা শেষ হলে প্রহরী আবার সচল হল। সিঁড়ি ভেঙে ওরা দোতলায় উঠে আসতেই একজন মুণ্ডিত-কেশ শিষ্য এগিয়ে এসে পরিচয় জানতে চাইলেন।

এতক্ষণে নিজের ওপর আস্থা হারিয়েছে ধ্যানেশ। তাহলে এই কলকাতা শহরের অনেকেই তাকে চেনে না!

শিষ্যটি ধ্যানেশকে অনুসরণ করছিলেন। দ্বিতীয় দরজায় পৌঁছে ঘর পেরোতেই শিষ্য ঘোষণা করল, 'ধ্যানেশ ভট্টাচার্য আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যান, ভেতরে যান।'

ধ্যানেশ জুতো খুলে ভেতরে ঢুকল। সুন্দর কার্পেটের ঠিক মাঝখানে বসে আছেন আশ্রমাধ্যক্ষ। তাঁরও পোশাক গেরুয়া। বয়স পঞ্চাশের ওপাশে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বসুন।' ধ্যানেশ ঈষৎ দূরত্ব রেখে পা মুড়ে বসল। আশ্রমাধ্যক্ষ বললেন, 'বাবা আপনাকে পাঠিয়েছেন জেনে আমরা অবাক হয়েছি। আপনি শ্রীনিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'না। আমি শ্রীসনাতননাথের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম।'

'একটু সংশোধন করিয়ে দিচ্ছি। মহাপুরুষকে আমরা শ্রীশ্রী বলেই অভিহিত করি। এর পরের বার মহাপুরুষের নাম ব্যবহার করতে হলে দুইবার শ্রী বলবেন। যেকথা বলছিলাম, মহাপুরুষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ এই মুহূর্তে অসম্ভব।' প্রধানাধ্যক্ষ হাসলেন, 'আর এই বিষয়ে আমরা সম্ভবত টেলিফোনেও আলোচনা করেছি, তাই না?'

'বেশ। তাহলে আমি শ্রীনিত্যনাথের সঙ্গেই কথা বলব।'

'বিষয়টা জানতে পারি?'

'আমি বাবার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। বিষয়টি আমি শ্রীশ্রীসনাতননাথের উপযুক্ত প্রতিনিধির সঙ্গেই আলোচনা করতে চাই।'

'আপনি মোটামুটি গান-বাজনা করেন বলেই শুনেছিলাম কারো কাছে, কিন্তু কূটনৈতিক কথাবার্তাতেও অভ্যস্ত তা জানতাম না। শ্রীনিত্যনাথ এখনই এখানে উপস্থিত হবেন। আপনি অপেক্ষা করুন।' আশ্রমাধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে একটি হালকা নীল আলো জ্বলছিল। কাছাকাছি কোথাও কি জেনারেটার চলছে? সেইরকম আওয়াজ কানে এল। এই বিশাল ঘরে পুরু কার্পেটের ওপর পা মুড়ে বসে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ধ্যানেশের। প্রহরীরা তাকে চিনতে পারেনি সে নাহয় মানা গেল, কিন্তু আশ্রমাধ্যক্ষ বললেন যে সে মোটামুটি গান গায়। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছে যে, ইচ্ছেমতো ছবি নির্বাচন করে গান গেয়ে থাকে যে, সে মোটামুটি গায়? অপমানের আর কি বাকি থাকল! তাও উনি শুনেছেন কারো কাছে, নিজের কানে নয়। যেকোন বারোয়ারি পুজোয় মাইকে তার গান বাজে। অদ্ভুত। শূন্য ঘরে চোখ ফিরিয়ে ধ্যানেশের মনে হল ঘরের নীল আলো যেন হালকা থেকে একটু বেশি ঘন হয়েছে। কার্পেটের রঙ সেই গাঢ় নীলে জমাট সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে। ধ্যানেশ যেন তার মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলছিল। মনের জোর ফেরাতেই সে বাবাকে ডাকতে লাগল নিঃশব্দে।

'কি কারণে আপনাকে এই আশ্রমে বাবা পাঠিয়েছেন?'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ধ্যানেশ। ঘরের শেষ প্রান্তে সিংহাসনের মত একটি চেয়ারে বসে আছেন মুণ্ডিত-কেশ শীর্ণ বৃদ্ধ। ঘন নীল তাঁর অঙ্গের গৈরিক পোশাকে মাখামাখি হয়ে এক বিচিত্র রঙের জন্ম দিয়েছে। ধ্যানেশ হাতজোড়

কারণ। সে যেন হঠাৎই তীব্রভাবে মানসিক শক্তি ফিরে পেল, 'আমি কি শ্রীনিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলছি ?'

'সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল কি ? হ্যাঁ, আপনি আমার সঙ্গেই কথা বলছেন।' শ্রীনিত্যনাথকে এক ফোঁটা নড়তে দেখল না ধ্যানেশ। তিনি কখন যে এই ঘরে ঢুকে ওই সিংহাসনে বসেছেন তাও তার নজর এড়িয়ে গিয়েছে। সে বলল, 'আমার আসার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আপনি জানেন। অতএব বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।'

শ্রীনিত্যনাথ বললেন, 'আশ্চর্য ! আমি অন্তর্যামী নই। আমি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীসনাতননাথের দীন সেবক মাত্র। কোনরকম ভেলকিবাজিতে বিশ্বাস করার শিক্ষা মহাপুরুষ আমাদের দেননি। আপনি গৃহী। জানি না কেন বাবা আপনাকে নির্বাচন করলেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে। যাহোক, আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আমার জানা নেই।'

ধ্যানেশ থতমত খেয়ে গেল। ওই বৃদ্ধ যে কথায় অনেক বেশি পারদর্শী তা বুঝতে আর বাকি রইল না। অতএব একটু বুদ্ধিমানের মত এগোতে হবে। সে বলল, 'আপনার কাছে একটু অনুগ্রহ চাই। সাধারণ মানুষ আমি, সাধারণ আলো ও পরিবেশে কথা বলতে স্বস্তি বোধ করি। এই নীল আলোর ঘনত্ব যদি কমিয়ে দেন তাহলে সুবিধে হয়।'

'নীল হল বিষের প্রতীক। বিষ ক্ষরিত রক্ত কালো আর নীলে মেশামেশি। তবু আপনার কথা রাখা আমার কর্তব্য।' শ্রীনিত্যনাথ করতালি দিয়ে বললেন, 'হালকা নীল আলো আমাদের অতিথি পছন্দ করছেন। তাই জ্বেলে দাও।'

এবার আলো সহনীয় হল। বৃদ্ধের চোখমুখ স্পষ্ট। বয়স অনুমান করা মুশকিল। ধ্যানেশ বলল, 'বাবা আপনাদের সঙ্গে সংঘাতে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মত হল সকল সম্প্রদায় যাতে নিজস্ব ধারায় উপাসনা করতে পারে এমন পরিবেশই কাম্য। কিন্তু সেই পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে একটা ধারণা আমাদের মনে জন্ম নিচ্ছে।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'এ আর নতুন কথা কি ! ভূমি তার নিজস্ব ধারণ-শক্তি অনুযায়ী বীজের জন্ম দেয়। পাহাড়ের মাটি যা ফলাতে পারে সমুদ্রের পাশের বেলাভূমিতে তা ফলে না। আপনাদের ধারণা আপনাদেরই যোগ্যতা অনুযায়ী জন্মাচ্ছে।'

ধ্যানেশ একটু উষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন ?'

'অবশ্যই নই। বরং বলতে পারি ঈশ্বরোপাসনার যে চিরন্তন প্রক্রিয়া এই দেশে চিরকাল চলে এসেছে আপনাদের বাবা তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।'

ধ্যানেশ সোজা হয়ে বলল, 'মাপ করবেন, শিষ্য হয়ে আমি বাবার কোন বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে অভ্যস্ত নই।'

'আপনার বক্তব্য এখনও বলেননি।'

'বক্তব্য শোনার পরিবেশ আপনি রাখতে চাননি।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'বেশ, এবার ভূমিকা ছেড়ে ভূমিতে নামুন।'

ধ্যানেশ সরাসরি তাকাল, 'ছোটে মহারাজকে ফিরিয়ে দিন।'

'কে ছোটে মহারাজ?' বৃদ্ধের স্বরে বিস্ময় স্পষ্ট।

'বাবার কনিষ্ঠ পুত্র। আমাদের আশ্রমের ভবিষ্যৎ মহারাজ।'

'যে ভবিষ্যতে মহারাজ হবে তাকে এখনই মহারাজ বলে সম্বোধন করছেন কেন?'

'সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার বক্তব্য আপনি শুনেছেন।'

'ধর্মকে যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে তারাই ধর্মের প্রধান শত্রু। শুনেছি উত্তর বাংলায় আপনাদের বাবার বিশাল আশ্রম রয়েছে। সেখানে হেলিকপ্টার পর্যন্ত রাখা হয়েছে। আমার কোন আপত্তি নেই। ধর্মীয় সংগঠন মানে হিমালয়ের সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন এই থিওরিতে আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না। পুরাকালেও করত না। মহামুনি বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল। সে ইচ্ছে করলে দশ হাজার সম্রাটের চেয়ে বেশি ধনসম্পত্তি মহামুনিকে দিতে পারত। তাই বলে কি বশিষ্ঠের যোগশক্তি ক্ষয় পেয়েছিল? মুনি ঋষিরা তখন হিমালয়ে বাস না করে রাজামহারাজের সভায় বিচরণ করতেন। রাজকন্যাদের সঙ্গে ঋষিদের বিবাহ হয়েছে অনবরত। তাঁরা নিশ্চয়ই বিষয়হীন সন্ন্যাসী ছিলেন না,অথচ তাঁদের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষয় পায়নি ওই কাজের জন্যে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নির্বোধ মানুষকে ভেলকি দেখিয়ে নিজের এবং পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করাকে আর যাই বলা হোক, ধর্মাচারণ বলে স্বীকার করা যায় না। ত' ছোটে মহারাজের কি হয়েছে?' বৃদ্ধ একটানা কথার শেষে প্রশ্ন করলেন।

'সেটা কি আপনার অজানা?'

'একটু আগে শুনলেন আমি তাঁর পরিচয়ই জানি না।'

'কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিনি আপনাদের দ্বারা অপহৃত। তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিন। না হলে পরিণাম ভয়াবহ হবে।'

'এই হুমকি কি বাবা আমাদের দিতে বলেছেন?'

'আমি বাবার আজ্ঞাবহ।'

'চমৎকার। তবে তাঁকে জানিয়ে দেবেন, ছোটে মহারাজ সংক্রান্ত কোন খবর এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও যদি ওই ভয়াবহ পরিণামের জন্যে বাবা প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা এটাকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করব।'

এবার সত্যি কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না ধ্যানেশ। নিত্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কিছু বক্তব্য আছে আপনার? মনে হয় দশ মিনিটকাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। ছোটে মহারাজ আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন। ওঁকে আটকে আপনারা কোন চাপ সৃষ্টি করলে বাবার শিষ্যরা তা ক্ষমা করবেন না। ওঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিন। শ্রীশ্রীসনাতননাথের যেসব শিষ্য বাবার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন তা তাঁরা করেছেন স্ব-ইচ্ছায়। এই কারণে আপনাদের ঈর্ষান্বিত হবার কোন যুক্তি নেই।'

'এটাও কি আপনাদের বাবার বক্তব্য?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে এর জবাব দেওয়া আমি প্রয়োজন বোধ করছি না।' বৃদ্ধ সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন। তারপর পাশের দরজায় পৌঁছে বললেন, 'আপনি এই আশ্রমে অতিথি। আপনার সেবার আয়োজন হয়েছে। দূত হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিরূপ ধারণা নেই। তবে সেবা গ্রহণ না করে চলে যেতে চাইলে খুব অপমানিত বোধ করব।' বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না।

পার্ক সার্কাসের নিজস্ব আড্ডায় বসে ইউনিস মাথার চুলে হাত বোলাচ্ছিল। এই মুহূর্তে তার সাকরেদরা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় যত ছোট বড় মাস্তান রয়েছে তাদের মাধ্যমে ছোটে মহারাজের খবর নিচ্ছে। ছোটে মহারাজ খিদিরপুরে যেত তা বসির আলির কাছে এইমাত্র জানতে পেরেছে ইউনিস। জেনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাবার ছেলে হয়ে ছোটে মহারাজ খিদিরপুরে যেত সাপের ছোবল খাওয়া দেখতে। হা বাবা! কিন্তু বসির আলি বলল আর একটা দল এখন ছোটে মহারাজের পাত্তা লাগাতে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দলটি কারা? যদি কেউ ছোটে মহারাজকে হাপিস করে থাকে তবে তারা নিশ্চয়ই খবর নেবে না। সে বসির আলিকে বলেছে লোকগুলোর ওপর নজর লাগাতে। বড় মহারাজ যে সময় দিয়েছেন তা পার হতে বেশি দেরী নেই। তার ব্যবসা, বাড়ি-গাড়ি, কর্পোরেশন ইলেকশনে জিতে কাউন্সিলর হওয়া কার দৌলতে? ওই বাবা না থাকলে তাকে তো এতদিনে পার্ক স্ট্রিটের পুলিশ দিনরাত তাড়া করে নিয়ে যেত। বারো বছর আগে মনে একটু পাপবোধ এসেছিল। পার্ক সার্কাসে তখন আমির আলির রাজত্ব। বাঘে গরুতে জল খায় এক মগে। দিনরাত এক হয়ে যায়। লাখ লাখ টাকা তোলা ওঠে খালি কুঠি আর ব্যবসাদারদের কাছ থেকে। ইউনিস ছিল আমির আলির আট নম্বর চামচা। পুলিশ ধরে আর আমির আলির লোক ছাড়িয়ে আনে। তা একদিন আমির আলি ডেকে বলল, 'দ্যাখ ইউনিস, তুই আমার হেড চামচা বনবি? আরে ব্বাস। ওই পোস্টের জন্য কত কাড়াকাড়ি মারামারি। ঠিকঠাক হুকুম মানো, তুমি আছ। মাস গেলে বিশ হাজার পকেটে আসবে। কিন্তু যেই তোমার লোভ হল, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যাবে।' আমির আলি বলল, 'তাহলে কান খাড়া করে লে শোন। একটা খুন হবে। ঢাকতে পারব না। তোর জেল হবে দু বছরের জন্যে। জেল থেকে বেরিয়ে এলে আমার হেড চামচা বনে যাবি। না-না। খুন করবে অন্যলোক। তুই শালা তার বদলে জেল খাটবি। কি রাজী?' না বললে বিপদ, হ্যাঁ বলতে মন চাইছিল না। কিন্তু সেই রাত্রেই নিজেই খুন হয়ে গেল আমির আলি। খুন হল নিজের বিবির হাতে। দুধে বিষ মিশিয়ে ভাল করেছিল না খারাপ করেছিল, এই নিয়ে নানান লোক নানান কথা বলে। কিন্তু মনে পাপবোধ ঢুকে গেল ইউনিসের। আজমীর শরীফে চলে গেল সে একা। আর তখন আগ্রা স্টেশনে সে প্রথম বাবার দর্শন পেল। একই ট্রেন থেকে নেমেছেন বাবা। শয়ে শয়ে ভক্ত তখন বাবাকে প্রণাম করছে, জয় বাবা ধ্বনি তুলছে। মজা লাগছিল ইউনিসের। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে। হঠাৎ বাবা তার হাতে যেসব মালা জমেছিল তা শিষ্যভক্তদের দিকে ছুঁড়ে দিতে শুরু করলেন। সবাই পাগল হয়ে গেল সেই মালা কুড়োতে। এমনি ফুলের মালা সেসব। একটা মালা এসে পড়ল

ইউনিসের গায়ে। খুশিতে সে তুলে নিয়ে তাজ্জব। মালাটা একটা সোনার হার হয়ে গেল। মুখ তুলে সে দেখল সবাই বাবাকে নিয়ে স্টেশনের বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু মালা যখন শূন্যে ভাসছিল তখন ইউনিস স্পষ্ট দেখেছে ওটা ছিল ফুলের। এখন আঙুল বলছে, চোখ বলছে এটা ধাতুর আর ধাতুটা সোনার। চুপচাপ পকেটে ঢুকিয়েছিল ইউনিস। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শরীর গরম হয়ে যাচ্ছিল। অন্তত পাঁচ ভরির হার। হোটেলে গিয়ে হারটাকে আবার বের করল। কোন ভুল নেই, সোনারই। বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। এটা কি করে হল ? তখন আগ্রায় রাত। ইউনিস হারটা নিয়ে বেরিয়ে এল। চেনাশোনা কেউ নেই আগ্রায়। তবু সাহস করে একটা সোনার দোকানে ঢুকে যাচাই করতে চাইল হারটাকে। জহুরী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হারটা কার ?'

ইউনিস মাথা নেড়েছিল, 'আমারই। ওটায় সোনা আছে কতখানি ?'

জহুরী বলেছিল, 'নিজের হার বলছ আর জানো না কতখানি সোনা আছে ? কোথায় পেয়েছ মালটা ?' ব্যস ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। দোকানদার পুলিশ ডাকল। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। বলল, 'আগে বল মালটা কোত্থেকে ঝেড়েছ, তারপর অন্য কথা। ওরা ওর ঠিকানা জানতে চাইল। ইউনিস বুঝল আর বাঁচার কোন পথ নেই। পাক সার্কাসের ঠিকানা বলে দিলে পুলিশ পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে ওর সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাবে সেটা প্রমাণ করবে এটা চুরির মাল। প্রায় ভেঙে পড়ল সে থানায়। কেঁদেকেটে সত্যি কথা বলতে লাগল অফিসারকে। পুলিশরা হো হো করে হাসতে লাগল তার গল্প শুনে। ইউনিস যতই বলে সে আজ স্টেশনে নেমে এক সাধুজীর কাছে ওটা পেয়েছে অফিসাররা তত হাসে। লকআপে ওরা রেখে দিল ইউনিসকে। রাত্রে কেঁদে-কেটে একসা ইউনিস। আজমীর শরীফ আর দ্যাখা হল না তার। স্টেশনে দেখা সেই বাবার মুখ মনে পড়ল। কেন তার দিকে ফুলের মালা ছুঁড়তে গেল। গেল যদি, কেন তবে মালা হার হয়ে গেল!

ভোর বেলায় আগ্রার দুই সজ্জন মানুষ এলেন থানায়। তাঁরা অফিসারকে বললেন যে বাবা ওঁদের পাঠিয়েছেন। তিনি একটি লোককে গতকাল স্টেশনে সোনার হার উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু অফিসাররা ভুল বুঝে তাকে লক আপে আটকে রেখেছে। সজ্জন দুটি সকলের এত পরিচিত যে ইউনিসকে বের করে আনা হল। তার তখন মুখে কথা ফুটছিল না। বক্তব্য লিখিত ভাবে জানিয়ে সজ্জনরা ইউনিস আর তার হার নিয়ে এক ধনী শিষ্যের বাড়িতে গেল যেখানে বাবা অবস্থান করছিলেন। ওকে সামনে উপস্থিত করতেই বাবা বলেছিলেন, 'বড় সন্দেহ তোর, না রে ? কাউকে দেখে বিশ্বাস করতে পারিস না, না ? যাচাই করলে যে অনেক সময় ঠকতে হয়। আজমীর যাচ্ছিস ঘুরে আয়। তবে আর ওসব কাজ নয়। অন্যায় শক্তিকে ন্যায়ের পথে চালাবি, তবেই না মানুষ। আর ওই হার কখনও গলা থেকে খুলবি না। যা।'

সেই শুরু। তারপর প্রতি পদে পদে বাবার আশীর্বাদ নিয়েছে ইউনিস। এখনও তোলা ওঠে এ তল্লাটে। কিন্তু সেই টাকায় গরীব-দুঃখীরা খিচুড়ি খায় রোজ। জামা-প্যান্ট বিলি করা হয়। কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করেছিল। সেটা বেড়ে যেতে ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবার ব্যবসায় লেগেছে সে। টাকা এখন তার

পেছনে ছোটে। আজ যদি ছোটে মহারাজকে সে উদ্ধার করতে না পারে তাহলে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। এই সময় টেলিফোন বাজল। বড় মহারাজের গলা, 'ইউনিস, কোন খবর আছে?'

'এখনও পাইনি মহারাজ। জান কবুল করে খুঁজছি মহারাজ।'

'তার আগে আর একটা কাজ কর। ধ্যানেশ গিয়েছিল সনাতননাথের আশ্রমে ছোটে মহারাজের খোঁজে। দু ঘন্টা হয়ে গেল, ফেরেনি। কোথায় আছে সে দ্যাখো।'

'আশ্রমে হামলা করব?'

'না। তোমাকে শুধু বলেছি এবার ধ্যানেশকে খুঁজতে হবে।'

রাত নটায় উপাসনাগৃহ থেকে বের হলেন বাবা। ভক্ত শিষ্যরা তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছে সমানে। দুটো হাত ওপরে তুলে সহাস্য মুখে বাবা এগিয়ে চলেছেন সেবকদের করে দেওয়া পথে। গাড়িতে ওঠার আগে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। সবাই তাঁর আশীর্বাদ চায়, স্পর্শ প্রার্থনা করে। হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল কিন্তু সেবকদের কঠোর শৃঙ্খলায় তা প্রশমিত হয়েছে। বাবা সেই আকুল জনতার দিকে তাকালেন। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'মানুষ হও।' সঙ্গে সঙ্গে একজন চিৎকার করে উঠল, 'বাবা, আমার একমাত্র ছেলে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তুমি দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও', কেউ বলল, 'বাবা, আমার স্বামীর ক্যানসার হয়েছে, তুমি বাঁচিয়ে দাও নইলে ভেসে যাব।' প্রায় প্রতিটি গলা থেকে দাও দাও ধ্বনি ছিটকে উঠল। মানুষের যন্ত্রণার কান্নায় উপাসনাগৃহের সামনের চত্বর ককিয়ে উঠেছে। বাবা চোখ বন্ধ করলেন। বড় মহারাজ তাঁর পাশেই ছিলেন। নিচু স্বরে বললেন, 'গাড়ি প্রস্তুত।'

বাবা হঠাৎ শূন্যে হাত মুঠি করলেন। একবার দুবার তিনবার। যেন কিছু ধরার চেষ্টা করছেন অথচ সেটা মুঠোয় আসছে না। এর মধ্যে একজন সেবক গাড়ির ভেতর থেকে একটা পোর্টেবল মাইক এনে তাঁর সামনে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত বাবা বললেন, 'দেখলি তো! আমি কত চেষ্টা করলাম তবু শূন্য থেকে কিছু যোগাড় করতে পারলাম না। ওরে, শূন্য যে সে দেবে কি করে! এক থেকে কোটি কোটি হয়। শূন্য থেকে হয় না। আমি তো ম্যাজিক জানি না যে খপ করে একটা রসগোল্লা তৈরি করব, নাকি দু-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে বিদেশীদের ডেকে এনে আশ্রম বানাবো। আমি কিছুই জানি না। শুধু তোদের বলি প্রাণভরে তাকে ডাক, দেখবি প্রাণ ভরে যাবে।' বাবা গাড়িতে উঠে বসলেন। ভক্তরা ততক্ষণ বাবা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই জায়গার মাটি নিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছেন। কেউ কেউ সযত্নে তা কাপড়ে বাঁধছেন।

আনন্দভবনের সামনে গাড়ি থামলে বাবা নামলেন। সেখানেও সেবকরা শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। কোন কথা না বলে বাবা ভেতরে চলে গেলেন। বড় মহারাজ দেখলেন মেজ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে। তিনি তাঁকে ইশারায় ডেকে নিয়ে ভেতরে চললেন। অসময় নয়, তাই অনুমতির প্রয়োজন নেই। বড় মহারাজ মেজ মহারাজকে নিয়ে বাবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। বাবা সারাদিনে একবার আহার আর দুবার পান করেন। সূর্যাস্তের মুহূর্তে বন্দনা শেষ

করে তিনি একটি বড় পাথরের গ্লাসে ঘোল এবং এক চামচ মধু পান করেন। দ্বিপ্রহরে ছানা, পরমান্ন এক হাতা, দুটি ফল, এবং বাদামগোলা দুধ আহার হিসেবে গ্রহণ করেন। রাত্রে এক বড় শ্বেথপাথরের বাটিতে আঙুরের রস এবং একটি আমলকি গ্রহণ করেন। বড় মহারাজ মেজকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন সেবিকারা সশ্রদ্ধায় বাবার পানের আয়োজন করছেন। বাবা পাথরের বাটি থেকে দু আঙুলে একটি আমলকি তুলে নিরীক্ষণ করছিলেন একমনে। বড় মহারাজ এবং মেজ মহারাজ উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'সুপক্ক না হওয়া পর্যন্ত আমলকি জাতে ওঠে না। তাহলে বল পাকামিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। ছোটের খবর কি ?'

মেজ মহারাজ নিবেদন করলেন, 'সুধাময় টেলেক্স পাঠিয়েছে।'

'ছোটে কি ফিরে এসেছে ?'

'আজ্ঞে না। তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।'

'সুধাময় কি জানিয়েছে ?'

মেজ মহারাজ টেলেক্স মারফত প্রাপ্ত খবরটি চোখের সামনে ধরলেন, 'ছোটে প্রত্যহ কলেজে গিয়েই চুপিসাড়ে বেরিয়ে যেত। তাকে সব বিচিত্র জায়গায় দেখা যেত। কখনও কফিহাউসে কখনও খিদিরপুরে। সুধাময়ের প্রধান গোয়েন্দা রায় বলেছে যে ছোটে মাদকজাতীয় ট্যাবলেট গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। সম্ভবত এই কারণে তাকে ট্যাংরাতেও দেখা গিয়েছে। যে ছেলেটির সঙ্গে ছোটেকে এসব জায়গায় দেখা গিয়েছে সে আপাতত কলকাতায় নেই। এমন হতে পারে ছোটে তার সঙ্গেই উধাও হয়ে গিয়েছে। সুধাময়ের এজেন্সি ওকে খুঁজে বের করতে আরও ছদিন সময় চেয়েছে।'

'ছোটে কি ঠিক সময়ে কলেজে ফিরে আসত ?' বাবার গলার স্বর স্বাভাবিক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বাবা মৃদু কামড় দিলেন আমলকিতে। সেটি রেখে দিয়ে পাত্র থেকে আর একটি তুলে নিলেন, 'তিনু কি অধীরচন্দ্র মল্লিকের বসতবাড়ি অধিকার করেছে ?'

বড় মহারাজ জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে এখনও খবর পাইনি।'

'আমি বুঝতে পারি না তোমাদের ভাবনাচিন্তা এত সীমিত কেন ? যে মানুষ তার শেষ ইচ্ছার কথা বারংবার আমাকে জানিয়েছে, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যে আমার কাছে নিবেদিত হয়ে থেকেছে তার কোন মূল্য সে পাবে না ? তিনু যদি আজ এই কর্তব্য সম্পাদন না করে থাকে তাহলে ওকে মহারাজ হিসেবে আর সম্মানিত করবে না। ইউনিস কি বলে ?' দ্বিতীয় আমলকি মুখে দিলেন বাবা। বড় মহারাজ বললেন, 'ইউনিস প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সে সন্দেহ করছে আর কেউ ছোটের খবরাখবর করছে। ওকে সুধাময়ের কথা বলা হয়নি। ইউনিস যে তথ্য পেয়েছে তা সুধাময়ের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি ইউনিসকে বলেছি ধ্যানেশের খবর নিতে। সে কেন এখনও সনাতননাথের আশ্রম থেকে ফিরে আসছে না সেইটেই ভাবার বিষয়। তার বাড়ির টেলিফোন বেজে যাচ্ছে।'

'ধ্যানেশকে সনাতননাথের কাছে পাঠানোটা মেজ'র উচিত হয়নি।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'ধ্যানেশ আমাদের অতি বিশ্বাসভাজন। সে

আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। সবাইকে বলে আপন পিতার চেয়েও আপনি—।' তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন বাবা, 'ঠিকই। কিন্তু পুত্রের স্বভাবের পরিচয় আমি জানি। সে আমার জন্যে জীবন দান করতে পারে। কিন্তু নারীসঙ্গ পেলে মোহিত হয়। শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্খলন হয়েছে তার। আমি ভাবতাম সোনায় খাদ না মেশালে যেমন তা দিয়ে গহনা তৈরি করা যায় না তেমনি শিল্পীর এই স্বভাবকে মেনে নেওয়াই উচিত। না, আমি বলছি না সনাতননাথের আশ্রমে গিয়ে সে নারীর ছলনার শিকার হয়েছে কিন্তু ওর ওপর সবক্ষেত্রে আস্থা রেখে কাজ করতে দেওয়া মানে ওকেই ভুল বুঝতে হতে পারে। বড়, তোমার গৃহিণীর সঙ্গে ছোটের তো মধুর সম্পর্ক ছিল ?'

বড় মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, ছোটের জননীর অভাব সে দূর করেছে বলেই জানি।'

'তাঁকে প্রশ্ন কর। নারীজাতি যদি স্নেহশীলা হয় তাহলে পুরুষের হৃদয়ের কথা অগ্রিম পড়তে পারে। হয়তো ছোটের মনের গতি কোন দিকে যাচ্ছে তা তাঁর আন্দাজে ছিল।'

'সেরকম বুঝলে কি আমাকে জানাতো না বাবা ?'

'স্নেহ বড় বিচিত্র বোধ। শেষ মুহূর্তে সংশোধিত হতে পারে ভেবে সে নিজেকেও প্রতারিত করতে পারে। সনাতননাথের সঙ্গে আনন্দ সরস্বতীর যোগাযোগ এখন চিন্তার বিষয়। আনন্দর শিষ্যরা রাজনীতি করে। কি ধরনের রাজনীতি ?'

'আজ্ঞে নির্বাচন নয়। তারা দেশের মানুষের চরিত্রবদলের জন্যে বিপ্লবের কথা বলে। তারা ধর্মীয় পথে এই সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলার কথা বলে।'

'চমৎকার। আমি আজ রাত্রে নিদ্রার কৃপা পাব না বলেই মনে হচ্ছে। যদি তেমন কোন প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করতে পার।'

এইটে চলে যাওয়ার নির্দেশ। আঙুরের রস ততক্ষণে পরিবেশিত হয়েছে। বড় ও মেজ মহারাজ চলে যেতে উদ্যত হলেন। হঠাৎ বাবা বললেন,'রাজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তোমার শেষ কবে কথা হয়েছিল ?'

বড় মহারাজ বললেন, 'পাঁচ সপ্তাহ আগে।'

'কি যেন বলেছিলেন তিনি ?'

'আপনার আশীর্বাদে ধন্য হতে চান।'

'নির্বাচন কবে ?'

'সম্ভবত মাস ছয়েকের মধ্যেই।'

তাঁরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন কিন্তু বাবা আর কথা বললেন না। ওঁরা ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। চিন্তায় দুজনের মুখ গম্ভীর। হঠাৎ বড় মহারাজ বললেন, 'ভাবতে পারো আমাদের ভাই, বাবার সন্তান মাদকদ্রব্য খাচ্ছে ? যদি শিষ্যরা জানতে পারে তাহলে কি সর্বনাশ হবে !'

মেজ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'খবরটা শোনার পরেই আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি কোন হিসেব মেলাতে পারছি না। ছোটের মুখ মনে করে এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছে না।'

বড় মহারাজ বললেন, 'আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল এই সংবাদটা যাতে

কেউ না জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কোন ঝুঁকি আমি নেব না।'

মাথার ভেতরে যেন কেউ গরম পেরেক ঢুকিয়ে রেখেছে, এমন যন্ত্রণা হচ্ছিল। ধ্যানেশ চোখ মেলল। চোখের সামনে কি রয়েছে বুঝতে সময় লাগল। কিন্তু মাথা পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুতেই। এক ঝটকায় সে উঠে বসতে গিয়ে টলে উঠল। চারপাশে অন্ধকার। দূরে দূরে আলো জ্বলছে। সে বসে আছে ঘাসে। ধ্যানেশ চোখ বন্ধ করল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। নিকট অতীতের কোন ঘটনাই মনে পড়ছে না তার। এই বিশাল মাঠ, ওই দূরের আলো ঠিক কোন জায়গার, তা বুঝে উঠতে সময় লাগল। কয়েক পা টলোমলো পায়ে হাঁটার পর সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল। কবজি চোখের কাছে এনে বুঝল এখন রাত দুটো। আর সে দাঁড়িয়ে আছে গড়ের মাঠের মাঝখানে। তার গাড়ি? ধ্যানেশ চারপাশে ঘুরে কোথাও গাড়ি দেখতে পেল না। সে এখানে এল কি করে? খুব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। এবং তারপরেই বাবার শ্রীমুখ মনে ভেসে উঠলো। সে প্রাণপণে বাবাকে ডাকতে লাগল। পৃথিবীর অন্যসব কিছু বিস্মৃত হয়ে ওই একটি মুখ যেন সে হৃদয় দিয়ে আঁকড়ে ধরল। কতক্ষণ এই অবস্থায় গিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ তার মুখে টর্চের আলো পড়ল। ধ্যানেশ কম্পিত গলায় বলল, 'বাবা!'

একটি শক্ত হাত তার কনুই ধরল। তারপর প্রায় টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে চলল আলোর দিকে। ধ্যানেশ অত্যন্ত তৃপ্ত মনে বলে যাচ্ছিল, 'বাবা, বাবা।' একটা লম্বা ভ্যানের ভেতর প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে দিয়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল, 'চল, শালা, বাপকে দেখবি।' হাতে এবং হাঁটুতে আঘাত লাগল ধ্যানেশের। সে দেখল ভ্যানটা চলছে। ভ্যানের পেছনে আরও দুজন শক্ত চেহারার সাদা পোশাকের মানুষ। এপাশে তিনটে শাড়ি পরা মেয়েছেলে। একজন বলে উঠল, 'মাঝরাতে বুড়ো খোকার বাই উঠেছে দ্যাখো!'

ধ্যানেশ ভ্যানের অন্ধকারে মুখগুলো দেখতে পেল না। সে কাতর গলায় বলে উঠল, 'আপনারা কে জানি না, কিন্তু আমি ধ্যানেশকুমার, গান গাই!'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। একজন বলল, 'তালে আমি হেমামালিনী।' দরজার কাছে বসা দুজন শক্ত চেহারার একজন ধমকে উঠল, 'অ্যাই, চোপ!'

কোন কথা না বলে ওরা লক আপে পুরে দিচ্ছিল ধ্যানেশকে। সে শেষবার মরীয়া হয়ে চিৎকার করতেই কনস্টেবল এমন একটা লাঠির ঘা মারল যে মাটিতে পড়ে যেতে হল। রাত দুপুরে থানার অফিসাররা এদিকে তাকালেন না। ধ্যানেশকে লক আপে পুরে কনস্টেবল বলল, 'নতুন ফ্যাসান হয়েছে। মাল না খেয়ে ড্রাগ খাওয়া।' তারপর চিৎকার করে জানাল, 'মেজবাবু, একটা ড্রাগের পার্টি এসেছে।'

মেজবাবু বললেন, 'সুখ করে নে। ড্রাগে ধরলে আর বাবার বাবাও ছাড়াতে পারবে না। মেজবাবুর সামনে যে লোকটি বসেছিল, তার পরনে সাফারি স্যুট, গায়ের রঙ কালো। মেজবাবু তাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটি কি বলুন তো? কোথাকার কোন বাবার কে হারিয়ে গিয়েছে তাই নিয়ে পুরো শহর

তোলপাড় করছেন। বিকেল থেকে তিনচারবার টেলিফোন হয়েছে শুনলাম। আপনার আগে দুজন এসেছিল। রাত কত হল খেয়াল আছে ?' লোকটি হিন্দী বাংলায় মিশিয়ে বলল, 'বস বলেছে খুঁজতে, খুঁজে যাচ্ছি। বলেছিল সিক্রেট রাখতে, মনে হয় থাকবে না। কলকাতা শহর অনেক বড়। আমরা ধর্মতলার আশেপাশে থানাগুলোয় খোঁজ করছি। তাহলে কুড়ি একুশ বছরের কাউকে আপনারা পাননি ?'

'না। লোকটা, আই মিন ছেলেটা, কোন বাবার চেলা ?'

'বলা নিষেধ অফিসার। তবে শুনেছি ড্রাগ খাওয়া ধরেছিল।'

'বাঃ। কিন্তু ইউনিস সাহেব কাউন্সিলর। তিনি মুসলমান। বাবা তো হিন্দু, তাই না ?'

'আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, বস যা বলবে তাই শুনতে হবে।' লোকটা উঠে দাঁড়াল। একজন সার্জেন্ট এসে বললেন, 'মেয়ে তিনটের একটা লাইনে নতুন।'

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে কোন খদ্দেরের জন্য ঘুরছিল ?'

সার্জেন্ট বললেন, 'রোজগার হয়নি বলে রাতের ঠিক ছিল না।'

'ওই লোকটাও কি ওদের সঙ্গে ছিল ?'

'না। মুখ দেখিনি আমি। তবে একাই ছিল।'

'বয়স কত, কুড়ি-একুশ নাকি ?'

সার্জেন্ট চিৎকার করে কনস্টেবলকে ডাকলেন। লোকটা দরজায় দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে ছোকরা ড্রাগ খেয়েছে তার বয়স কত ?'

'এটা বলা মুশকিল।'

'নিয়ে এস।'

মেজবাবুর সামনে বসা লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কৌতূহলে আবার বসে পড়ল। একটু বাদে কনস্টেবল ধ্যানেশকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে এনে মাটিতে বসিয়ে দিল। সার্জেন্ট বলে উঠলেন, 'কুড়ি-একুশের বাপ মনে হচ্ছে। ড্রাগ খাওয়ার পক্ষে বয়সটা বেশি, তাই না ? কিন্তু ড্রাগ খেয়েছে বুঝলি কি করে ?' বলে এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে চিবুকটা জোর করে তুলতেই চিৎকার ছিটকে বের হল গলা থেকে, 'আরে ! এ তো ধ্যানেশকুমার !'

মেজবাবু এতক্ষণ নির্লিপ্ত হয়ে বসেছিলেন, এবার তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠলেন, 'সেকি ! তুমি সিওর ?' ধ্যানেশের মুখে তখন রক্ত। চুল বিস্ত্রস্ত। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারল না। মেজবাবু ততক্ষণে চিনতে পেরেছেন, 'মুখে রক্ত এল কি করে ?'

কনস্টেবল বলল, 'আপনি তো বললেন সুখ করে নিতে।'

'সর্বনাশ। ইন্ডিয়া-ফেমাস সিঙ্গারের ওপর হাতের সুখ করেছ তুমি ! পুলিশে চাকরি কর বলে কি সংস্কৃতি ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে ? কি করা-যায় বল তো সামন্ত ? মেজবাবুর গলার স্বরে নার্ভাসনেস এখন স্পষ্ট। সার্জেন্ট বললেন, 'এখন আমরা ছাড়লেও উনি ছাড়বেন না। ড্রাগ পরে প্রমাণ করতে পারব না। চোলাই খাইয়ে গায়ে ঢেলে হসপিটালাইজড্ করে দিই। সেশন করে পাব্লিক প্লেসে মারপিট করেছেন বলে একটা কেস স্টার্ট করা যাক।' এইসময় মেজবাবুর

উল্টোদিকে বসা লোকটি বলল, 'আপনার টেলিফোনটা ইউজ করতে পারবো ?'

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? কাকে করবেন ?'

'বসকে।' বলতে বলতে লোকটি রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করেছে।

মেজবাবু বললেন, 'এব্যাপারে কিছু না তো ?'

ততক্ষণে লোকটা কথা বলতে শুরু করেছে, 'বস, ম্যয় বসির বোল রহা হুঁ। হ্যাঁ। এক নম্বরকো নেহি মিলা। বাকি দো নম্বর আভি থানামে হ্যায়। জী। একদম সাচ্চা, ইন্ডিয়া ফেমাস সিঙ্গার ধ্যানেশকুমার। আপ আ রহে ? ঠিক হ্যায়।' টেলিফোন রেখে বসির আলি বলল, 'বস আসছে, তার আগে হসপিটালাইজড্ করবেন না।'

সার্জেন্ট আর মেজবাবু চোখাচোখি করলেন। মেজবাবু বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। আপনি সকাল থেকে খোঁজ নিচ্ছেন কুড়ি-একুশ বয়সের ছেলের। হঠাৎ এই লোকটাকে দরকার হল কেন ?

বসির আলি বলল, 'বস আসুন, তিনিই বলবেন।'

ইউনিস পৌঁছে গেল যখন তখন ধ্যানেশের চেতনা স্বচ্ছ, শরীরের বেদনা প্রবল। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে ইউনিস মেজবাবুকে বলল, 'ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি।'

মেজবাবু বললেন, 'সরি মিস্টার ইউনিস। ওকে ছাড়তে পারছি না।'

ইউনিস শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

মেজবাবু বললেন, 'উনি নেশা করে মারামারি করেছেন। তা ওঁকে হসপিটালাইজড্ করতে হবে। ডেফিনিট কেস আছে। মিস্টার আলির জন্যে—।'

ওঁকে থামিয়ে ইউনিস বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলছি ওঁকে ছেড়ে দিন।'

'অসম্ভব। এখন আর পারব না।' মেজবাবু মাথা নাড়লেন।

বসির আলি বলে উঠল, 'বস, উনলোগ ফলস্ কেসকো প্ল্যান কিয়া।'

ইউনিস বলল, 'ঠিক হ্যায় বসির। অফিসার, একটা ফোন করতে পারি ?'

একটু ইতস্তত করে মেজবাবু বললেন, 'ঠিক আছে করুন।'

ইউনিস টেলিফোন তুলে ডায়াল করল। বেশ কিছুটা সময় বাজার পর সে কথা বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। আমি ইউনিস বলছি। এত রাতে ফোন করছি বলে কিছু মনে নেবেন না। রাত শেষ হয়ে আসছে বলেই তো গুড মর্নিং বললাম। বড়ে মহারাজ আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। একজনকে খুঁজে বের করা। নাম নাই শুনলেন। না-না, শীরফ আদমি। কোন ঝামেলা হবে না। ও আছে এই থানায়। মনে হয় কেউ ফালতু কেস সাজিয়েছে। তা মেজবাবু বলছেন ছাড়া যাবে না। কথাটা বড় মহারাজকে বলতেই হবে। তার আগে ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলে নিই। আপনার ডিপার্টমেন্ট।' ওপাশ থেকে সংলাপ শুনে ইউনিস ইশারায় মেজবাবুকে ডেকে রিসিভার দিলেন। 'হ্যালো' বলেই মেজবাবু এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে 'না স্যার, না স্যার' বলতে শুরু করলেন। তারপর রিসিভার রেখে বললেন, 'আপনারা তো ডেঞ্জারাস লোক। যান নিয়ে

ওকে।'

ড্রাইভারের পাশে বসেছিল বসির আলি। পেছনের সিটে বসে ইউনিস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে পুলিশ কোথায় পেয়েছিল ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।' যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর টনটন করছে, ধ্যানেশ বলল, 'একবার মনে হয় গড়ের মাঠ, তবে নিশ্চিত নই।'

ইউনিস আর কথা বাড়ালো না। বদলে ধ্যানেশ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে ঠিক কে পাঠিয়েছেন ? বাবা কি বড়মহারাজকে— ।' হাত নেড়ে ইউনিস বলল, 'এসব কথায় এখন তো কোন কাজ হবে না। আগে আপনার ট্রিটমেন্ট করা দরকার। বসির, বাঁ দিকের গলিতে ঢুকব আমরা।'

গলির মুখেই নার্সিং হোম। দরজাটা গলির ভেতরে। গাড়ি সেখানে দাঁড়াতে ইউনিস বলল, 'বসির, বেল বাজাও।'

ভোর চারটের সময় নার্সিং হোমের ডাক্তারকে বিছানা থেকে ডেকে তুলতে ঝামেলা করতেই হল। ধ্যানেশকে দেখে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'জয় বাবা। একি অবস্থা আপনার ?'

ইউনিস বলল, 'যা করার করে ফেলুন। লোকজন ওঠার আগেই চলে যাব।'

ডাক্তার যত তাড়াতাড়ি পারলেন ড্রেস করে দিলেন। তারপর একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বললেন, 'ঠিক কি খেয়েছিলেন বলুন তো ?'

ধ্যানেশ উত্তর দিল, 'আমি খাইনি। খাওয়ানো হয়েছিল।'

ইউনিস বলল, 'আমি একটা ফোন করব, আশ্রমে।'

'আশ্রমে ? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' ভদ্রলোক রিসিভার এগিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ বেল বাজার পর বড় মহারাজের গলা পাওয়া গেল। ইউনিস বলল, 'জয় বাবা ! বড় মহরাজ, আমি ইউনিস। দু'নম্বর, মানে ধ্যানেশবাবুকে পেয়েছি। থানায় ধরে নিয়ে এসেছিল। এইমাত্র ওকে রায় নার্সিং হোমে এনে ড্রেস করিয়েছি। হাঁ, এক নম্বরের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছি।' বলে ইশরায় ধ্যানেশকে ডাকল সে। ধ্যানেশের সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল। আঘাতজনিত ব্যাথার কারণে কাঁপুনি নয়, যেন তার হৃৎপিণ্ড সুস্থির হচ্ছিল না। বাবার একটা কাজ সে সুচারু ভাবে করে আসতে পারেনি এই ভয় এবং লজ্জায় তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে আসতে আসতে তার সমস্ত কথা মনে পড়েছে। যে বাবা তাঁর জন্যে এত করেছেন, পথের ধুলো থেকে তুলে এনে সিংহাসনে বসিয়েছেন, তার জন্যে সে কিছুই করতে পারল না। কি দরকার ছিল ওই সরবত জাতীয় পানীয় পান করার ! সে রিসিভার ধরে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে বড় মহারাজের গলা ভেসে এল, 'বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে চলে এস।'

লাইনটা কেটে গেল। ইউনিস লক্ষ করছিল। ধ্যানেশ রিসিভার নামিয়ে রাখতেই বলল, 'কোথায় যাবেন ?' ধ্যানেশ বলল, 'হাওড়া স্টেশন।' তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল পার্সটা ঠিক আছে। তাতে টাকাও রয়েছে। ডাক্তার বললেন, 'আপনার কিন্তু এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত।' ধ্যানেশ বলল, 'আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি তিনিই আমার বিশ্রাম। জয় বাবা।'

বসির আলি একটা ট্যাক্সি ধরে দিতে ধ্যানেশ তাতে উঠে বসল। ভোরবেলায় যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সহজেই হাওড়া স্টেশনে যেতে চায়, তা তার জানা ছিল

না। ইদানিং তো নিজের গাড়ি ছাড়া যাওয়া আসা হয় না। এসি চেয়ার-কারে বসে সে সমস্ত ঘটনাটা ভাববার চেষ্টা করছিল। নিত্যনাথের সঙ্গে সে যে কথা বলেছিল তা স্পষ্ট মনে করতে পারল। চলে যাওয়ার আগে নিত্যনাথ বলেছিলেন সেবা গ্রহণ না করলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। সেই সূত্রে তাকে মিষ্টান্ন এবং পানীয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। ওগুলো খাওয়ার পর আর কোন ঘটনা স্মৃতিতে নেই। অর্থাৎ ওই পানীয়েই কিছু যুক্ত হয়েছিল যা তার চেতনাকে অবশ করে দিয়েছে। কিন্তু কেন ? কি প্রয়োজন হয়েছিল ওদের ওইভাবে অজ্ঞান করে মাঠময়দানে ছেড়ে দেওয়ার ? ওরা ডাকাত নয়। তার পকেটের কোন কিছু খোয়া যায়নি। কথা হল, এই দীর্ঘ সময় সে কোথায় ছিল ? সনাতননাথের আশ্রমে না ময়দানে ? দ্বিতীয়টিতে থাকলে অনেক আগেই পুলিশের নজরে পড়ত। সনাতননাথের আশ্রমে থাকলে তার গাড়ির ড্রাইভার নিশ্চয়ই—ধ্যানেশ নড়েচড়ে বসল। এখনও শরীরে ব্যথা। আচ্ছা, লোকটা কোথায় গেল গাড়ি নিয়ে ? সে কি এখনও ওই আশ্রমে তার জন্যে অপেক্ষা করে চলেছে ! ইউনিসকে ওর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়নি। ইউনিসই বা তাকে খুঁজে বের করার আদেশ এরমধ্যে কখন পেল ? এসব ভাবনা তাড়াহুড়োয় তার মাথায় তখন আসেনি। কিন্তু ধ্যানেশ আবার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করল। যদি পুলিশ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করত তাহলে, ভাবতেই সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ধ্যানেশকুমার মদ্যপান করে ময়দানে মারপিট করে আহত হয়েছেন ; খবরের কাগজ তো প্রথম পাতায় ছেপে দিত। ব্যস ! সঙ্গে সঙ্গে জনতার কাছে তার ছবিটা হয়ে যেত ছিন্নভিন্ন।

ট্রেন থেকে নামতেই ধ্যানেশ অবাক। মেজ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গে কেউ নেই। আশ্রমের সুবিধের জন্যে একটি স্টেশন তৈরির আবেদন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্মত হয়েছেন কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ হতে দেরি আছে। এখন যেখানে নামতে হয়, সেখান থেকে আশ্রমের দূরত্ব আছে। ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বেশির ভাগ সময় ধ্যানেশ কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে সটান চলে আসে। নইলে স্টেশনে ট্যাক্সিওয়ালারা তাকে দেখতে পেলেই কৃতার্থ হয়ে ছুটে আসে। মেজ মহারাজ তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ধ্যানেশ সোজা দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করতেই পিঠ টনটন করে উঠল। তাকে ইশারায় আসতে বলে মেজ মহারাজ বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আজ একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল ধ্যানেশ। এসি চেয়ারকারে কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। হয়তো অসুস্থ ভেবেই করেনি। কিন্তু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অথবা বাইরে যাওয়ার পথে সবাই সসম্ভ্রমে মেজ মহারাজকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। হয়তো তার মাথার ব্যান্ডেজ, মলিন জামাকাপড় ওদের দেখা ধ্যানেশকুমারের থেকে একটা আলাদা চেহারা দিয়েছে, যা কেউ মেলাবার কথা ভাবছিল না। কৌতুকবোধের সঙ্গে সঙ্গে একধরনের অভাববোধ ধ্যানেশের মন বিমর্ষ করে তুলছিল। জনপ্রিয়তায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে মন সর্বত্র অবহেলার ভূত খোঁজে।

গাড়িতে বসে মেজ মহারাজ বিমর্ষভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। এখন দুপুর ! ধ্যানেশ খানিকটা ইতস্তত করে বলল, 'মহারাজ ! ছোটে মহারাজের

কোন খবর পাওয়া গিয়েছে ?'

স্থির গলায় মেজ মহারাজ বললেন, 'এখনও না।'

এর পরে কোন কথা নেই। ধ্যানেশের অস্বস্তি বাড়ছিল। ইদানিং আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে না। কারণ সবাই জানে সে বাবার বিশেষ স্নেহভাজন পুত্র। মেজ মহারাজ কি কোন নির্দেশেই এমন ব্যবহার করছেন ? চিন্তা করতে পারছিল না ধ্যানেশ। বাবা বিরূপ হলে তার বেঁচে থাকাই অর্থহীন হয়ে যাবে ! এক্ষেত্রে মৃত্যুই শ্রেয়।

ধ্যানেশ বলার চেষ্টা করল, 'মহারাজ ! আমি কর্তব্য সম্পাদন করেছিলাম।'

মেজ মহারাজ গম্ভীর মুখে বললেন, 'এসব কথা বড় মহারাজ শুনবেন। এত ব্যস্ত হবার তো কোন কারণ নেই।' আশ্রমের অতি চেনা পথ হঠাৎ অচেনা মনে হচ্ছিল ধ্যানেশের কাছে।

বিকেল তিনটার সময় পর পর তিনটি গাড়ি এসে থামল শ্রীশ্রীসনাতননাথের আশ্রমের সামনে। প্রহরীরা সম্ভবত আগে থেকেই সজাগ ছিল। অত্যন্ত দ্রুততায় তারা ফটক খুলে গাড়িগুলোকে ভেতরে প্রবেশের পথ করে দিল। নিত্যনাথ লনে অপেক্ষা করছিলেন যুক্তকরে। প্রথম গাড়ি থেকে আনন্দ স্বরস্বতী নামামাত্র বললেন, 'সুস্বাগতম্। মহাপুরুষের তরফ থেকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

আনন্দ সরস্বতীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আমরা যখন একত্রিত হয়েছি তখন মহাপুরুষ শব্দটি ব্যবহার না করলেই খুশি হব।'

নিত্যনাথ সবিনয়ে বললেন, 'আমরা তাঁকে মহাপুরুষ বলেই মনে করি।'

'সে স্বাধীনতা আপনাদের আছে। কিন্তু আমরা মনে করি মহাপুরুষ শব্দটি বিভেদ সৃষ্টি করবে। শুরুতেই দ্বিমত পোষণ করা কি সঙ্গত হবে ?' আনন্দ সরস্বতী চারপাশে নজর বোলাচ্ছিলেন। কোন মানুষজন, কোন ভক্তশিষ্যকে তিনি দেখতে পেলেন না।

শ্বেতপাথরের ঘরে সুদৃশ্য আসনে বসে আলোচনা শুরু হবার আগে প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী বললেন, 'আমরা শ্রীশ্রীসনাতননাথের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন কথা হতে পারে না।'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের সঙ্গে মহর্ষি প্রাণদীপ একমত হলেন। নিত্যনাথ এইসব কথা সকৌতুকে শুনে বললেন, 'আজ সকাল থেকেই,মহাপুরুষ, এই শব্দটিতে আপনারা আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু এছাড়া অন্য কোন শব্দ জিহ্বা উচ্চারণ করতে অক্ষম। তিনি যোগাবিষ্ট ছিলেন, দুপুরের আহারও গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তবে যেহেতু তিনি এই আলোচনা সভার আয়োজক তাই অবশ্যই আপনাদের দেখা দেবেন।'

নিত্যনাথ কথা শেষ করা মাত্র দুজন শিষ্য ঘরে ঢুকে জানাল,'মহাপুরুষ আসছেন।' আর তারপরেই ষাটোর্ধ্ব এক সুন্দর পুরুষ ঘরে প্রবেশ করে দুই হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করলেন। তিনজনেই তৎক্ষণাৎ বিরূপ মানসিকতা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি-নমস্কার জানালেন। শ্রীশ্রীসনাতননাথের ঠিক পেছনে আশ্রমাধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের দিকে তিনি না তাকিয়ে বললেন,

'এবার তোমরা নিজের কাজে যাও।' আশ্রমাধ্যক্ষের সঙ্গে শিষ্যরা বেরিয়ে গেলে শ্রীশ্রীসনাতননাথ অন্য তিনজন গুরুর সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন। নিত্যনাথ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে ঈষৎ দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীসনাতননাথ বললেন, 'আপনাদের মত সাধুজন আমার আমন্ত্রণে এখানে পদধূলি দিয়েছেন বলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি।'

আনন্দ সরস্বতী বললেন, 'এইরকম একটি মিলনের প্রয়োজন আমি ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কিছুদিন থেকেই অনুভব করছিলাম। আপনার আহ্বান পেয়ে মনে হল সময় হয়েছে।'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী বললেন, 'আজ হিন্দুধর্ম বিপন্ন। মুশকিল হল এক্ষেত্রে যেন কারো কিছু করার নেই। ইসলাম বিপন্ন হলে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েন, খ্রীষ্টানরাও নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, শুধু আমাদের দেশে হিন্দুরাই বড় উদাসীন। তাঁরা একটু শিক্ষিত হলে মন্দিরে যাওয়া তো দূরের কথা, বারোয়ারি পুজা প্রাঙ্গণেও উপস্থিত হয় না। ধর্ম সম্পর্কে এই অবহেলা প্রকাশের সাহসই কিছু মানুষকে দুঃসাহসী করে তুলতে সাহায্য করেছে।'

শ্রীশ্রীসনাতননাথ বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এটা আশার কথা, যাদের কথা আপনি বললেন তারা মাত্র কুড়িভাগের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু আশি ভাগ মানুষ এখনও ধর্মে বিশ্বাস করে। উপনয়ন, বিবাহবিধি, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মের আশ্রয় নেয়। ওই কুড়ি ভাগের মধ্যে অন্তত উনিশভাগ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর নাস্তিক হয়ে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে সম্ভবত আমরা যারা হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ চাই তাদের কাজ করতে কোন অসুবিধে নেই।'

আনন্দ সরস্বতী মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'কিন্তু এর সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব বলে সমবেত হয়েছি তার সম্পর্ক কোথায়?'

শ্রীশ্রীসনাতননাথ বললেন, 'প্রসঙ্গে আসছি। মানুষ ধর্মের কাছে কি চায়? আশ্রয়। কিসের আশ্রয়? না আত্মার। ধর্মের ওপর নির্ভর করতে চায় সে। জীবন ধারণের ক্লান্তি বা আনন্দের তাৎক্ষণিকতার বাইরে যে চিরন্তন শান্তির জগৎ আছে তার কেন্দ্রতে পৌঁছতে চায়। মৃত্যুর পরে এই জীবনের সমস্ত কাজের বিচার হয়। সেই মহা সময়ের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতেই ধর্মের আশ্রয় দরকার হয়। হিন্দুধর্ম সেই আশ্রয় দিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। অপার্থিব আনন্দময় জগতে পৌঁছে দিয়েছে আশ্রয়প্রার্থীকে। শুধু এই কারণেই পশ্চিমের ক্ষুব্ধ-হৃদয় মানুষেরা প্রায়ই ছুটে আসছেন ভারতবর্ষে, এসে আমাদের বলছেন, দীক্ষা দাও।'

এই পর্যন্ত বলা মাত্র প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী বলে উঠলেন, 'তাঁরা আসছেন আপনার এবং মহর্ষি প্রাণদীপের কাছে। তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করাই সঙ্গত।'

শ্রীশ্রীসনাতননাথের ঠোঁটে হাসি ফুটল। সেটাকে দমন করে তিনি বললেন, 'পিতার যেমন পুত্রের প্রতি কর্তব্য রয়েছে, শিক্ষকের যেমন ছাত্রের জন্যে ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন আছে তেমনি আমাদের ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের সঠিক পথে চালনা করার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি,

বাহ্যিক চটক এবং পাইয়ে দেবার মোহ ছড়িয়ে কেউ কেউ সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করছেন। আগুনের স্বরূপ না জেনে যেমন পতঙ্গ তার ঔজ্জ্বল্য দেখে ধাবিত হয় তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে যাচ্ছে সেই পাওয়ার আশায়। এতেও আমার আপত্তি করার কিছু ছিল না। হিন্দুধর্ম আমাকে শিখিয়েছে সহনশীল হতে। কিন্তু প্রকৃত ধর্মভীরু মানুষেরা এই ফাঁদে পা দিচ্ছে। যে সমস্ত শিষ্যরা আমার আপনার শরণার্থী ছিল তারা ক্ষণিক পাওয়ার মোহে বিভ্রান্ত হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম তারা যদি সেখানে গিয়ে ধর্মের আশ্রয় পায় তো আমি আপত্তি করব কেন ? কিন্তু কি পাচ্ছে তারা সেখানে ! আপনি কি এ বিষয়ে কোন তথ্য পেয়েছেন ?' প্রশ্নটি আনন্দ সরস্বতীর উদ্দেশে। তিনি মাথা নাড়লেন, 'জেনেছি। তিনি একটি সাম্রাজ্য তৈরির চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে তার পঁচাত্তর ভাগ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি কোন ধর্মীয় শাস্ত্রের কথা বলেন না। হিন্দু ধর্মের পূজা পদ্ধতি বা তার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করেন না। তিনি শুধু বলেন মানুষ হতে। কিভাবে মানুষ হবে তার ব্যাখ্যাও অদ্ভুত। কিন্তু তাঁর কাছে গেলে কিছু পাওয়া যায় এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি অবশ্য বলেন শূন্য থেকে মুঠোয় কিছু ধরতে পারেন না, কোন অলৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মৃতের শরীরে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন না। অথচ দেখা গেছে সব শিষ্যই তাঁর কোন না কোন অলৌকিক উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ।'

'হ্যাঁ। এইটেই বিস্ময়ের।' এতক্ষণে মহর্ষি প্রাণদীপ কথা বললেন। একটি-দুটি ঘটনা ঘটলে বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু—।'

আনন্দ সরস্বতী বললেন, 'মানুষের মনে সবসময় একটা কুসংস্কার ওত পেতে থাকে। সন্ধ্যেবেলায় কোন বিপদে পড়লে সকালে যার মুখ দেখে শয্যা ত্যাগ করেছে তাকে দায়ী করে। কোন আপাত অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেলে সে আপনি একটা কারণ ঠাওরে নেয় এবং যেহেতু তা বাবা করেছেন ভাবতে পারলে সুখ হয় তাই বাবার নামেই চালায়। যারা আশ্রমে টেলেক্স রাখে, ট্রাক্টর চালায়, মাছ না খেয়ে মাছের চাষ করে, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে, তাদের গুরু যদি অলৌকিক কাণ্ড করতে পারেন তাহলে এসবের প্রয়োজন হত না।'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে কোটি কোটি শিষ্য হল কিভাবে ?'

'কোটি শব্দটি অত সস্তা নয়।' আনন্দ সরস্বতী বললেন, 'লক্ষ করে থাকবেন নিশ্চয়, এদেশের প্রশাসনের ওপরতলার বেশ কিছু মানুষ ওঁর শিষ্য। তারা আরও ওপরে ওঠার জন্যে শিষ্য হয়েছে। সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়লে বাবা ওইসব শিষ্যদের দিয়ে উপকার করিয়ে দেন। ব্যবসায়ীরা ওঁর শিষ্য। কারণ বাবার নির্দেশে তাঁরা ব্যবসা পান। এসব করে বাবা নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকেন না। কোটি কথাটি ছেড়ে দিন, যদি পঞ্চাশ লক্ষ শিষ্য প্রতিমাসে বাবার কাছে ত্রিশ টাকা প্রণামী হিসেবে পাঠায় তাহলে বাবার মাসিক আয় কত দাঁড়াচ্ছে, ভাবুন !'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী বললেন, 'সেকথা শুনেছি। দুই পুত্র বাদে বাবার দশজন নির্বাচিত প্রধান শিষ্য রয়েছে যাদের মহারাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেইসব মহারাজের প্রত্যেকের শতাধিক প্রধান শিষ্য বর্তমান। এই শিষ্যরা নিয়মিত দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে বাবার হয়ে। সাধারণ মানুষকে নিয়মিত সঞ্চয় করে

আশ্রমে টাকা পাঠাতে হয় যাতে আশ্রমের কাজ অর্থাভাবে নষ্ট না হয়। অবশ্য এই পাঠানোর ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে অর্থ সঞ্চিত হল তার একটা ক্ষুদ্র অংশ সেইসব প্রধান শিষ্যের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা বাবার বাণী প্রচার করতে পারেন। কি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা! এর ফলে শতাধিক প্রধান শিষ্য নিজের স্বার্থের জন্যেই চিরকাল বাবার অনুগত হয়ে থাকবে।'

শ্রীশ্রীসনাতননাথ চুপচাপ শুনছিলেন কথাবার্তা। এবার বললেন, 'অন্যের ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কোন যুক্তি নেই। আমাদের শিষ্যরা নিজে থেকেই আশ্রমে দান করে থাকেন। বিদেশী ভক্তদের কথা আপনারা বললেন। হ্যাঁ, আমার এবং মহর্ষি প্রাণদীপের আশ্রমে তাদের নিয়মিত দেখা যায়। কিন্তু বাবার আশ্রমে কোন বিদেশী যায় বলে শুনিনি। কেন যায় না? না, সেখানে তারা আত্মার আরাম পায় না। এসব থাক। এই বাবা হিন্দুধর্মের প্রতি যেমন অনুগত নন তেমন কোন অলৌকিক ক্ষমতাও নেই। এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। সম্প্রতি ওঁর ছোট পুত্র কলকাতা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই পুত্র ভাবী মহারাজ হিসেবে নির্বাচিত ছিল। উনি তো এই বিশাল সম্পত্তি পরিবারের বাইরে যেতে দেবেন না। যা হোক, ওঁর ধারণা হয়েছে আমি বিদ্বেষবশত ওঁর পুত্রকে হরণ করেছি। এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কি আছে। উনি যদি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতেন তাহলে দিব্যদৃষ্টিতেই পুত্রের হদিশ পেতেন। আমার আশ্রমে দূত পাঠাতে হত না।'

আনন্দ সরস্বতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর কনিষ্ঠ পুত্র নিরুদ্দিষ্ট? কি করত সে?'

'কলকাতার কলেজে থেকে পড়াশুনা করত।'

'কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের অংশীদার হবার প্রলোভন ছেড়ে সে কেন উধাও হতে যাবে?'

'সেইটেই বিস্ময়কর। আমার ধারণা সে কোথাও যায়নি। তাকে উধাও করে দায় আমার ওপর চাপাতে চাইছেন বাবা। আমাকে চিহ্নিত করে জনসমক্ষে হেয় করতে পারলে তাঁর সুবিধে হবে।'

'কি সুবিধে?'

'উনি চান না, এদেশে আর কেউ নিজের মত করে ধর্মাচরণ করুক। মুখে সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন কিন্তু বাস্তবে একাই রাজত্ব করতে চান। আমার শিষ্যসংখ্যা, বিদেশে আমার প্রচার হয়তো বেশি বলেই তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন আঘাত করতে।'

মহর্ষি প্রাণদীপ বললেন, 'যদিও আপনার এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই তবু যদি বাবা এইরকম পরিকল্পনা করে থাকেন তবে পরবর্তীতে আঘাত আমাদের ওপরেও আসতে পারে। অতএব এখনই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'কি ভাবে?'

আনন্দ সরস্বতী বললেন, 'ধর্ম রক্ষার জন্যে প্রত্যাঘাত করা প্রকৃত ধার্মিকের কর্তব্য।'

'যদি বাবা আমাদের ওপর কোন কল্পিত অভিযোগ চাপিয়ে দেন তাহলে

আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বাবার কনিষ্ঠ পুত্রটি কোথায় থাকতে পারে আপনার ধারণা?'

শ্রীশ্রীসনাতর্নাথ তাঁর প্রধান শিষ্য নিত্যনাথের দিকে তাকালেন। নিত্যনাথ তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ। এবার ইঙ্গিত বুঝে বললেন, 'কিন্তু বাবার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটে মহারাজ সত্যি সত্যি উধাও হয়েছেন। কলকাতার যে বাড়ির চারতল্লায় তিনি থাকতেন সেখানে খবর নিয়েছিলাম। যদিও কেউ সত্য প্রকাশ করতে চায়নি তবু দুজন লোককে ওই কারণে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাবার শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন শহর তোলপাড় করে ফেলছে ছোটে মহারাজকে সন্ধান করার জন্যে। শেষ যা জেনেছি, ওকে এখনও পাওয়া যায়নি।'

মহর্ষি প্রাণদীপ বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু আগে শুনলাম বাবার কনিষ্ঠ পুত্র এখনও মহারাজ আখ্যা পায়নি। তাহলে আপনি ছোটে মহারাজ বলছেন কেন?'

নিত্যনাথ বললেন, 'ওটা বাবা আদর করে বলে থাকেন। সেই থেকেই ওই নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। গতকাল বাবার এক গৃহী শিষ্য মহাপুরুষের দর্শন প্রার্থনা করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। অনুমতি পেয়ে আমিই ওর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বাবার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসে অযথা আমাদের অনেক কুকথা বলে শাসিয়ে যান। এইসব ব্যাপার রীতিমত অপমানজনক। এই শিষ্যটি বাবার কল্যাণে গানবাজনার লাইনে খ্যাতি পেয়েছে। বাবা চান শিল্প সংস্কৃতির বিখ্যাত মানুষদের কিছু সুযোগের ব্যবস্থা করে শিষ্য হিসেবে আরও প্রচারিত করতে, যাতে সাধারণ মানুষরা এদের দেখে বাবার প্রতি আরও মুগ্ধ হন। কিন্তু সেই শিল্পীশিষ্যের ব্যক্তিজীবন অত্যন্ত নিচুমানের। বাবার শিষ্য হয়ে তিনি সবরকম সুযোগ নিচ্ছেন খ্যাতির পথে, কিন্তু সুরা এবং মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত। আমরা বাবাকে জানাতে চাই যে এইরকম শিষ্যকে তিনি যেন দূত হিসেবে আমাদের আশ্রমে পাঠিয়ে এখানকার মাটিকে অপবিত্র না করেন।'

আনন্দ সরস্বতী কৌতূহলী হলেন, 'তার এই চরিত্রহীনতার প্রমাণ জোগাড় করা দরকার।' নিত্যনাথ বললেন, 'মহাপুরুষের, হ্যাঁ আমার অভ্যাস এবং বিশ্বাস আমারই, আশীর্বাদে আমি সেই প্রমাণ পেয়েছি।'

প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রমাণ কিসের?'

নিত্যনাথ বললেন, 'ধ্যানেশকুমারের চরিত্রহীনতার ছবি।'

শ্রীশ্রীসনাতননাথ হাত তুললেন, 'অন্যের কুরুচির নিদর্শন আর আমরা দেখতে চাই না। তুমি ওগুলোর কপি এবং একটি পত্র বাবার কাছে পাঠিয়ে দিও।' আনন্দ সরস্বতী বললেন, 'কিন্তু বাবার ছোট ছেলে যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে খুঁজে বের করা দরকার। আমরা যদি তাকে পেয়ে যাই, আচ্ছা, পুলিশকে খবর দিয়েছে ওরা?'

নিত্যনাথ মাথা নাড়লেন, 'না। বাবা জানেন পুলিশ মানেই প্রচার।'

'তাহলে তো অতি উত্তম। আমরা যদি ছোটে মহারাজকে খুঁজে পাই তাহলে বাবাকে আমাদের মত আচরণ করতে বাধ্য করব। কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে?' আনন্দ সরস্বতী প্রশ্ন করলেন।

'সেইটেই বিস্ময়ের।' নিত্যনাথ জবাব দিলেন।

মহর্ষি প্রাণদীপ জানতে চাইলেন, 'সেকি পিতৃবিদ্বেষী? দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ?'

'তাও জানি না। ওকে সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না।'

চারজন ক্রমশ আরও বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নিলেন। হিন্দুধর্ম বিপন্ন এ ব্যাপারে যখন চারজন একমত, তখন তা রক্ষা করার জন্যে যে কোন পর্যায়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ওঁরা করলেন। পর পর তিনটি পরিকল্পনা নেওয়া হল ছোটে মহারাজকে খুঁজে বের করার চেষ্টা ছাড়া। অবিলম্বে একটি মহাসম্মেলন ডেকে হিন্দুধর্মের প্রকৃতরূপ সাধারণ মানুষকে বোঝাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আনন্দ সরস্বতী প্রস্তাব দিলেন সেই সম্মেলনে বাবাকেও আমন্ত্রণ জানানো হোক। তিনি যদি বিপরীত কিছু বলতে চান তাহলে সেটা খণ্ডন করে জনসাধারণের কাছে তার স্বরূপ নগ্ন করে দেওয়া যাবে। আর এখন থেকে এঁরা সর্বসম্মতভাবে কাজ শুরু করবেন বলে স্থির করলেন। যদিও প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী বারংবার দ্বিমত প্রকাশ করছিলেন তবু বাকিরা বৃহত্তর স্বার্থে তা উপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন। বিদায় নিয়ে তাঁরা যখন গাড়িতে উঠলেন তখনও শ্রীশ্রীসনাতননাথের বিশাল আশ্রমপ্রাঙ্গণ জনশূন্য। প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছিলেন বাইরে বেরিয়ে শ্রীশ্রীসনাতননাথের শিষ্যরা, বিশেষ করে বিদেশীরা নাকি এখানে গিজগিজ করে। কই, তাদের একটিকেও দেখছি না যে।'

আনন্দ সরস্বতী জবাব দিয়েছিলেন, 'গুরুর অস্তিত্ব নির্ভর করে শিষ্যের ওপরে। আপনি কি চাইবেন, আপনার শিষ্যকে আমার কাছে ছেড়ে দিতে? তারওপর বিদেশী বলে কথা।' ওপরের জানলায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীসনাতন এঁদের বিদায়দৃশ্য দেখছিলেন। বিপদের সময় বড় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ছোট শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে হয়, এটা যেন কার কথা? তাঁর মনে হল মহর্ষি প্রাণদীপ বেশি কথা বলেননি। কেন?

প্রায় বারো ঘণ্টা হয়ে গেছে ধ্যানেশ আশ্রমে আবদ্ধ। মেজ মহারাজ তাকে অতিথিশালায় পৌঁছে দেবার পর আর কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। ধ্যানেশ কয়েকবার টেলিফোন তুলে বড় মহারাজকে চেয়েছিল কিন্তু অপারেটার প্রতিবারই বলেছে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন আর বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাওয়ার সাহস তার নেই। এর আগে যখনই সে এখানে এসেছে পায়ে হেঁটে অথবা প্রয়োজন বোধ করলে গাড়িতে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। আনন্দভবনে সরাসরি যাওয়ার স্বাধীনতা তার ছিল। কিন্তু আজ যতবার সে অতিথিশালা থেকে বেরুতে চেয়েছে ততবারই সেবকরা জানিয়েছে আপনার ওপর আদেশ হয়েছে ঘরেই অপেক্ষা করার। ধ্যানেশ বুঝতে পেরেছিল তার জায়গা আর ঠিক জায়গায় নেই। এইসব সামান্য সেবকরা সাহস পেত না তার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলতে। চরম কোন দুর্ভাগ্য নেমে আসছে তার ওপরে। বাবার যদি তাই ইচ্ছা হয় তাহলে কিছুই করার নেই। শরীরে এখনও ব্যথা। মন অবসন্ন। ধ্যানেশের মনে হল অনেককাল গান গাওয়া হয়নি। এই অবস্থায় গান গাইতে চাওয়া হাস্যকর ব্যাপার।

রাত বারোটায় একজন সেবক এসে নিদ্রাহীন ধ্যানেশকে জানাল, বড় মহারাজ

তার জন্যে আনন্দভবনে অপেক্ষা করছেন। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবার বেদনা টের পেল। থানার মেজবাবুর কাছে অনুমতি পাওয়ামাত্র কনস্টেবলটি বেধড়ক ঠেঙিয়েছে তাকে। ইউনিস যদি উপস্থিত না হত তাহলে যে কি পরিণাম হত ! ইউনিসের উপস্থিতি তো বাবারই ইচ্ছায়। তার মানে বাবা তাকে প্রহার থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। মনে নবীন বল পেল ধ্যানেশ। সেবকটির সঙ্গে মধ্যরাতের আশ্রমের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে সে ক্রমাগত বাবানাম জপ করে যাচ্ছিল। এতরাত্রে আনন্দভবনের সামনে কোন জমায়েত নেই। অতিথিশালার সেবকটি আনন্দভবনের সেবকের কাছে তাকে সমর্পণ করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। আনন্দভবনের সাধক তাকে নিয়ে চলল সিঁড়ি ভেঙে।

বাবা দাঁড়িয়েছিলেন একটি বিশাল রঙিন মাছের চৌবাচ্চার সামনে। কাচের ভেতর আলোয় তাদের চমৎকার দেখাচ্ছে। বাবার হাতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল। তিনি নীরবে তা একটা একটা করে চৌবাচ্চার ওপরের খোলা অংশ দিয়ে জলে ফেলছিলেন। বড় একটি ফাইটার সবাইকে সরিয়ে আগে এসে সেই খাবার খেয়ে নিচ্ছিল। অন্যেরা বোকার মত সেই খাওয়া দেখছিল। ঘরের একপাশে বড় মহারাজ একটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। ধ্যানেশ ঘরে ঢুকেই ওঁদের দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে বাবার দুই চরণ জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সশব্দে। মাছের খাবার দিতে দিতে বাবা একবারও মুখ নামিয়ে ধ্যানেশকে দেখলেন না। বড় মহারাজ সতর্ক হয়ে এগিয়ে এসে বাবাকে শান্ত দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ধ্যানেশ তখন কাতর গলায় কেঁদে বলছে, 'বাবা, আমাকে বাঁচান। বাবা, আমি আপনার ছেলে। আপনাকে জ্ঞানত কোন অসম্মান করিনি আমি। বাবা গো।'

যতক্ষণ হাতের খাবার শেষ না হল ততক্ষণ বাবা ধ্যানেশের দিকে নজর দেবার সময়ই পেলেন না। কেউ যে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে তাও যেন তাঁর হুঁশে নেই। খাবার শেষ হলে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'বড়, ওকে উঠে বসতে বল।' বড় মহারাজকে কিছু বলতে হল না। ওই কণ্ঠস্বরে ধ্যানেশের হাত শিথিল হয়ে এল। ধীরে ধীরে সে বাবার চরণ ছেড়ে দিল। বাবা এগিয়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বললেন, 'বড়, গঙ্গাজল আনো। আমার পায়ে দাও। বড় জ্বলছে।' বড় মহারাজ একটি পাথরের পাত্র থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে বাবার চরণে সযত্নে লেপন করলেন। করে প্রণাম সারলেন। নিজেকে রোগগ্রস্ত সারমেয়র মত মনে হচ্ছিল ধ্যানেশের। সে উঠে দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছিল না।

কিন্তু বাবা আদেশ করলেন, 'ধ্যানেশ এখানে উঠে এস।' বাবা ততক্ষণে চলে গিয়েছেন টেবিলের ওপাশে। কাঁপতে কাঁপতে ধ্যানেশ তার কিছু দূরে উপস্থিত হল। বাবা বললেন, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি নিজের অতীত ভুলে গেলে কি করে ধ্যানেশ ?'

'ভুলিনি বাবা। আমি সবসময় আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত।' ডুকরে উঠল সে।

'মিথ্যে কথা ! তুমি আমাকে ব্যবহার করেছ নিজের ভোগ লালসা চরিতার্থ

করতে।'

'না বাবা, না। আপনি সারাক্ষণ আমার অন্তরে আছেন—'

ধ্যানেশ অসহায় চোখে তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বড় মহারাজ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানেশ মরীয়া হয়ে বলল, 'আমি আপনার আদেশ পালন করেছি ঠিকঠাক। নিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনাকে একবারও অপমানিত হতে দিইনি। তিনি যখন সেই চেষ্টা করছিলেন তখন আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের বক্তব্য ওঁর কাছে স্পষ্ট বলতে কোন দ্বিধা করিনি। কিন্তু—।'

'থামলে কেন, বল?'

'কিন্তু উনি আতিথ্য নিতে এমন পীড়াপীড়ি করলেন আর আমি ভুলেও ভাবিনি ওই সরবতের মধ্যে কোন মাদক মেশানো রয়েছে। আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল।'

'তোমার কথার কোন প্রমাণ দিতে পারবে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে তোমার ড্রাইভারকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছে। তোমার গাড়ি ছিল পার্কস্ট্রীটের একটি কুখ্যাত বাড়ির সামনে। আর।—' বাবা বাম হাতের একটি আঙুল ঘৃণার সঙ্গে তুলে ধরলেন, 'এইগুলো আশ্রমের ডাকবাক্সে পাওয়া গিয়েছে।'

ধ্যানেশ কম্পিত হাতে খামটা তুলে নিল। ভেতরে কয়েকটা ফটোগ্রাফ এবং একটি চিঠি। বাবা বললেন, 'চিঠিটা জোরে পড়।'

ধ্যানেশের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে কোনমতে পড়ল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের আজ পর্যন্ত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু একথা কি আমরা বলতে পারি, যদি আপনি আমাদের মহাপুরুষের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন না করেন? যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্য আপনি বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন তা আমাদের অজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের আশ্রমের পবিত্রতা একজন ধর্মগুরু হিসেবে আপনি রক্ষা করবেন। এমন কাউকে পাঠানো কি আপনার উচিত হয়েছে যার জীবন পঙ্কিলময়? সঙ্গের ছবিগুলো তার প্রমাণ।' ধ্যানেশ ছবির বাণ্ডিল দেখে আঁতকে উঠল। এই অশ্লীল ছবি তার? এই মেয়েরা কারা যাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না!

ধ্যানেশের মুখ থেকে কথা সরছিল না। তার হাত থেকে ছবিগুলো পড়ে গেল টেবিলের ওপর। পরক্ষণেই সে যেন শক্তি ফিরে পেল। প্রবল আক্রোশে ছবিগুলো তুলে নিয়ে সে ছিঁড়তে লাগল। যেন এই কুশ্রীতার চিহ্ন সে আর রাখবে না। বাবা বললেন, 'কত ছবি তুমি ছিঁড়বে ধ্যানেশ? ওরা কপি পাঠিয়েছে। ইচ্ছে করলে লক্ষ লক্ষ কপি চারধারে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভেবে দ্যাখো, এর যে কোন একটা কপি খবরের কাগজে ছাপা হলে আমার শিষ্যদের হৃদয় কি পরিমাণে ব্যথা পাবে। তাদের পিতা হিসেবে আমি সেটা চাইতে পারি না।'

'আমি-আমি।' টুকরোগুলো মুঠোয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল।

'না। তোমার কথা এখন চিন্তা করার কোন যুক্তি নেই। তুমি আর

করতে।'

'না বাবা, না। আপনি সারাক্ষণ আমার অন্তরে আছেন—'

ধ্যানেশ অসহায় চোখে তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বড় মহারাজ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানেশ মরীয়া হয়ে বলল, 'আমি আপনার আদেশ পালন করেছি ঠিকঠাক। নিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনাকে একবারও অপমানিত হতে দিইনি। তিনি যখন সেই চেষ্টা করছিলেন তখন আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের বক্তব্য ওঁর কাছে স্পষ্ট বলতে কোন দ্বিধা করিনি। কিন্তু— ।'

'থামলে কেন, বল?'

'কিন্তু উনি আতিথ্য নিতে এমন পীড়াপীড়ি করলেন আর আমি ভুলেও ভাবিনি ওই সরবতের মধ্যে কোন মাদক মেশানো রয়েছে। আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল।'

'তোমার কথার কোন প্রমাণ দিতে পারবে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে তোমার ড্রাইভারকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছে। তোমার গাড়ি ছিল পার্কস্ট্রীটের একটি কুখ্যাত বাড়ির সামনে। আর।—' বাবা বাম হাতের একটি আঙুল ঘৃণার সঙ্গে তুলে ধরলেন, 'এইগুলো আশ্রমের ডাকবাক্সে পাওয়া গিয়েছে।'

ধ্যানেশ কম্পিত হাতে খামটা তুলে নিল। ভেতরে কয়েকটা ফটোগ্রাফ এবং একটি চিঠি। বাবা বললেন, চিঠিটা জোরে পড়।'

ধ্যানেশের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে কোনমতে পড়ল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের আজ পর্যন্ত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু একথা কি আমরা বলতে পারি, যদি আপনি আমাদের মহাপুরুষের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন না করেন? যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্য আপনি বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন তা আমাদের অজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের আশ্রমের পবিত্রতা একজন ধর্মগুরু হিসেবে আপনি রক্ষা করবেন। এমন কাউকে পাঠানো কি আপনার উচিত হয়েছে যার জীবন পঙ্কিলময়? সঙ্গের ছবিগুলো তার প্রমাণ।' ধ্যানেশ ছবির বাণ্ডিল দেখে আঁতকে উঠল। এই অশ্লীল ছবি তার? এই মেয়েরা কারা যাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না!

ধ্যানেশের মুখ থেকে কথা সরছিল না। তার হাত থেকে ছবিগুলো পড়ে গেল টেবিলের ওপর। পরক্ষণেই সে যেন শক্তি ফিরে পেল। প্রবল আক্রোশে ছবিগুলো তুলে নিয়ে সে ছিঁড়তে লাগল। যেন এই কুশ্রীতার চিহ্ন সে আর রাখবে না। বাবা বললেন, 'কত ছবি তুমি ছিঁড়বে ধ্যানেশ? ওরা কপি পাঠিয়েছে। ইচ্ছে করলে লক্ষ লক্ষ কপি চারধারে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভেবে দ্যাখো, এর যে কোন একটা কপি খবরের কাগজে ছাপা হলে আমার শিষ্যদের হৃদয় কি পরিমাণে ব্যথা পাবে। তাদের পিতা হিসেবে আমি সেটা চাইতে পারি না।'

'আমি-আমি।' টুকরোগুলো মুঠোয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল।

'না। তোমার কথা এখন চিন্তা করার কোন যুক্তি নেই। তুমি আর

করতে।'

'না বাবা, না। আপনি সারাক্ষণ আমার অন্তরে আছেন—'

ধ্যানেশ অসহায় চোখে তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বড় মহারাজ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানেশ মরীয়া হয়ে বলল, 'আমি আপনার আদেশ পালন করেছি ঠিকঠাক। নিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনাকে একবারও অপমানিত হতে দিইনি। তিনি যখন সেই চেষ্টা করছিলেন তখন আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের বক্তব্য ওঁর কাছে স্পষ্ট বলতে কোন দ্বিধা করিনি। কিন্তু—।'

'থামলে কেন, বল?'

'কিন্তু উনি আতিথ্য নিতে এমন পীড়াপীড়ি করলেন আর আমি ভুলেও ভাবিনি ওই সরবতের মধ্যে কোন মাদক মেশানো রয়েছে। আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল।'

'তোমার কথার কোন প্রমাণ দিতে পারবে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে তোমার ড্রাইভারকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছে। তোমার গাড়ি ছিল পার্কস্ট্রীটের একটি কুখ্যাত বাড়ির সামনে। আর।—' বাবা বাম হাতের একটি আঙুল ঘৃণার সঙ্গে তুলে ধরলেন, 'এইগুলো আশ্রমের ডাকবাক্সে পাওয়া গিয়েছে।'

ধ্যানেশ কম্পিত হাতে খামটা তুলে নিল। ভেতরে কয়েকটা ফটোগ্রাফ এবং একটি চিঠি। বাবা বললেন, 'চিঠিটা জোরে পড়।'

ধ্যানেশের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে কোনমতে পড়ল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের আজ পর্যন্ত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু একথা কি আমরা বলতে পারি, যদি আপনি আমাদের মহাপুরুষের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন না করেন? যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্য আপনি বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন তা আমাদের অজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের আশ্রমের পবিত্রতা একজন ধর্মগুরু হিসেবে আপনি রক্ষা করবেন। এমন কাউকে পাঠানো কি আপনার উচিত হয়েছে যার জীবন পঙ্কিলময়? সঙ্গের ছবিগুলো তার প্রমাণ।' ধ্যানেশ ছবির বাণ্ডিল দেখে আঁতকে উঠল। এই অশ্লীল ছবি তার? এই মেয়েরা কারা যাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না!

ধ্যানেশের মুখ থেকে কথা সরছিল না। তার হাত থেকে ছবিগুলো পড়ে গেল টেবিলের ওপর। পরক্ষণেই সে যেন শক্তি ফিরে পেল। প্রবল আক্রোশে ছবিগুলো তুলে নিয়ে সে ছিঁড়তে লাগল। যেন এই কুশ্রীতার চিহ্ন সে আর রাখবে না। বাবা বললেন, 'কত ছবি তুমি ছিঁড়বে ধ্যানেশ? ওরা কপি পাঠিয়েছে। ইচ্ছে করলে লক্ষ লক্ষ কপি চারধারে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভেবে দ্যাখো, এর যে কোন একটা কপি খবরের কাগজে ছাপা হলে আমার শিষ্যদের হৃদয় কি পরিমাণে ব্যথা পাবে। তাদের পিতা হিসেবে আমি সেটা চাইতে পারি না।'

'আমি-আমি।' টুকরোগুলো মুঠোয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল।

'না। তোমার কথা এখন চিন্তা করার কোন যুক্তি নেই। তুমি আর

তোমার সম্মান ফিরে পাবে না। কিন্তু আমাদের অসম্মানিত করবে। খবরের কাগজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি তোমাকে এখানে আনিয়েছিলাম। এখন তোমার হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।'

ধ্যানেশ সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আপনাকে আমি আমার ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছি। আপনি আমাকে আদেশ দিন আমি আজ রাতেই আত্মহত্যা করব।'

'ছি ছি ছি। আত্মহত্যা করে কাপুরুষরা। তুমি তো কাপুরুষ নও বলেই জানতাম। শোন, তোমার গানের গলা আছে। তোমাকে পরিচিত করে দিয়েছি। শুনেছি ওসব লাইনে চরিত্রহীনদেরই বেশি খ্যাতি হয়। তোমার আর ভয় কি!' বাবা আবার ধীরে ধীরে মাছের চৌবাচ্চার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে আহার গ্রহণ করে। পশুদের মধ্যে অনেকেই খিদে না পেলে খায় না। কিন্তু এই মাছগুলোকে দ্যাখো, এত রাতেও খাবার দেখে ছুটে এসে গিলেই চলেছে। কোন কোন মানুষের চরিত্র এমনি। ন্যায় নীতি বর্জিত জীবন তাদের এভাবেই আকর্ষণ করে। যেমন তুমি।'

বড় মহারাজ এতক্ষণে কথা বললেন, 'বাবা, রাত গভীর হয়েছে। আপনি যদি একটুও বিশ্রাম না নেন তাহলে —!' আশংকার কথা তিনি আর উচ্চারণ করলেন না।

'যে ছেলেটি ছবিটবি আঁকে তার নাম কি যেন?' বাবা মুখ না ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন। বড় মহারাজ প্রশ্নটির উত্তর চট করে খুঁজে পেলেন না। কত ছেলে তো ছবি আঁকে। এই আশ্রমের বাসিন্দা শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে অবসর সময়ে চমৎকার আঁকাআঁকি করে। বাবা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই বললেন, 'ছবি এঁকে কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়? তারা কি শিল্পীকে আপন করে মাথায় রাখে?'

বড় মহারাজ এবার বললেন, 'না বাবা। অল্প সংখ্যক বোদ্ধাই তাঁদের সম্পর্কে উৎসাহ দেখান।' বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি বিশ্রাম নেব।'

ধ্যানেশ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা এগিয়ে এলেন কাছে, 'আজ রাত্রেই তুমি কলকাতায় চলে যাও। আগামীকাল সকালে প্রত্যেকটা কাগজে আমাদের আশ্রম থেকে দেওয়া বিবৃতি বের হবে যে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা হয়েছে। তুমি চরিত্রহীনতার কাজ করেছ যা আশ্রমের সম্মান এবং আদর্শবিরোধী। তোমার কাছে নিশ্চয়ই কাগজের লোক যাবে। তুমি অভিযোগ অস্বীকার করবে। বলবে আমার শত্রুপক্ষ ঘটনাটাকে সাজিয়েছে ঈর্ষাবশত। আশ্রম তোমাকে ত্যাগ করলেও তুমি ধর্মচ্যুত হবে না। আমৃত্যু তুমি আমার প্রতি অনুগত থাকবে।' বাবা কিছুটা সময় নিলেন, 'ইউনিস তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। যাও। দেরি কোরো না।'

ধ্যানেশ আবার ভেঙে পড়ল বাবার শ্রীচরণে। আত্মহত্যা করার আগেই যেন সে আবিষ্কার করল তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বাবা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বড় মহারাজ এগিয়ে এলেন, 'ধ্যানেশ!'

ধ্যানেশ উঠল। এখন নিজেকে তার প্রাণহীন শবের মত মনে হচ্ছে, যে-শব

হাঁটতে পারে। আশ্রমের গাড়ি তাকে স্টেশনে নয়, পৌঁছে দিয়ে এল দূরপাল্লার বাসস্টপে। যে বাস তাকে আগামীকাল সকালে কলকাতায় পৌঁছে দেবে। যে আগামীকালে প্রতিটি সংবাদপত্রে আশ্রম থেকে প্রচারিত সংবাদে চরিত্রহীন আখ্যা দিয়ে বহিষ্কার করা হবে।

সকালবেলায় তিনু চুপচাপ বসেছিলেন কলকাতার বাড়িতে। গতরাতে তাঁকে আশ্রম থেকে সরাসরি জানানো হয়েছে এখন থেকে তিনি আর মহারাজ পদে নেই। সাধারণ শিষ্য হিসেবে তিনি তিনকড়ি রায় হিসেবেই আবার পরিচিত হবেন। বাবার অসীম দয়া যে, তাঁর শিষ্যত্ব লোপ করে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা যে কত বড় আঘাত তা তাঁর মুখের চেহারাতে স্পষ্ট। সারাটা রাত একবারও চোখ বন্ধ করতে পারেননি। মহারাজ পদ পাওয়ার পর তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছিল। শুধু ছোটে মহারাজ উধাও হয়ে সেই অহঙ্কারের বেলুন ফুটো করে দিলেন। এতদিন নজরে রেখেছিলেন তিনি, বড় মহারাজের নির্দেশ যথাযথ পালন করেছিলেন এব্যাপারে, অথচ ঘটনাটি ঘটে গেল। ছোটে মহারাজ কখনও এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু সুধাময় সেন জানিয়েছেন যে ছোটে মহারাজ প্রায়ই কলেজ পালিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন! ওঁর অভিনয় তিনি কেন যে ধরতেই পারেননি। মহারাজ পদ লোপ পাওয়া মানে শুধু সম্মান নয়,আর্থিক দিক দিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতি তাঁর। তাঁর নিজস্ব শতাধিক শিষ্য আছে যারা প্রধান শিষ্যের পদ পেয়েছে। ওইসব প্রধানশিষ্য যে অজস্র শিষ্যদের দীক্ষা দিয়েছে তাদের প্রেরিত প্রণামীর একটা অংশ তো তাঁর কাছেও আসে ধর্মানুষ্ঠান সংগঠিত করার জন্যে। তিনি এখন সেই প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত। আশ্রমের মামলাগুলো তিনিই আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিচালনা করেন। এই দায়িত্ব এখনও তুলে নেওয়া হয়নি। হতে কতক্ষণ! শ্যামবাজারের অধীর চন্দ্র মল্লিকের বসতবাড়ি তিনি গতকাল দখল করেছেন। এব্যাপারে ওঁর স্ত্রীপুত্র মামলা দায়ের করবেনই। পুলিশের কাছে ডায়েরিও করেছেন। কিন্তু তিনু মহারাজ, তখন তো তিনি মহারাজই ছিলেন, কোন ভুল করেননি। প্রথমেই পুলিশের বড়কর্তাকে জানিয়েছেন অধীর চন্দ্রের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাবার আদেশ পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই আশ্রম থেকে অধীরের চিঠির জেরক্স তাঁর হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। পুলিশকর্তা বাবার শিষ্য। তিনি স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সহযোগিতা করার। সেইমত তিনুমহারাজ অধীর চন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রদের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। প্রস্তাব শোনার পর যেন তাঁদের মাথায় বাজ পড়েছিল। অধীরচন্দ্র যে এমন কাজ কখনই করতে পারেন না সেই বিশ্বাসের কথা বারংবার বলেছিলেন। তিনু মহারাজ অধীরচন্দ্রের চিঠির জেরক্স কপি ওঁদের দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা আমাদের প্রয়াত গুরুভাই-এর নিকট-আত্মীয়। আপনাদের চট করে কোন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে চাই না। কিন্তু অধীরবাবুর শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। আপনারা এই বাড়ির নিচতলাটা সাতদিন ব্যবহার করুন। ওপরের তলাটিতে আমরা বাবার আসন পেতে যাচ্ছি। শিষ্যভক্তরা নামগান করবেন। সাতদিনের মধ্যে আপনারা উপযুক্ত বাসস্থানে চলে যান।'

অধীরচন্দ্রের পুত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় আক্রমণ করেন আর কি, এইসব ভাঁওতা আমরা মানি না। বাবা কবে কাকে কি লিখেছিলেন সেটা আইন হতে পারে না। ডিড দেখান। উইল দেখান। আপনারা কি এ-বাড়ি জবর দখল করছেন? আমরা মরে গেছি? এই শোকের সময়ে—।'

তিনুমহারাজ আরও বিনীত হয়ে বলেছিলেন, 'ওসব দেখালে তো আপনারা বুঝবেন না। যদি আপনাদের অভিলাষ হয় তাহলে আদালতকে দেখাতে পারি। তাছাড়া এসব করছি আপনার বাবার আত্মার শান্তির জন্যে।' তিনুমহারাজের ইঙ্গিতে শিষ্যরা ওপরে উঠে গিয়েছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল নামগান। অধীরের আত্মীয়রা মরীয়া হয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। তারা বলে, 'যদি আপনাদের মনে হয় আপনার বাবার গুরুভাইরা বেআইনি কাজ করছেন তাহলে থানায় এসে ডায়েরি করুন। কেস করুন। আইন আপনাদের সবরকম সাহায্য দেবে।' তিনুমহারাজ সেইরকমই চেয়েছিলেন। পুত্রেরা থানায় চলে গেলে নামগান শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কোর্টে আইনজ্ঞ মারফত আবেদন জানিয়েছিলেন তিনু, অধীর চন্দ্রের শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে ইনজাংশন চেয়ে। এখন মামলা চলবে অনন্তকাল। সাতদিনের মধ্যে অধীরের স্ত্রীপুত্ররা যদি স্বেচ্ছায় একতলা ছেড়ে না যায় কেউ শক্তি প্রয়োগ করবে না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হবে যে, ওরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। এই কলকাতা শহরে এমন অনেক ভক্ত ছিল যারা নিজেদের আবেগে বাবাকে সম্পত্তি সমর্পণ করেছে। সেই সম্পত্তি কিভাবে ধীরে ধীরে আইনসম্মত করে নেওয়া যায় তিনি জানেন। কোন বাড়ির একটি তলা বাবার কাজে লাগবে না। সেক্ষেত্রে আইনসম্মত অধিকার পাওয়ার পর মৃত শিষ্যের আত্মীয়দের কাছেই প্রস্তাব দেওয়া হয় সম্পত্তিটি কিনে নেওয়ার। বাধ্য হয়েই তারা রাজী হয়। এখন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

তিনকড়ি রায় ভেবে পাচ্ছিলেন না ছোটে মহারাজ কোথায় যেতে পারেন। পুলিশের কাছে এখনও ডায়েরি করা হয়নি। সুধাময় সেনের এজেন্সি হদিশ পায়নি। বাবা নিশ্চয়ই চুপচাপ নেই। আরও অন্য সূত্র থেকে তার খোঁজ-খবর চলছে বলে তিনকড়ির বিশ্বাস। এদের সবাইকে নাজেহাল করে ওই অল্পবয়সী নিষ্পাপ চেহারার যুবক কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে! একমাত্র তিনি যদি ওকে খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে হয়তো বাবা প্রসন্ন হয়ে আবার মহারাজপদ ফিরিয়ে দেবেন। তিনকড়ি রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে একটিই আশার আলো। এবং তখন তার ইউনিসের কথা মনে পড়ল। বাবার অত্যন্ত অনুগত এই লোকটি এককালে গুণ্ডা ছিল। তিনকড়ির অনেক কাজ সে করে দিয়েছে। টেলিফোনে কথা না বলে নিজে যাওয়াই ভাল। আর তখনই ভোরের হকার কাগজ দিয়ে গেল। উদাসীন চোখে নজর বোলাতে বোলাতে হঠাৎ তাঁর চোখ আটকে গেল নিচের দিকে ছাপা একটা ছোট খবরে। 'ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ধ্যানেশকুমার আশ্রমকর্তৃক বহিষ্কৃত।'

চারপাশে শুয়োরের পাল, আবর্জনা, মুরগিদের চিৎকার, সব মিলিয়ে জায়গাটা খুব জান্তব। ঘরটির দেওয়াল রাখারির, মাথার ওপরে টিনের ছাদ, রোদ বাড়লেই

তেতে যায়। নিচে একটা নড়বড়ে তক্তপোষ ছাড়া কোন আসবাব নেই। সেই তক্তাপোষের ওপর চিত হয়ে শুয়েছিল যে সুদর্শন তরুণ তার গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। পরনের পাজামা আর পাঞ্জাবি এখন বেশ মলিন। ঘরে আর কোন মানুষ নেই। হঠাৎ একটি শুয়োর কাছাকাছি তীব্র একটানা চিৎকার করতেই সে চোখ খুলল। অলসভাবে বাম হাতের তালু দিয়ে চিবুকের দাড়ি ঘষল। তারপর হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা একটা বিড়ির বাণ্ডিল থেকে বিড়ি নিয়ে শুয়ে শুয়েই সেটাকে ধরাল। দুতিনবার টান মারতেই কাশি এল। কাশি গিলতে চেষ্টা করতেই সেটা আরও বাড়ল। সিগারেট বিড়ি খাওয়ার অভ্যেস তার কোন কালেই ছিল না। ঠিক একমাস আগে কানাই-এর সঙ্গে খিদিরপুর ব্রিজের তলায় বসে সে সিগারেটে তালিম নিয়েছে। এখনও তেমন জুত করে ওঠেনি। এ তল্লাটে সিগারেট পাওয়া যায়নি বলে বিড়ির ব্যবস্থা। কিন্তু বিড়ি খেলেই শরীর গুলিয়ে ওঠে।

একমাত্র খিদে পাওয়া আর বাথরুম পায়খানা ছাড়া এখানে কোন অসুবিধে নেই। দুদিন এই জায়গায় চুপচাপ পড়ে আছে সে। সন্ধ্যের আগে সে ঘর ছেড়ে বের হয় না। খুব নিম্নজাতের বস্তি বলেই চারধারে নোংরা গন্ধ পাক খায়। প্রথম রাতে বমি হয়ে গিয়েছিল তার। সেটা দেখার পর কানাই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি সত্যি মন থেকে তৈরি নির্মল?' সে মাথা নেড়েছিল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এত অল্পে যদি বমি আসে, কাতর হও, তাহলে তো তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

'আমি পারব। শুধু অভ্যস্ত হতে যেটুকু সময়—।'

'আমি আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি। পরশু ফিরে আসব। যা খাবার আছে তাতেই চালিয়ে নিও। ঘর থেকে বেরিও না। পশুপতি তোমাকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে। কেউ ডাকলে সাড়া দিও না। পশুপতি ছাড়া এই ঘরে কেউ ঢুকবে না।' কানাই চলে গিয়েছিল।

পশুপতিকে দেখেছিল নির্মল। দড়ি পাকানো হাফপ্যান্ট পরা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধর মাঝামাঝি লোকটা গাঁজা খাওয়া চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল প্রথম রাতে। কানাই-এর সঙ্গে ওর যোগাযোগ কিভাবে বা কতদিনের, প্রশ্ন করেনি নির্মল দুজনকেই। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটা হিন্দীবাংলায় মেশানো কথা বলেছিল, 'চা আনতে হবে?'

সকালবেলায় চা খাওয়ার অভ্যেস ছিল না নির্মলের। কিন্তু সারারাত না ঘুমিয়ে ওর প্রচণ্ড তেষ্টা পাচ্ছিল। তাই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল। কয়েকমাসের কলেজের মাইনে তার কাছে জমানো ছিল। তা থেকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল, 'চা বিস্কুট সিগারেট।'

পশুপতি একটা কেটলি নিয়ে ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণ পরে। সঙ্গে বিস্কুট, বিড়ির প্যাকেট। জানিয়েছিল সিগারেট পাওয়া যায়নি। নিজে মগে চা খেয়েছিল, নির্মল গ্লাসে। অত বিশ্রী স্বাদ ও গন্ধের অর্ধতপ্ত তরল পদার্থ সে কোনদিন খায়নি। বিস্কুটটা তবু মচমচে থাকায় ভাল লাগল। চা খেয়ে পশুপতি বলল, 'এই বালতিতে জল আছে। দুপুরে ভাত খাবেন?'

নির্মল মাথা নেড়েছিল। পশুপতি বলেছিল, 'দেখি যদি আমি ফিরে আসতে

পারি তো রাঁধব।'

পড়পড়তি দুপুরে আসেনি। সারাটা সকাল ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল নির্মল। দুপুরবেলায় প্রচণ্ড গরমে ঘেমে নেয়ে উঠে পড়েছিল। তখন থেকেই খিদে জানান দিয়েছিল। খিদের সময় বিড়ি ধরাতে ওই বোধটা চাপা পড়ে যায়। কাশি হতেই নিভিয়ে ফেলেছিল। আর তখনই মনে পড়েছিল বাবার মুখ। বড়দা আর মেজদার চেহারা। কি পরিমাণ খেপে যাবে ওরা তা অনুমান করতে অসুবিধা নেই। কোপটা পড়বে তিনু মহারাজের ওপর। ওই ধান্দাবাজ লোকটাকে বেশ শায়েস্তা করা গেল এবার। সবসময় ওর পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে রাখত। বাবার হাত সর্বত্র। কানাই ভরসা না দিলে সে পালাবার সাহসই করত না। তাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল দর্শনে এম এ করার জন্যে। তারপর ওই বিশাল সাম্রাজ্যের ছোট মহারাজ হিসেবে পাকাপাকি বসতে হত। বড় মহারাজ তো এখন থেকেই আশ্রমের অনেক ক্ষমতা দখল করে রেখেছেন। মেজ মহারাজ সেই কারণে মনে মনে বড়কে ঈর্ষা করেন কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না—এটা নির্মল স্পষ্ট টের পেত। কোটি কোটি টাকা এবং যার জন্যে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না, কে হারাতে চায় বেফাঁস কথা বলে!

ধর্ম! খুব শৈশবেই তাকে ভোরবেলা থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত ধর্মাচরণ করতে হয়েছে। শুধু যে কয়বছর মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে থাকত সেই কয়বছর অনুশাসন কম ছিল। মামাও বাবার দীক্ষিত। বাড়ি সুদ্ধু সবাই। কিন্তু মা তাকে প্রশ্রয় দিতেন। খেলার মাঠ, কাঠি আইসক্রিম আর গল্পের বই পড়তে দিতেন চুপিসাড়ে। সম্ভবত ওই কারণেই মাকে কখনও সে আশ্রমের মা-জননী রূপে দেখতে পায়নি। মাকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ধর্ম মানে কি?' মা একটা বই খুলে তাকে পড়তে বলেছিলেন কয়েকটা লাইন। ব্যাখ্যাটা আজও তার মনে বসে আছে, 'যাঁকে সকলেই চায় তাঁকে পাওয়ার সহায়ক যে কর্ম, তাই স্বভাবের ধর্ম। আর যা দুঃখ অশান্তি আনে, তাই অভাবের কর্ম। তা-ই অধর্ম।' মা বলেছিলেন 'যেটা তুমি সৎভাবে করবে সৎকাজের জন্যে সেটাই তোমার ধর্ম বলে মনে করবে। জেনো ধর্মাচরণ করলে মনে কখনও অশান্তি আসে না, কোন লোভ জাগে না, ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে পরিকল্পনা করতে হয় না।' বাবার সঙ্গে তখন তার যোগাযোগ কত কম। ছিল না বলাটাই ঠিক। উপনয়নের সময় বাবা তাকে খুব আদর করেছিলেন। ছোটে মহারাজ নামটা তখনই দেওয়া। আর নামকরণ হবার পর থেকে সে অবাক হয়ে দেখত বুড়ো বুড়ো মানুষেরা তার সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন সমীহ করে বলছে। একদিন একজন বৃদ্ধা তো তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল তাঁর জলের পাত্রে পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দেবার জন্যে। লজ্জায় পালিয়ে এসে বেঁচেছিল। কিন্তু একটা খারাপ লাগা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। এবং যেদিন এক বৃদ্ধ আনন্দভবনের সামনে বুক চাপড়ে বিলাপ করতে করতে বলছিলেন, 'কিসের তুমি বাবা, আমার সবেধন নীলমণিকে বাঁচাতে পারলে না, কিসের তুমি ভগবান। কেন বলেছিলে ও সেরে যাবে? জবাব দাও! এতদিন ধরে তোমাকে আমি এই জন্যে জীবন দিয়েছি যে তুমি আমায় মিথ্যা স্তোক দেবে? তুমি কেউ নও, কেউ নও।

তোমার কোন ক্ষমতাই নেই।' বৃদ্ধকে আর বেশী কথা বলতে দেয়নি সেবকরা। প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আড়ালে। সেই বৃদ্ধকে আর কোনদিন দ্যাখেনি সে। কিন্তু লোকটার শোকার্ত মুখ বুকের পাঁজর নাড়িয়ে দিয়েছিল।

বুজরুকি ? এক্সপ্লয়টেশন ? কানাই তো তাই বলে। কিছু লোক কোন কাজ না করে একটি ভগবান-ভগবান টাইপের মানুষকে খাড়া করে লক্ষ লক্ষ ভক্তকে এক্সপ্লয়েট করে যাচ্ছে, প্রতিদিন। তাদের সঙ্গে রেষারেষি করে আরও কিছু মানুষ আরও একাধিক দেবতামার্কা লোককে নিয়ে শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে এদেশে। একই হিন্দুধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষে চমৎকার ব্যবসা করা যায়। কানাই বলেছিল, 'লক্ষ করে দ্যাখো, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে কতগুলো যোগী, মহর্ষি, আচার্য, বাবা, ব্রহ্মচারী রয়েছেন। প্রথম সারির গুরুর সংখ্যাই অন্তত দশজন। দ্বিতীয় সারিতে পঞ্চাশ আর তার পরে কোন হিসেব নেই। ইতিমধ্যে ইমেজ খারাপ করে ফেলেছেন কেউ কেউ। যাঁরা ইমেজ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন তাঁদের শিষ্যসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। একই ধর্মের এত মহাপুরুষ এদেশে একত্রিত অথচ তাঁরা এক হতে পারছেন না। কেন ? হলে যে নিজেদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে এত সব নেতা রাজনীতি করেন, পশ্চিমবঙ্গে এত বামপন্থী দল ক্ষমতায় আছেন, কেউ কখনও ভুলেও এঁদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেন না। কারণ মনে মনে সবাই এঁদের ভয় পান।'

কানাই-এর কথাগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল নির্মলের। ভারতবর্ষের মানুষ আসলে ধর্মভীরু। ধর্মের কোন আসল চেহারা এঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। যা অলৌকিক তাই যেন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। অথবা ধার্মিক হলে কিছু পাওয়া যাবে। যে লোকটা সারাজীবন ঠাকুরের সামনে বসে পুজো করে গেল তার ছেলের যদি ক্যান্সার হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে অত ধার্মিক মানুষকে ঈশ্বর কেন এমন শাস্তি দিলেন ? পার্থিব কিছু পাওয়া না গেলেও যেহেতু আমি গুরুর চরণাশ্রিত তাই গুরু আমার সংসারে কোন অশান্তি আনতে দেবেন না। ছেলে হচ্ছে না গুরুদেব দয়া করুন, অসুখ হয়েছে গুরুদেব আপনি ভাল করে দিন, চাকরির ইন্টারভিউ পাওয়া গিয়েছে গুরুদেব আপনি চাকরিটা পাইয়ে দিন। এই যে নিরন্তর চাওয়ার জন্যে একটা জায়গা তৈরি হয়, এরই জন্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। সব মানুষ তো সব গুরুর শিষ্য হয় না। যারা মহর্ষি প্রাণদীপের শিষ্য হয়েছে তারা নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা মেটাবার আশ্বাস পেয়ে থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা না মিটলে আবার আর একজন গুরুর কাছে আশ্রয় নেওয়া। বাবার ক্ষমতা যেহেতু বেশি তাই তাঁর শিষ্যসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বাবা বলেন, 'তাঁর কাছে জাতপাতের স্থান নেই, তাঁর ধর্মে সঙ্কীর্ণতার ছায়াও নেই। তিনি যে কোন আশ্রিতকেই আশ্রয় দিতে চান অবশ্য সেই মানুষের আশ্রয় চাইবার আকাঙ্ক্ষা যদি সত্যি হয়।' অথচ বাবা প্রণাম গ্রহণের পর প্রতিদিন নিজের পা ডেটলজলে ধুয়ে নেন। হাতের আঙুল আশীর্বাদ শেষ হলে সাবানে নির্মল করেন। কোন অব্রাহ্মণ তাঁর দুনম্বর ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। এবং স্নানের আগে তিনি সেবিকাদের সামনেই নিরাবরণ হন নিজেকে ষড়রিপুর ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছেন প্রমাণ করতেই। বড় ও মেজ মহারাজ অবশ্য এখনও সেই স্তরে পৌঁছাননি।

নির্মল তক্তাপোষ থেকে নেমে বালতি থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে গলায় ঢালল। এখন তার খুব ইচ্ছে করছিল স্নান করতে। এভাবে কতদিন এখানে থাকা সম্ভব হবে কে জানে।

হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড সোরগোল শুরু হয়ে গেল! রমণীরা পৃথিবীর অশ্লীলতম ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি করছে। পুরুষদের গলাও কানে এল। এত খারাপ কথা নির্মল কখনও শোনেনি। এবং এর মধ্যেই কেউ এসে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, 'পশুপতি, এ পশুপতি, ভীমরুকো জার ভীমরুকো মার ডালা। এ পশুপতি!' নির্মল কাঁটা হয়ে বসে রইল। কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর সম্ভবত হতাশ হয়েই লোকটা চলে গেল। এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই সশব্দে বোমা ফাটতে লাগল। মানুষ শুয়োর এবং মুরগির চিৎকার একত্রিত হয়ে নির্মলকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। ওর মনে হল এখান থেকে ছুটে পালাতে পারলে বেঁচে যাবে। কিন্তু এখন এই পরিবেশে বাইরে বেরুলে আর দেখতে হবে না। ঢোকার সময়টা ছিল ভর দুপুর। বস্তিতে লোকজন ছিল কম। কানাই তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে বলতে এসেছিল যে সে এখানকার খুব পরিচিত এবং সম্ভবত সেই কারণেই কেউ তাদের তেমন করে লক্ষ করেনি। এখন বাইরে পা দিলেই হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেজন্যে এখানে আশ্রয় নেওয়া তাই বানচাল হয়ে যাবে।

একটু একটু করে গোলমাল কমে এল। মেয়েটি কিন্তু থেকে থেকেই অশ্লীল গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের চরিত্র পৃথিবীতে আছে তা নির্মলের ধারণায় ছিল না। বাবা যদি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই এমন একজনকে পেতেন তাহলে আনন্দভবনের চেহারা কি হত ভাবতেই হাসি পাচ্ছে। হিন্দী ভাষাভাষি এই বস্তির লোক কি ধর্মালোচনা করে না? যে বঙ্গরমণীটি হিন্দী ভাষাভাষিণীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছিল তার শব্দ-ভাণ্ডারে ছিল নারী এবং পুরুষের গোপন অঙ্গগুলোর বিকৃত নামাবলী। মানুষ যা বহন করে জন্ম থেকে অথবা প্রকৃতির নিয়মে যা শরীরে ক্রমশ আবির্ভূত হয় তা কেন অপরকে আঘাত করার জন্যে শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, নির্মলের অবাক লাগল। যদিও সে সব শব্দের অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারেনি, তবু অনুমান, একটা আবছা ধারণা ছিল।

কলেজে ভরতি হবার পর যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল তা হল দুদল ছেলেমেয়ের রাজনীতি। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে কলেজের মাধ্যমে দেশের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তাকে বিভ্রান্ত করেছিল। ভরতি হবার সময় মেজ মহারাজ এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কাজ হবে পাঠ ত্বরান্বিত করা। এই কলেজ কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত, অতীত এবং বর্তমানেও। শুধু তুমি ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। ছাত্র রাজনীতি সবসময়েই জেনো অন্তঃসারশূন্য হয়। কলেজের দেওয়ালে যেসব পোস্টার দেখবে তা আমাদের সময়েও দেখেছি। বছরের পর বছর ওই পোস্টারগুলোর ভাষা ও বক্তব্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এদের আন্দোলনের ফল কি, বুঝতেই পারছ। কলেজে যারা মাতব্বরি করতে চায় তারা তা করুক। তুমি এসব থেকে দূরে থেকো।' প্রথম প্রথম তাই সে থাকত। এইসময় কানাই-এর সঙ্গে তার পরিচয়। খুব ভাল রেজাল্ট করে কানাই এই

কলেজে ভরতি হয়েছিল। কলেজ ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে ওর কোন সংস্রব ছিল না। প্রসঙ্গ উঠলে বলত, 'এরা সব এ্যাপ্রেন্টিসশিপ করছে। এই করতে করতে দাদাদের দয়ায় যদি পার্টি অফিসে কল্কে পায় তো বর্তে যাবে।' অথচ কানাই নিজেও প্রত্যহ ক্লাশ করত না। নির্মলকে সেবকরা কলেজে পৌঁছে দিচ্ছে দেখে ওর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল পরিচয়। সেটা জেনে সে হেসে বলেছিল, 'বাঃ, তুমি তো এ দেশের সম্রাটের পুত্র হে। বাঃ, চালিয়ে যাও।'

নির্মল অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল কথাটার মানে কি? কানাই হেসে বলেছিল, 'এ দেশের রাজনীতিতে শাসকরাই রাজা। পাঁচ বছরের জন্যে। কিন্তু একবার ক্ষমতা হাতে পেলে এমনভাবে কাজ গুছিয়ে নেয় যে খুব মারাত্মক ভুল না করলে কয়েকটা পাঁচ বছরের জন্য সিংহাসন অটুট। কিন্তু যতই কম্যুনিজমের অথবা সোস্যালিজমের কথা বলুক, ওরা জানে জনসাধারণ ওসব কানে ঢোকায় না। তারা ধর্মের নামে এখনও টলোমলো। ধর্ম এ দেশের অর্থনীতি রাজনীতিকে তাই কন্ট্রোল করে চলেছে। তাই রাজারা ধর্মগুরুদের শরণাপন্ন হয়। তেনারা যদি প্রসন্ন হন তো শিষ্যদের ভোট পকেটে এসে যাবে। এখন বল তুমি সম্রাটের পুত্র কিনা!'

ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল নির্মল। তার মনে পড়ল ছোটবেলা থেকেই সে আশ্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের আসা–যাওয়া করতে দেখেছে। মন্ত্রী বা সচিবেরা অবশ্যই বিশেষ আপ্যায়ন পেয়েছেন কিন্তু বাবার দর্শনের জন্যে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তেও সে দেখেছে তাদের কাউকে। নির্বাচনের আগে ওদের আসা-যাওয়া বেড়ে যেত। এসব কথা আগে কখনও ভেবে দ্যাখেনি নির্মল। কানাই-এর কথায় মনে পড়ছিল সব। ক্রমশ সে কানাই-এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তার নিজস্ব উপলব্ধির কথা সে বলতে লাগল কানাইকে। একটু একটু করে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মাল। কানাই কিছু লিফলেট পড়তে দিল তাকে একদিন। বলল খুব গোপনে রাখতে। তিনুমহারাজের লোকজন তার বইপত্র ছুঁয়ে দেখার সাহস করত না, প্রয়োজনও ছিল না। সেই সব লিফলেটের লাইন থেকে কানাইকে চিনতে পারল নির্মল। এ দেশের রাজনীতি নিজস্ব অথবা পার্টি সর্বস্ব রাজনীতি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিটেফোটা। শুধু দালালি করার জন্যে ওরা নির্বাচনে নামে। রাজনীতি যেমন মানুষকে বিভ্রান্ত করে তেমনি ধর্মগুরুরা তাদের ড্রাগ খাওয়ায়। রাজনৈতিক নেশা মুষ্টিমেয় মানুষের আর ধর্মভয় প্রায় সমস্ত দেশের। যেহেতু দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে মানুষেরা বাধ্য হয় জীবনযাপন করতে তাই তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যেতে বাধ্য। এই আত্মবিশ্বাসের অভাবকে এক্সপ্লয়েট করে ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক দল। প্রথম পক্ষ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের থেকে প্রচুর শক্তিশালী, তাই তারা কখনই অস্বীকার করার চেষ্টা করে না। বরং বলা যায় কোনরকম সাযুজ্য না থাকা সত্ত্বেও পরস্পর বেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। এই পরিস্থিতিতে একসময় এদেশে বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের আবেগ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধত্ব এনে দিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল দর্শকের ভূমিকায়, তাঁদের চেষ্টা

তাদের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষিত করেছে। প্রথমে ভূমি প্রস্তুত করা উচিত। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বোঝানোর কাজ এগিয়ে গেলেই মাটি তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে, এই কাজ সহজসাধ্য নয়। শাসক দল তো বটেই, বিরোধীরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে পদে পদে বাধা দেবে। কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হবে দেশের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা।

কানাই বলত, 'শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার চিন্তা এই মুহূর্তে অবাস্তব। কিন্তু মানুষকে মনুষ্যত্বের সম্মান দেওয়ার মত পরিবেশ তৈরি করা তো আকাশকুসুম নয়।'

খিদিরপুরের ব্রীজের নিচে পৃথিবীর সবরকম নেশারুদের ভিড়। ড্রাগ থেকে সাপের ছোবল কিছুই বাদ যায় না। পুলিশ জানে ওখানে যারা যায় তারা তেমন কোন ভয়ঙ্কর মানুষ নয়। নেশা করে করে এরা নিজেদেরই ধ্বংস করছে। অতএব এদের মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে আসা ছাড়া পুলিশ সময় নষ্ট করতে চায় না। যারা নেশার জিনিস বিক্রী করে তারা যদি নিয়মিত দক্ষিণা দিয়ে যায় তাহলে কথাই নেই।

কানাইরা এই জায়গাটিকে বেছে নিত মাঝে মাঝে আলোচনা করার জন্যে। ওখানে নির্ভেজাল গাঁজাও বিক্রি হত। বিক্রেতাদের সন্দেহ যাতে না পড়ে, তাই গাঁজা কিনে নিত ওরা। একপাশে গোল হয়ে বসত। গাঁজা ফেলে দিয়ে তাতে সিগারেটের তামাক ভরে টানত সবাই। আর কথা হত। কানাই-এর সঙ্গে দুদিন গিয়েছে সেখানে নির্মল, কলেজ পালিয়ে। একদিন একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। একটা সিড়িঙ্গে মত লোক এসে কানাইকে বলেছিল, 'বাবু, আপনারা এখানে এসে কেন যে মাঝে মাঝে গাঁজা খান বুঝি না। রাজার নেশা করুন।' কানাই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রাজার নেশা?' লোকটি বলেছিল, 'আসুন দেখাচ্ছি।' ওকে অনুসরণ করে ওরা ব্রীজের নিচে সব চেয়ে নোংরা কোণে চলে গিয়েছিল। সেখানে একজন হাড় জিড়জিড়ে কালো মানুষ বসেছিল। লোকটার জামাকাপড় দেখে মনে হচ্ছিল বেশ সম্পন্ন অবস্থা। সিড়িঙ্গেকে দেখেই খিচুনি শুরু হয়েছিল,, 'বাঃ চমৎকার! আমি কি দাম দিই না? কখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি আর তোমার দেখা নেই চাঁদু। আরে যদ্দিন ছবি না হচ্ছি তদ্দিন সময়মত এসো চাঁদু। এরা আবার কে?'

সিড়িঙ্গে বলল, 'আমার জানপয়চান। আপনার নেশা করা দেখবে। টাকা দিন।'

লোকটা টাকা দিতেই সিড়িঙ্গে লোকটা চলে যাচ্ছিল। তাকে থামাল লোকটা, 'শোন, ফেরেব্বাজী আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। সেদিন দুটোর বিষ ছিল না। দেখো।' সিড়িঙ্গে চলে গেলে লোকটা বলেছিল, 'দেখতে তো নাড়ুগোপাল, এ শখ হল কেন? সব নেশা হয়ে গেছে? সিগারেট, গাঁজা, মদ, চোলাই, ট্যাবলেট? ওসব না সেরে রাজার নেশায় আসা কেন? এই দাঁত দেখছ? যদি কাউকে কামড়ে দিই সে চোখ ওল্টাবে।'

কানাই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রাজার নেশা না করলেই নয়।'

লোকটা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'নেশাটাই তো রাজা বানায় হে।'

সিড়িঙ্গে ফিরে এল একটা মাঝারি কৌটো নিয়ে। নির্মল দেখল কৌটোর ঢাকনায় গোটা ছয়েক ফুটো গায়ে গায়ে। ফুটোগুলো খুব সরু। আর শব্দ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কৌটোর ভেতরে যারা রয়েছে তারা বেশ ক্ষিপ্ত। শব্দ শুনেই লোকটা উল্লসিত মুখে হাত বাড়াল। সিড়িঙ্গে বলল, 'আজ একটু সাবধানে নেবেন রাজাবাবু। ওস্তাদ বলে দিল দুটোর দাঁতে বেশি বিষ জমে গেছে।' লোকটা খুশিতে মাথা নাড়ল, 'সাবাস, দশটার সময় ডেকে দিবি।' তারপর ধীরে ধীরে কালচে নীল জিভ বের করে ঠেকাল ফুটোগুলোর ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল শরীর। সিড়িঙ্গে রিলে করছিল যেন, 'ছোবল মারছে। বিষ ঢালছে। মুখ দেখুন, কি আরামই না পাচ্ছে। প্রথম প্রথম একটা সাপ, একবার ছোবল। তাতেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুক্তি। রাজার নেশা বটে।'

নির্মল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সাপের বিষে মানুষ মরে যাবে না?'

'না গো। মারবার মত শক্তি নেই ও বিষের। সবে গরল জমছে যে সাপের তাকেই তো কৌটোয় পোরা হয়। নেবেন বাবু?' সিড়িঙ্গে প্রশ্ন করতেই লোকটা কৌটো নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ওর চোখ স্থির। হাত পা নড়ছে না।

কানাই আঁতকে উঠল, 'মরে গেল নাকি?'

সিড়িঙ্গে বলল, 'দূর মশাই। কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুমবে। রাত দশটায় ডেকে দিতে বলল একটু আগে, শুনলেন না?'

সিড়িঙ্গেকে কাটিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কানাই বলেছিল, 'সারাদেশের মানুষ ওইভাবে জিভ এগিয়ে দিচ্ছে আর রাজনীতি এবং ধর্ম সাপ হয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে।' খুব নাড়া খেয়েছিল কথাগুলো শুনে নির্মল।

সন্ধ্যে হয়ে গেলেও ঘরে আলো জ্বালতে পারল না নির্মল। কাল রাত্রে ওই কোণে একটা কুপি দেখেছিল। আলো দেখে যদি কারো সন্দেহ হয়। খানিকপরে দরজায় শব্দ হল। পশুপতি যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল তিনবার টোকা দিলে তবে যেন সে দরজা খোলে। টোকাগুলো গুণে হাতড়ে হাতড়ে দরজায় পৌঁছে সে ওটাকে খুলল। আর তখনই কেউ একজন চিৎকার করে বলল, 'পুলিশ এসেছিল, ভীমরুর বউকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।' পশুপতির গলা পাওয়া গেল, 'ঠিক করেছে।' ঘরে ঢুকে লোকটা কুপি জ্বালল। তারপর একটা বড় ঠোঙা এগিয়ে দিল, 'দুপুরে টাইম মিলল না। এইটা খেয়ে নিন।'

কচুরি আর তরকারি। অমৃত বলে মনে হল নির্মলের কাছে। খাওয়া হয়ে গেলে পশুপতি বলল, 'আপনি এখান থেকে চলুন। কানাইবাবুর লোক এসেছিল। বলেছে হাওয়া খুব খারাপ। ন'বাজে একটা টেরেন আছে হাওড়া ইস্টিশান থেকে, এই ঠিকানা। আপনাকে আজই চলে যেতে হবে। এ বস্তিতে কেউ কেউ সন্দেহ করেছে আমার ঘরে লোক আছে।'

চটজলদি বেরিয়ে পড়ল নির্মল পশুপতির সঙ্গে। অন্ধকার বলে একটা আড়াল পাওয়া গেল। কেউ কিছু বোঝার আগেই বড় রাস্তায়। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ঠিকানাটা পড়ল সে। 'অবিনাশচন্দ্র দে। স্কুল শিক্ষক। স্কুলের মাঠের পেছনে। কোলাঘাট।' হাওড়া স্টেশন থেকে কোলাঘাট কতদূর জানা নেই

নির্মলের। এইসময় একটা বাস আসছিল। পশুপতি তাগাদা দিল, 'উঠে পড়ুন বাবু, এই বাস ইস্টিশান যাবে। উঠে পড়ুন।'

ভিড় বাস ঠেলে ওপরে উঠল নির্মল। মানুষের চাপে, ঘামের গন্ধে তার শরীর খারাপ করতে লাগল। প্রাণপণে নিজেকে ঠিক রাখছিল সে। যেন অনন্তকাল সময় নিয়ে বাস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে সে যখন পৌঁছে গেল প্লাটফর্মে তখন জানল সামনের ট্রেনটাই কোলাঘাটে থামবে। টিকিট হয়নি, সেটা কোথায় পাওয়া যায় তাও জানা নেই, নির্মল আর দেরি করল না। ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে চেপে বসল।

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল ধ্যানেশকুমার। এই কয়ঘণ্টায় লোকটার বয়স যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। চোখের তল বসে গেছে, মুখের চামড়ায় কালচে ছায়া নেমেছে। ঝড়ের আসল দাপটে যখন একটি বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় তখনও তার নতুন করে প্রকাশিত হবার সুযোগ থাকে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সব শেষ হয়ে গেল। এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। বাবার মুখ মনে করল সে। স্নেহহীন অমন মুখ সে কখনও দ্যাখেনি। হঠাৎ ধ্যানেশকুমারের রাগ হল ছোটে মহারাজের ওপরে। ছেলেটা যদি না পালাতো তাহলে তার এমন দুর্দশা হত না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল ওই স্ত্রীলোকগুলোকে সে মনেই করতে পারছে না যাদের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নগ্নছবিগুলো তোলা হয়েছে। কারা তুলল ? বাড়িতে ফিরেই সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ড্রাইভার বলছে সেই রাত্রে সে নাকি আশ্রমের চত্বরে রাখা গাড়িতে উঠে বসেছিল। ড্রাইভার নিজেও স্টিয়ারিং-এ বসতে এগিয়েছিল। তারপর যখন তার চেতনা এল তখন সে পার্ক স্ট্রীটে। ওখানে কি করে গেল তা সে জানে না। ধ্যানেশ লোকটাকে বিশ্বাস করল। কিন্তু ধাঁধাটার সমাধান করতে পারল না।

কিন্তু টেলিফোনের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে সে রিসিভার নামিয়ে রাখল। ওইটুকুনি খবর অথচ সবাই দেখেছে। শেষ ফোন করেছিল রেকর্ড কোম্পানির মালিক, 'ধ্যানেশবাবু, খবরটা কি সত্যি ? সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনার লেটেস্ট ভজনের রেকর্ড এই সপ্তাহেই বাজারে বেরুবে। কিন্তু এ খবরের পর কেউ তো কিনবে না।'

'কেন ?' ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল ধ্যানেশ।

'আরে মশাই,আপনি চরিত্রহীনতার কাজ করেছেন বলে আশ্রম থেকে জানানো হয়েছে। আপনার গলায় বাবার ভজন ভক্তরা শুনতেই চাইবে না। আরে সবাই তো সব কিছু করে, কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখার কায়দা জানতে হয়। নিজেও ডুবলেন আমাকেও ডোবালেন।' লোকটা যে ভবিষ্যতে আর যোগাযোগ করবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। এর ওপর সকাল থেকে সাংবাদিকরা তার সঙ্গে দেখা করবে বলে তাগাদা দিয়ে আসছে। সে বলে পাঠিয়েছে অসুস্থ। তবু কেউ বাড়ি ছেড়ে নড়ছে না। ধ্যানেশকুমারের মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে চায়। বাবা বলেছিলেন ইউনিস তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে প্রয়োজন হলে। কিন্তু তাকে তো নিষেধ করেননি যোগাযোগ করতে। লোকটাকে চেনে ধ্যানেশ। পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রতিবছর বিরাট জলসার আয়োজন করে ইউনিসের

সাকরেদরা। তখন তাকে যেতেই হয়। ধ্যানেশের নামে ভাল টিকিট বিক্রি হয়। ধ্যানেশ প্রায় দৌড়ে এসে টেলিফোন টেনে নিল। ইউনিসকে পাওয়া গেল একবারেই। মাঝে মাঝে এই কলকাতার সবকিছু কেমন ঠিকঠাক চলতে শুরু করে! ধ্যানেশ জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটে মহারাজের খবর পেলেন ইউনিসভাই?'

ইউনিস নির্লিপ্ত হয়ে বলল, 'এর উত্তর তো শুধু আশ্রমকেই দেবার কথা আমার।'

ধ্যানেশ অসাড় হল। ইউনিস এর মধ্যেই পাল্টে গিয়েছে। এই পরিবর্তন হবে সবখানে। সে আর কথা বলতে পারছিল না। ইউনিস জিজ্ঞাসা করল, 'আর কিছু বলবেন?'

'আমি একটা চক্রান্তের শিকার হলাম ইউনিসভাই। আমি নিরপরাধ।'

'আপনি সেটা ভাল জানেন।'

'কিন্তু আমি কি করব? আমি বাবার সেবা করতে চাই।'

'আমি কি বলতে পারি বলুন! নিজের মনে সেবা করুন। মন্দির-টন্দির করুন। আচ্ছা, প্রয়োজন হলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' লাইন কেটে দিল ইউনিস।

রিসিভার ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল ধ্যানেশ। এই কয়বছরে যে সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল তা ভেঙে গেল। কিন্তু তার নিজের যে সাদা এবং কালো টাকা রয়েছে তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বেঁচে থাকার পক্ষে তা দুই জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সে চাকরকে ডেকে বলল, 'সাংবাদিকদের বল আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব।'

স্নান করেও শরীরের ধকল গেল না। মনের ওপর পাথরচাপা থাকলে শরীর সেটা প্রকাশ করেই। বাইরের ঘরে ঢুকে ধ্যানেশ দেখল জনা বারো সাংবাদিক বসে আছেন। তাকে দেখামাত্র প্রশ্নগুলো তীরের মত আসতে লাগল, 'আপনাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? বাবা আপনার সংস্রব ত্যাগ করেছেন? কি ধরনের চরিত্রহীনতার কাজ আপনি করেছেন? আপনি কি বাবার আদর্শে আঘাত করেছেন? নারীঘটিত ব্যাপার বলে ইতিমধ্যেই কিছু খবর প্রচারিত হয়েছে, সেটা কি সত্যি? বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আপনার প্রফেসনাল লাইনে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে?'

ধ্যানেশ জানত প্রশ্নগুলা এইরকমই হবে। তার আশঙ্কা ছিল তার সেই সব ছবি যদি এরা সঙ্গে করে আনে তাহলে কি জবাব দেবে। বাবা ঠিকই বলেছেন যারা ছবি পাঠিয়েছে তারা কপিগুলো খবরের কাগজেও পাঠাতে পারে। কিন্তু এরা এখনও খবরটা পায়নি বলেই মনে হচ্ছে যদিও সেটা বেশিদিন চাপা থাকবে না।

প্রশ্নাবলী শেষ হলে ধ্যানেশ একটা চেয়ারে বসল। খুব চেষ্টা করছিল নিজেকে শান্ত রাখতে এবং ধীরে ধীরে কথা শুরু করল, 'আমি বাবার শ্রীচরণে আশ্রিত। তিনিই আমার ইহকাল পরকাল। কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বরেরও শত্রু আছে। দেবতাদের বিরুদ্ধে দানবরা চিরকাল যুদ্ধ করেছে। যদিও পরিণতিতে দানবদের পরাজয় অনিবার্য কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করতে তাদের জুড়ি নেই। এই দেব-দানবের যুদ্ধে আমি বলি হয়েছি। মিথ্যে ঘটনায় আমার চরিত্রে কালি

ছিটিয়েছে তারাই যারা বাবার ক্ষতি করতে চায়। প্রাণ থাকতে সজ্ঞানে আমি এমন কিছু করতে পারি না যাতে বাবার অসম্মান হয়। অজ্ঞান করে যদি কিছু করা হয় আমাকে নিয়ে তাহলে কিছু বলার নেই। আশ্রমের সম্মান, বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় আমি ওই আদেশ মেনে নিয়েছি। কিন্তু বাবার প্রতি অনুরক্ত আমি। বাবার নামগান করে যাব শেষদিন পর্যন্ত।'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই দানবরা করা ? কি নাম ?'

'বাবার প্রতি ঈর্ষাকাতর সংঘবদ্ধ কিছু মানুষকেই আমি দানব বলেছি। নাম বলতে পারব না এখন কিন্তু সময় হলেই প্রকাশ করব।'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'চরিত্রহীনতার ঘটনাটা বলবেন ?'

'আমি চরিত্রহীন নই। বাবার চরণাশ্রিত মানুষ চরিত্রহীন হতে পারে না। কিন্তু ধরুন আপনাকে অজ্ঞান করে মুখে মদ গুঁজে যদি বলা হয় আপনি মদ্যপ তাহলে দর্শকরা আপত্তি করবেন না। আমার ক্ষেত্রে এইরকম অবস্থা হয়েছে।'

'আপনি এখন কি করবেন ?'

'এখন আমার আত্মপ্রমাণের সময়। যতদিন নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণ করতে না পারব, ততদিন জলসা রেকর্ড অথবা সিনেমায় গান গাইব না।'

সাংবাদিকরা খবর পেয়ে খুশি, 'কি করবেন এখন ?'

'কলকাতায় বাবার নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।' ইউনিসের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় উত্তেজিত হল ধ্যানেশ, 'সেই মন্দিরে নামগান করব। আমার গুরুভাইরা স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন সেখানে। আমি জানি না এতে কারো আপত্তি হবে কিনা!'

একজন প্রশ্ন করলেন, 'বিখ্যাতা অভিনেত্রী সুমিতা সোমকে নিয়ে আপনার সম্পর্কে যে গল্প চালু আছে সেটাই কি বাবার ক্রোধের কারণ ?'

'সুমিতা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। বাবা সত্যদ্রষ্টা। তিনি এমন ভুল করবেন না।'

আশ্রমে খবরের কাগজ আসে বিকেলে। বাবা নিজে পড়েন না। মেজ মহারাজ কাগজের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোর সারমর্ম পাঠিয়ে দেন প্রতি বিকেলে। আজ 'আশ্রমসংবাদ' প্রকাশের জন্যে তৈরি। তার একটি কপি ও খবরের কাগজের সারমর্ম নিয়ে তিনি চললেন আনন্দভবনের উদ্দেশে। ধ্যানেশকুমারের সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোথাও সেই অশ্লীল ছবিগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সাংবাদিকদের ক্ষমতা অসীম। তাদের কাছে নিশ্চয়ই সত্য গোপন নেই। তবু খবরটা ছাপা হল না কেন ? বড় মহারাজ আজ আনন্দভবনের দ্বারেই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আশ্রমসংবাদ প্রস্তুত ?' মেজ মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি ধ্যানেশের কথাগুলো পড়েছ ?'

'হ্যাঁ। লিখে এনেছি।'

'সে কি করতে চায় বুঝতে পেরেছ ? কলকাতায় আর একটি বেআইনী আশ্রম তৈরি করতে চায়। ব্যাপারটা পরে খুব সাংঘাতিক হতে পারে।'

'কিন্তু কাগজে তো শুধু মন্দিরের কথাই লিখেছে।'

'অঙ্কুর থেকেই তো ডালপালা ফুল ফল জন্মায়। এ ব্যাপারে বাবাকে অবহিত করতে হবে।' সেবকদের নমস্কার নিতে নিতে বড় মহারাজ মেজ মহারাজকে নিয়ে বাবার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে তাঁরা আপ্লুত হয়ে গেলেন।

বসে আছেন বাবা। ধ্যানমগ্ন। বোঝা যাচ্ছে, তিনি এখন বাহ্যিক চেতনারহিত। ওঁদের মনে হল বাবার শরীর থেকে এক পরমসুন্দর জ্যোতি বেরিয়ে চারপাশ আলোকিত করেছে।

দুই মহারাজ নতজানু হয়ে বসলেন। ক্রমশ এক পবিত্র স্পর্শ যেন তাঁদের জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে বহুদূরে সরিয়ে আনল। যে ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেননি বাবার অসীম কৃপায় সেই আনন্দলোক যেন তাঁদের সামনে প্রতিভাত হল। এইরকম অবস্থা কতক্ষণ চলেছিল তা তাঁদের জানা নেই, চেতনা স্বচ্ছ হল বাবার ডাকে। তাঁরা মুগ্ধ চোখে বাবাকে দেখলেন।

বাবা বললেন, 'আগামী গুরু পূর্ণিমায় আমি আমার সমস্ত প্রধান শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'

বড় মহারাজ মাথা নাড়লেন। মেজ চুপ করে বসে রইলেন।

বাবা বললেন, 'আমার সমস্ত শিষ্যকে একত্রিত করবে তোমরা। স্থানাভাব, খাদ্যাভাব ইত্যাদির যুক্তি আমি শুনতে চাই না।'

বড় মহারাজ বললেন, 'গুরু পূর্ণিমার তো এখনও কয়েকমাস দেরি আছে।'

'সময় কখনও অপেক্ষা করে না বড়! আমি খুব অস্বস্তিবোধ করছি। আজ আমি উপাসনা মন্দিরে যোগ দেব। চারপাশে এত অন্ধকার, হাত বাড়ালেই নোংরা লাগে।'

মন্দির শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র মেজ মহারাজের স্মরণে এল এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা। এতক্ষণ ওইসব যেন বিস্মরণে তলিয়ে গিয়েছিল। তিনি 'আশ্রমসংবাদ' পত্রিকার প্রথম কপিটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। বাবার মুখে এবার হাসি ফুটল। পাতা উল্টিয়ে তিনি সম্পাদকীয় পড়লেন। মাথা নাড়লেন। তারপর পত্রিকাটিকে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

'ছোটে পথভ্রষ্ট কি হয়েছে? আমার পুত্র, আমারই রক্ত তার শরীরে, কি করে পথভ্রষ্ট হল তাই বুঝতে পারছি না। অবশ্য সে আলোর পথ থেকে অন্ধকারের পথে সবে পা বাড়িয়েছে। এখনও তার ফিরে আসার সময় রয়েছে।' বাবা চোখ বন্ধ করে বললেন।

বড় মহারাজ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সে কোথায়? আপনি যদি হদিশ দেন তাহলে ভাল হয়।' মেজ মহারাজ না জিজ্ঞাসা করে পারলেন না, 'তাকে কি সনাতননাথের শিষ্যরা জোর করে লুকিয়ে রাখেনি?'

বাবা জবাব দিলেন না এই প্রশ্ন দুটির। মাথা নেড়ে বললেন, 'আগামী পরশু আমি দশজন মহারাজের সঙ্গে মিলিত হব। ব্যবস্থা করো।' তিনি উঠলেন। উপাসনা মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসছিল। বড় মহারাজ মেজ মহারাজের উদ্দেশে বললেন, 'আজকের সংবাদপত্রের সারমর্ম রেখে যাও।'

মেজ মহারাজ দুটি ফুলস্কেপ কাগজ বাবার সামনে রাখলেন, 'এতে ধ্যানেশের

সাংবাদিক সম্মেলনের কথাও বলা আছে।'

'সে কি আমার নির্দেশ অমান্য করেছে?'

বড় মহারাজ নড়েচড়ে বসলেন, 'অমান্য করেনি কিন্তু সে বিনীত ভঙ্গীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। আশ্রম তাকে বিতারিত করলেও সে আশ্রম ছাড়বে না। কলকাতায় সে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আপনার উপাসনা করবে। শিষ্যদের সে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

'আশ্রম নয়, মন্দির।' মেজ মহারাজ সংশোধন করে দিলেন।

'একই ব্যাপার। কলকাতায় আমাদের উপাসনাগৃহ আছে। তা সত্ত্বেও আর একটি উপাসনাগৃহ তৈরি করা মানে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। দলচ্যুত হলে যেমন নতুন দল গড়ার চেষ্টা হয় এও তেমনই।'

বাবা হাসলেন, 'নতুন মন্দির তৈরি করলে সেখানেও তো আমাকে প্রয়োজন হবে।'

'কিন্তু এতে ভক্তরা বিভ্রান্ত হবে।'

'সেই বিভ্রান্তি দূর করবে তোমরা। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার ভাবনাটি ওকে ত্যাগ করতে বল। আমার নামগান করতে চাইলে করতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

উপাসনা গৃহের সামনে নিয়মিত ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা শ'ছয়েক। হঠাৎ তারা লক্ষ করলেন, বাবা আরাধনায় যোগ দিতে আসছেন। নিয়মিত এই দৃশ্য দেখা যায় না। তাঁরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বাবার স্পর্শকৃপা পাওয়ার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সেবকরা কঠোর হাতে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখছিল। উপাসনাগৃহে প্রবেশ করে বাবা নামগান শুরু করলেন। মুহূর্তেই বাইরের চেঁচামেচি থেমে গেল। সমস্ত ভক্তবৃন্দ সেই গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। প্রায় এক ঘণ্টার পর বাবা শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের আর্তচিৎকার শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই নিজস্ব প্রয়োজন এবং কষ্টের কথা জানাতে ব্যাকুল। বাবা হাত নাড়লেন। আজ তাঁর অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু এইসময় বড় মহারাজ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কিছু বলতেই তিনি একটু থেমে গেলেন। নিচু গলায় নির্দেশ দিয়ে একজন সেবকের এগিয়ে ধরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জন্মালেই তো মরতে হবে। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে যে সময়টা তা খুব অল্প। চোখের পলক ফেললেই ফুড়ুৎ হয়ে যায়। কিন্তু কার চোখের পলক? না মহাকালের। মানুষের নয়। মানুষ যদি একটু হুঁশ রেখে সময়টাকে খরচ করে তাহলে এই ধরিত্রীর বড় উপকার হয়। পিতামাতার কর্তব্য সন্তানকে ভাল রাখা। অর্থাৎ আগামীকালের মানুষের ভাল থাকার জন্যে একালের মানুষকে কিছু করে যেতে হবে। সেই কাজ করাটা কি ধরনের? সবসময় যদি আমি আমি করি। আমার এই নেই সেই নেই ভাব তাহলে কাজটা করবে কখন? নিজেকে অতিক্রম কর। তুমি মনে রেখ যা কিছু করছ তা আগামীকালের মানুষের জন্যে। তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। পাখি যেমন তার ছানার জন্যে খাদ্য আহরণ করে মুখে নিয়ে নীড়ে ফিরে আসে, তুমি তাই করছ। উত্তেজনা পরিহার কর। কোন কোন মানুষ অথবা সংঘবদ্ধ দল আমাকে হেনস্থা করতে চায়, আমার ওপর কালি

লেপন করতে চায়। তাদের সেটা করতে দাও। কালবৈশাখীর মত মহাতেজী মেঘও তো আকাশকে বেশিক্ষণ অধিকার করতে পারে না। শান্তি পাও, শান্ত হও।'

সেবকরা যখন বাবাকে আনন্দভবনে নিয়ে এল তখনই মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল। আশ্রমের ভেতর সাইরেন বাজানো নিষিদ্ধ। বড় এবং মেজ মহারাজ প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রতিবার যখন সচিব, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কিংবা রাজ্যমন্ত্রী আসেন তখন তাঁরা ওখানে দাঁড়িয়েই তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

বিশাল গাড়ি থেকে দশাসই চেহারার সচিব নেমে এলেন। পরনে খাদির শেরওয়ানি আর মাথায় গান্ধি টুপি। নেমে দুই হাত যুক্ত করে হাসলেন। বড় মহারাজ নমস্কার ফিরিয়ে দিলে সচিব বললেন, 'হঠাৎ এভাবে বিরক্ত করায় আমি দুঃখিত। আমি কি বাবার দর্শন পেতে পারি ? বেশি সময় আমি নেব না।'

বড় মহারাজ বললেন, 'বাবা এইমাত্র উপাসনা শেষ করে এলেন। একটু ক্লান্ত। তবে আপনি মিনিট দশেক কথা বলতে পারেন।'

সচিব বললেন, 'তাই যথেষ্ট।' সচিবের এক সঙ্গী পেছন পেছন আসছিল। তিনি তাকে নিষেধ করলেন, 'আমি এখন মহাপুরুষদর্শনে যাচ্ছি। তোমার এখন প্রয়োজন নেই।'

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে সচিবের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মুখে হাসিটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন তিনি। সময় লাগল কিন্তু ওপরে উঠে আসতে সক্ষম হলেন। এর আগের বার তিনি এসেছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সঙ্গে। সেবার তাঁকে সিঁড়ি ভাঙতে হয়নি। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী একাই সিঁড়ি ভেঙে উঠে গিয়েছিলেন।

সচিবকে নিয়ে বড় মহারাজ দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করতেই বাবাকে দেখতে পাওয়া গেল। ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন তিনি। তাঁকে দেখামাত্র সচিব নতজানু হতে চেষ্টা করতেই বাবা বললেন, 'থাক। অযথা শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তুমি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছ, এই যথেষ্ট। ওকে একটা টুল দাও।'

ঘরের কোণ থেকে একটা টুল এনে বড় মহারাজ নিজেই সচিবের সামনে রাখলেন। হাতজোড় করেই তাতে বসলেন সচিব। বসতে পেরে খুব আরাম হল তাঁর। হাত জোড় করেই তিনি বললেন, 'আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য।'

বাবা হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। কোন কথা বললেন না।

সচিব সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'আমি আপনার অত্যন্ত অনুগত। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীও একথা জানেন। তাই তিনি আমাকে গতকাল দিল্লীতে বলেছেন যে তাঁর হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। তিনি কলকাতায় এলেই এখানে চলে আসবেন।'

বাবা এবারও নির্বাক রইলেন যদিও তাঁর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

সচিব এবার যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দুটো হাত ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আপনার সেবক। আদেশ করুন কি সেবা করতে পারি ?'

বাবা এবার মাথা নাড়লেন, 'তুমি এসেছ, তোমার মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়েছে এই তো যথেষ্ট। মন দিয়ে কাজ করো। নিজের ওপর আস্থা রেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে সচিবের গলা সরু হয়ে এল, 'এটা কি কোন কাজ বাবা ? আমি

তো পুতুল হয়ে আছি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যাতে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর অনুগ্রহ পেয়ে মুখ্যসচিব পদে নির্বাচিত হতে পারি!'

'ছোট পুতুল থেকে বড় পুতুল হতে চাও?'

'তবু তো বড়।'

'যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ হবে। আমি কে? তবু তোমার ইচ্ছার কথা আমার কানে গেল। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কবে আসছে এদিকে? তাকে অনেকদিন দেখিনি।'

বিগলিত সচিব বললেন, 'আমি খবর নিয়েই আপনাকে জানিয়ে দেব।'

বাবার ইঙ্গিত বুঝে বড় মহারাজ এগিয়ে এলেন, 'এবার বাবার বিশ্রামের সময় হয়েছে।'

সচিব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তিনি সোজা হলেন। হয়ে নমস্কার জানালেন বাবাকে। তারপর হৃষ্টচিত্তে বড় মহারাজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়িতে পা দেবার আগে সচিব চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, বাবার শিষ্যসংখ্যা এখন কত?'

'পাঁচ কোটি।'

'ওহ্! এত শিষ্য আর কোন গুরুর নেই। বাবার দর্শন পেয়ে আমার প্রাণ তাজা হয়ে গেল। কি আনন্দ, কি আনন্দ। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী দেখা করতে এলে বাবাকে আমার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন মহারাজ।'

কোলাঘাট স্টেশনে তখন ঘুম-ঘুম আবহাওয়া। ট্রেন থেকে নেমে নির্মল এক মিনিট চুপ করে দাঁড়াল। তার টিকিট নেই। ট্রেনে কোন চেকার অবশ্য সামনে এসে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বিপদটা গেট পেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘটতে পারে। ক্রমশ প্ল্যাটফর্ম নির্জন হয়ে গেল। এবার সে পা বাড়াল। গেটে কেউ নেই। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। এখানেই কাউকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। এত রাত্রে যারা স্টেশনে থাকে তাদের সবসময় এখানেই পাওয়া যায়। কেউ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে খোঁজ পেতে অসুবিধে হবে না। নির্মল একটা রিকশা নিয়ে বলল, 'চল।' লোকটিও কোন প্রশ্ন করল না। স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসে সে রিকশাওয়ালাকে বলল, 'স্কুলে চল।'

চালক বলল, 'কোন স্কুল?'

নির্মল একটা দ্বিধায় পড়ল। লোকটাকে বলবে নাকি যে-স্কুলের মাঠ আছে সেই স্কুলে। কিন্তু তাতে তো লোকটা বুঝে যাবে সে কোলাঘাটে নতুন। কটা স্কুল আছে এখানে? রিক্সাওয়ালা তার দিকে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। সে বলল, 'সামনের স্কুলটাতেই।'

'ও। ওখানে তো হেঁটেই যেতে পারতেন। পুরো ভাড়া দিতে হবে কিন্তু।'

রিকশা যেখানে থামল তার সামনেই স্কুল। মাঠটা পেছন দিকে। দূরত্ব স্টেশন থেকে তিন মিনিটের বেশি নয়। তবু রিকসাওয়ালার দাবি পূর্ণ করল নির্মল।

অন্ধকারে স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়াল সে। ভদ্রলোকের নাম অবিনাশ চন্দ্র

দে। স্কুলে পড়ান। এই স্কুলেই ? অন্য স্কুলের গায়েও তো মাঠ থাকতে পারে। স্কুলের নাম কেন লিখে দেয়নি কাগজে ? অবিনাশ চন্দ্র দে তাকে দেখে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবেন কে জানে ?

স্কুলের মাঠের পেছনে যে বাড়িগুলো তার সামনে দিয়ে একবার হেঁটে এল নির্মল। রাত এখন এগারটা ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ একটি গলা কানে এল ওর, 'শুনুন !'

সে দেখল মাঝখানের একটি বাড়ির বারান্দা থেকে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক নেমে আসছেন। খোলা দরজা দিয়ে যে আলো বাইরে বেরিয়েছে তাতেই বোঝা গেল ওঁর মাথায় টাক আছে। মুখোমুখি হতেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে খুঁজছেন ?'

'শিক্ষক অবিনাশ চন্দ্র দে-র বাড়ি !'

'আপনি নির্মল ?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়ান এখানে।' ভদ্রলোক ফিরে যেতেই নির্মল বুঝতে পারল এঁর নামই অবিনাশ। কানাই কি এঁকে আগাম খবর দিয়েছিল ? কিন্তু উনি ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন কেন ? একটু বাদেই বাড়িটির আলো নিভে গেল। সব চুপচাপ। হঠাৎ সামান্য আওয়াজ শুনে মুখ ফিরিয়ে নির্মল দেখল পাশের টিনের দরজা খুলে অবিনাশ একটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। কাছে এসে ভদ্রলোক সাইকেলের পেছনের সিট দেখিয়ে বললেন, 'উঠুন।'

কথা না বাড়িয়ে নির্মল উঠে বসল। জীবনে সে প্রথমবার সাইকেলে উঠল। মনে হচ্ছিল সবকিছু টলোমলো লাগছে। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে অবিনাশ বললেন, 'ইজি হয়ে বসুন। আঁকড়ে ধরবেন না। স্টেশনে কি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছেন ?'

'না। কাউকেই কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।'

প্রায় এক ঘণ্টা ওরা নিঃশব্দে চলল। কোলাঘাট ছাড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে অনেকটা যাওয়ার পর ওরা গ্রাম পার হল দুটো। তারপর জঙ্গল শুরু হতেই কিছু কাঠের বাড়ি নজরে এল। তার একটার সামনে সাইকেল থামালেন অবিনাশ। চাপা গলায় বললেন, 'শব্দ না করে ওপরে উঠে আসুন।' দেখে মনে হয় সরকারি বাড়ি। দোতলা। গেট খুলে সিঁড়ি বেয়ে অবিনাশ ওপরে উঠে আসতেই নির্মল ওর পিছু নিল।

দরজায় মৃদু টোকা দিলেন অবিনাশ। দ্বিতীয়বারে পাশের একটা জানলা খুলে গেল। সেখানে এসে একটি মহিলা কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

'অবিনাশ। দরজা খোল।'

আর কোন প্রশ্ন উচ্চারিত হল না। দরজাটা খুলল। হ্যারিকেন জ্বলছে দেখে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাতেও লোড শেডিং ? বাঃ চমৎকার।' এক মধ্যবয়সী মহিলা সম্ভবত সদ্য ঘুম ভাঙায় বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, 'আবার কি হল ?'

'এর নাম নির্মল। আমাদের ছেলে। কিছুদিন থাকবে।'

'আমার কোয়ার্টার্স কি ধর্মশালা ? যাকে পারছ তুলে দিচ্ছ ?'

'রাগ করো না। পরে এ ব্যাপারে কথা বলব। আমাকে এখনই ফিরতে হবে। কারেন্ট এলেও আজ রাত্রে আলো জ্বেল না। নির্মল এখানে নিশ্চিন্তে থাকুন। বাইরে না বেরুলেই ভাল। খবর থাকলে পাঠাবো।' অবিনাশ আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। মহিলা দরজা বন্ধ করলেন, 'আচ্ছা জ্বালা। মাঝরাতে এমন হুজ্জত ভাল লাগে কারো? বিয়ে করা বউও এত ঝক্কি সামলায় না।'

নির্মল সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'আমি না হয় চলে যাচ্ছি!'

'আপনাকে কে যেতে বলেছে। ওমা! এ যে ঠোঁট ফোলানো ছেলে! কত বয়স?'

'একুশ।'

'তাই। একুশ বছর বয়সটা খুব খারাপ। কবিতাটা পড়নি? তাহলে তোমাকে তুমিই বলব।'

'আপনার অসুবিধে হলে—।'

'তুমি আমার কোন অসুবিধে করোনি। করেছে ওই টেকোটা। হুটহাট করে বলে এটা করো ওটা করো। পেটে কিছু পড়েছে?' আচমকা প্রশ্ন হতে নির্মল হকচকিয়ে মাথা নেড়ে না বলল। মহিলা এবার ভাল করে মুখ দেখলেন। তারপর বললেন, 'এ ঘরে এস।'

দ্বিতীয় ঘরে না ঢুকে পাশের একটি ছোট ঘরে ঢুকলেন তিনি। একটা তক্তাপোষ, টেবিল আর বইপত্র ছাড়া কিছু নেই সেখানে। মহিলা বললেন, 'এখনেই শোবে। গরম কাল, বেশি কিছু লাগবে না। বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এসো।' কয়েক পা এগিয়ে একটা অন্ধকার দরজা দেখিয়ে বললেন, 'এইটে। হ্যারিকেন নিয়ে যাও। বেশি জল ঢালবে না।' তারপর দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে গেলেন।

বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল নির্মলের। সময় নষ্ট না করে সে হ্যারিকেন তুলে বাথরুমে ঢুকল। গায়ে জল ঢালার পর শরীর জুড়লো যেন। এ বাড়িতে আর কে কে থাকে? এখনও কোন পুরুষের অস্তিত্ব টের পায়নি সে। এত রাতে দরজায় শব্দ করলে তো ছেলেরাই সামনে আসবে! নির্মল ঠিক করল, কোন ব্যাপারে কৌতূহলী হবে না। যা পরে এসেছিল তাই চড়িয়েই বাথরুম থেকে বের হয়ে ছোট ঘরে এল সে। ঘরে যে জানলা আছে তা এখন বন্ধ। খুলে দেবে নাকি? সাহস হল না তার। এইসময় মহিলা একটা ডিস আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এলেন, 'মাঝরাতে এর বেশি কিছু জুটবে না। খাও।'

নির্মলের খুব মজা লাগল। আজ পর্যন্ত এইরকম কথার সঙ্গে কেউ তাকে খাবার দেয়নি। আশ্রমে তো বটেই, কলকাতার বাড়িতেও সেবকরা আসন পেতে খাবার পরিবেশন করে তাকে সসম্ভ্রমে ডাকত। সে ডিসের ওপর নজর বোলালো। তিনটে রুটি, একটা ভাজা গোছের কিছু আর খানিকটা মধু। কোন বাক্যব্যয় না করে রুটি ছিঁড়ে মুখে দিল সে। খাবার আগে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে নিবেদন করতে গিয়ে সামলে নিল অবশ্য। মহিলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ওর খাওয়া দেখলেন। তারপর ঘরের কোণে সরে গিয়ে একটা স্যুটকেস টেনে বের করলেন তক্তাপোষের নিচ থেকে। ডালা খুলে সাদা পাজামা বের করে বললেন, 'দ্যাখো, তোমার হবে কিনা। না হলেও এটা পরে শোবে। একেবারে নাগা

সন্ন্যাসী হয়ে আসা হয়েছে।' বলে স্যুটকেস তক্তাপোষের নিচে আবার ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি ঘুমতে চললাম। সকালে ডিউটি আছে।' যাওয়ার সময় অবশ্য ডিস গ্লাস নিয়ে যেতে ভুললেন না।

অন্যের পায়জামা পরে তক্তাপোষে শুয়ে নিজেকে প্রবোধ দিল নির্মল। এ অন্তত বস্তির ঘরে পশুপতির কৃপায় থাকার চেয়ে ঢের ভাল। কিন্তু তবু তার ঘুম আসছিল না। হ্যারিকেন ঘরে নেই। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে জানলা খুলে দিতেই মৃদু বাতাসের স্পর্শ পেল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে জঙ্গলের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। নির্মল আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। একটু একটু করে বাইরের অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। তারার আলো এখন চমৎকার। বাবার মুখ মনে পড়ল তার। অমন ক্ষমতাবান মানুষ নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বের করার জন্যে তোলপাড় করছেন সারা দেশ। বাবাকে ধ্যানের সময় ভাবাবিষ্ট হতে দেখেছে সে। ধ্যানে বসলে বাবার দৃষ্টির অগম্য স্থান কিছু থাকে না বলে মহারাজদের বিশ্বাস। তিনি কি এখন জানতে পারছেন সে এই তক্তাপোষে অন্যের পাজামা পরে শুয়ে আছে? বড় অস্বস্তি হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল যেন দুটি চোখ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সে মায়ের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল ওই চোখ দুটোকে অস্বীকার করতেই। মৃত্যুর সময় মা মামার বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে বাবা সেখানে যাননি। বলেছিলেন, 'ওর সময় শেষ হয়ে গেছে। বিকেল হয়ে গেল বলে দিন গেল দিন গেল করে কেঁদে কি লাভ। সন্ধ্যাকে সন্ধ্যার মত আসতে দাও।'

কিন্তু মেজ মহারাজের সঙ্গে তাকে মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। নির্মল যখন মায়ের বিছানার পাশে উপস্থিত হয়েছিল তখনও তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল। একটু একা হলে তিনি বলেছিলেন, 'নিমু, বড় কষ্ট।'

সে কেঁপে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, 'তোমার কষ্ট বাবা দূর করছেন না কেন?'

হঠাৎ কঠোর হয়েছিল মায়ের মুখ, 'কে বাবা? ওই লোকটা তার শিষ্যদের কাছে বাবা, আমার কি? তোর জন্মদাতা, কিন্তু তুই আমার ছেলে। তোর বাবা তোকে কোনদিন বুকে জড়িয়ে আদর করেনি। আঃ।'

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হল। চোখ খুলতেই চমকে উঠল নির্মল। এক জোড়া চোখ তীব্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। বাবা বলে চিৎকার করে উঠতে গিয়েই সামলে নিল সে নিজেকে। ততক্ষণে তার নজর কিন্তু ওই চোখ ছাড়িয়ে শরীরটার ওপর পড়েছে। একটা বিরাট চেহারার সাদা প্যাঁচা তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। সাদা প্যাঁচা এই প্রথম দেখল সে। এরাই কি লক্ষ্মীর বাহন? পাখিটাকে তাড়ানো দরকার। ওইরকম চোখ নিয়ে জানলায় বসে থাকলে কোন মানুষের ঘুম আসবে না। নির্মল বিছানা থেকে নামতেই পাখিটা ঘুরে বসল। বেশ ওজনদার পাখি। তারপর ডানা মেলে দিল অন্ধকারে।

সকালে নির্মলের যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ বেশ কড়া। চোখ খুলে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই কানে একটা বিদ্ঘুটে শব্দ ভেসে এল। সে কোথায় শুয়ে আছে এই বোধ স্পষ্ট হওয়ামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তক্তাপোষ ছেড়ে। এবং তখনই আবিষ্কার করল, তার ফরসা শরীরে চাকা চাকা

জায়গাতে দাগ ফুলে উঠেছে। বেশ চুলকচ্ছে ওগুলো। আর সেই শব্দটা হয়ে যাচ্ছে একটানা। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে দরজা দিয়ে মুখ বের করল। তারপর সোজা বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে পোশাক পাল্টে নিল। ব্যবহৃত পাজামাটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়ল সে। আশ্রম বা কলকাতায় তার ছাড়া পোশাক সেবকরাই কেচে দেয়। বাসি কাপড় জলে না দিয়ে রেখে দেওয়া অন্যায়। অথচ— ! নির্মল পাজামাটাকে ভাঁজ করে সঙ্গে নিয়ে ঘরে চলে এল। যে পোশাক এই মুহূর্তে পরে আছে সে তা থেকেই বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে। টানা কদিন এই পোশাকেই থাকতে হয়েছে তাকে। বরং এগুলোকেই কেচে দিলে ভাল হত। এইসময় দরজায় শব্দ হল। নির্মল দেখল একটি মেয়ে, যার চুল পিঠ ছাড়িয়ে নিতম্ব ছেয়ে রয়েছে, দুহাতে চায়ের কাপ আর বিস্কুটের ডিস নিয়ে ঘরে ঢুকে টেবিলে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। এই মেয়েটি কে ? গায়ের রঙ শ্যামলা কিন্তু মুখ মিষ্টি চেহারা। গতরাতে যে মহিলা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর বোন ?

দশটা বেজে গেল। নির্মলের ঘরে কেউ এল না। সে-ও ওই ঘর থেকে বেরোয়নি। দোতলায় কারো কথা শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য বাইরে মানুষজনের কথা যেমন শোনা যাচ্ছিল তেমনি জঙ্গল থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছিল সজোরে। আর সেই বিদ্‌ঘুটে শব্দের রহস্যভেদ হল যখন সে কাঠঠোকরাটাকে দেখতে পেল জানলার উল্টোদিকের গাছে এসে বসায়। ওই ছোট্ট পাখির ঠোঁট যে অমন শব্দ তৈরি করতে পারে কে জানত। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়েছিল সময় কাটাবার জন্য। ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা বই-এর বাঙলা অনুবাদ, আমার ডায়েরি থেকে। পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে একটা প্লেটে ডিমভাজা আর চায়ে কাপ নিয়ে কেউ এসেছে খেয়ালই করেনি। যখন খেয়াল হল তখন সংকুচিত হয়ে সরে বসল। মেয়েটি ওদুটো টেবিলে রেখে সকালের কাপ ডিস তুলে চলে যাচ্ছিল, নির্মল সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, উনি আছেন ?'

মেয়েটি মুখ ফেরাল। তার চোখে কৌতূহল। নির্মল তাড়াতাড়ি বলল, 'ওই যে, যিনি গতরাতে আমাকে এখানে থাকতে দিলেন।' মেয়েটি মাথা নেড়ে না বলল। তারপর বেরিয়ে গেল।

অর্থাৎ সেই মহিলা সকাল থেকেই বাড়িতে নেই। কি যেন বলেছিলেন কাল রাত্রে, ডিউটিতে যেতে হবে না ওই ধরনের কিছু ! নির্মল ডিসের দিকে তাকাল। জন্মাবার পর থেকে সে কখনও ডিম খায়নি। অথচ এখন খিদে পাচ্ছে তার। একটা টুকরো চামচে কেটে মুখের কাছে নিয়ে আসতেই নাকে গা গুলানো গন্ধ ধবক্ করে লাগল। চামচটা নামিয়ে অসহায় চোখে তাকাল সে। তার শরীর চাইছে না এই বস্তুটিকে গলা দিয়ে নামাতে। অথচ কোটি কোটি মানুষ এই খাদ্য পরমানন্দে খেয়ে নেয়। তাহলে সে পারবে না কেন ? শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। নাক টিপে বড় একটা টুকরো মুখে চালান করে দিল নির্মল। স্বাদ তো ভাল। আশ্রমে আমিষ খাওয়া নিষিদ্ধ। তাদের সিস্টেমেই মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ কিংবা রসুন কখনও প্রবেশ করেনি। পেঁয়াজ বা রসুন নিরামিষ তরকারির সঙ্গে খেলে খুব অসুবিধে হয় না। ওইভাবে ডিমভাজা শেষ করে

চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। তরল পদার্থটি পেটে যাওয়ামাত্র শরীর গুলিয়ে উঠল। এবং তার পরেই পেট থেকে সব কিছু যেন ছিটকে ওপরে উঠে আসতে চাইল। নির্মল কয়েকবার চেষ্টা করল সামলাবার। তারপর বিপদ আসন্ন বুঝে ছুটে গেল বাথরুমে। সশব্দে পেট থেকে ডিমের টুকরোগুলো সজলে বেরিয়ে আসতে লাগল বাইরে।

বমি শেষ হবার পর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সে কিছুক্ষণ। প্রচণ্ড কাহিল লাগছে এখন। শেষদিকে তেতো জল বেরিয়েছে। হঠাৎ পেছনে আওয়াজ পেল নির্মল। অবসন্ন হয়ে মুখ ফেরাতেই সে মেয়েটিকে দেখতে পেল। বাথরুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি তাকে ইশারা করল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু উদগারিত পদার্থগুলো পরিষ্কার না করে সে বের হয় কি করে! কিন্তু তার আগেই মেয়েটি বাথরুমের কোণ থেকে একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে অরম্ভ করেছে। খুব লজ্জা লাগছিল নির্মলের। তার বমি আর একজন কেন পরিষ্কার করবে? কিন্তু তার প্রতিবাদ জানাবার কোন সুযোগ রইল না। তার আগেই মেয়েটি জল ঢালতে শুরু করেছে। ঘরে ফিরে এল নির্মল। খুব খারাপ লাগছে। শরীর তো বটেই মেয়েটির কাজে সে আরও লজ্জিত বোধ করছে। তক্তাপোষে চিত হয়ে শুয়েছিল সে। ধীরে ধীরে শরীরের অস্বস্তি কমে এল এবং তখনই মেয়েটি আবার এল। শুকনো মুড়ি একটা বাটিতে করে এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। খুব অবাক হল নির্মল। এত কাণ্ড হয়ে গেল কিন্তু মেয়েটি কোন কথা বলছে না কেন?

বারোটার পর বাইরের দরজায় শব্দ হল এবং মহিলার গলা শুনতে পেল নির্মল। মিনিট খানেক পরেই তিনি দরজায়, পরনে নার্সের পোশাক, কি ব্যাপার, বমি করা হয়েছিল শুনলাম। ডিম খাও না?'

নির্মল লজ্জিত হল। সে বলল, 'আসলে অভ্যেস নেই তো। আমি খুব দুঃখিত।'

'আরে দুঃখ প্রকাশ করার কি আছে। কিন্তু অভ্যেস নেই কেন? তোমাদের বাড়িতে ডিম খায় না? এ তো বড় অদ্ভুত কথা! মাছ মাংস খাও তো?'

'এতদিন খাইনি। কিন্তু খেতে আর আপত্তি নেই।'

'ওমা। আবার পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস বমি করে নষ্ট করবে?'

'আর হবে না, প্রথমবার বলেই—।'

'তোমাদের বাড়ির সবাই কি খুব ভক্ত? দীক্ষা নিয়েছে কারো?'

নির্মল মুখ তুলল। সত্যি কথাটা বলার জন্যে মন উশখুশ করছিল। যারা তার জন্যে এত করছে তাদের কাছে মিথ্যে বলা ঠিক নয়। কিন্তু না, তার এই আত্মগোপন করে থাকা বিফলে যেতে পারে সামান্য একটা ভুলের জন্যে। সে বলল, 'ওই আর কি!'

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার শরীর খারাপ করছে না তো?'

'না।' জড়তা কাটাতে পারছিল না নির্মল।

'তুমি তো ভাবিয়ে তুললে ভাই। পথে নামার আগে ভাল করে চিন্তা করা দরকার ছিল। যখন যেমন তখন তেমন না হলে কি করে পারবে? খুব আদরে

ছিলে ?'

'আদর নয়, যত্নে। যত্নটা গলায় ফাঁস হয়ে ছিল।'

'মায়ের ?'

'না। আমার মা নেই।'

'ও।' মহিলা চলে গিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে। আর নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল নির্মলের। এই শরীর কেন ননীগোপাল হয়ে ছিল এতদিন। আর নয়। কিন্তু মহিলা তার সম্পর্কে অন্য প্রশ্ন করছেন না কেন ? কেন সে এসেছে, কি করতে চায়—ইত্যাদি বিষয় তুলছেনই না। মহিলা যে নার্সের চাকরি করেন তা বোঝা গেল কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কি ? হঠাৎ বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা প্রায়ই শিষ্যদের উপদেশ দেন, 'সংসার থাকবে মাছের মত। সাঁতার কাটবে, ঘুরবে ফিরবে কিন্তু গায়ে জল লাগাবে না।' অর্থাৎ তুমি থাকো তোমার মত, খামোকা জড়িয়ে পড় না। আজ এই মুহূর্তে নির্মলের পছন্দ হল কথাটা। এরা কে কি ভাবছে, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? সে কানাইদের পাঠানো খবরের জন্যে অপেক্ষা করবে। আশাকরি কদিন তাকে আশ্রয়হীন হতে হবে না।

পার্ক সার্কাসে ইউনিসের দেখা পেলেন না তিনকড়ি রায়। ইউনিস নাকি কদিন থেকে চরকির মত ঘুরছে। ওর এক চামচে বলল, 'বসকো ডিফিট হো গিয়া। বাকি হামলোগ নেহি ছোড়ে গা। বসকো প্রেস্টিজ বাঁচানেই পড়েগা। আপ উনসে মিলনে মাংতা তো যাইয়ে থিয়েটার রোড।' লোকটা এর বেশি কিছু জানে না বলে জানাল। ওর বস সকালে একজনকে বলেছিল যে থিয়েটার রোড যেতে হবে এইটেই তার কানে লেগে আছে।

থিয়েটার রোডে ইউনিসের কোথায় আড্ডা তা তিনকড়ি রায়ের জানা নেই। হঠাৎ সুধাময় সেনের কথা মনে পড়ল তার। ছোটে মহারাজের ব্যাপারে সুধাময় প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন কিন্তু ইদানিং কোন সাড়াশব্দ নেই। আশ্রম থেকে নির্দেশ না এলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। মহারাজ পদমর্যাদায় তিনি তিন নম্বর সারিতে ছিলেন এতদিন। বুকের ভেতর কষ্টটা যেন উথলে উঠল। তিনকড়ি রায় থিয়েটার রোডে যাওয়ার জন্যে একটি ট্যাক্সি ধরলেন। তাঁর মনে পড়েছিল সুধাময় সেনের অফিস ও পাড়াতেই। ইউনিসকে না পাওয়া যাক, সুধাময়ের সঙ্গে কথা বলা যাক। ওই একটা ছেলেকে পাওয়ার ওপর তার সবকিছু নির্ভর করছে। লাউডন স্ট্রিট ছাড়িয়ে এসে তিনি ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। এখনও এ পাড়ায় দিন শুরু হয়নি। রাস্তা বেশ নির্জন। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন। ডান দিকের গলিতে ঢুকে পঞ্চাশ গজ হাঁটলে সুধাময়ের অফিসের দরজা পাওয়া যাবে। তিনকড়ি রায় লক্ষ করেননি আর একটা ট্যাক্সি এতক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করছিল। তিনি গলিতে ঢুকতেই সহসা বাঁক নিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল সেটা।

সুধাময়ের অফিসে এত সকালে লোকজন নেই। কিন্তু তাঁর অ্যাসট্রে উপচে পড়ছে। খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। বাঁ হাতে চুলের গোছা মুঠোয় নিয়ে চুপ

করে বসে ছিলেন তিনি। তাঁর উল্টো দিকে গম্ভীর মুখে ইউনিস বসে।

হঠাৎ ইউনিস বলল, 'এতদিন আমরা আলাদা আলাদা তালাস করেছি কেন সেনবাবু ? যদি এককাট্টা হতাম তাহলে ছোটে মহারাজকে পেয়ে যেতাম।'

'কি করেছি কেন করেছি বলে কোন লাভ নেই। এখনও যদি ওকে খুঁজে না পাই তো হয়ে গেল। আশ্রম থেকে যে ভাষায় কথা শুনিয়েছে তার পরে মুখ দেখাবো কি করে জানি না।'

'ঠিক বাত। প্রিস্টিজ তো আমার ভি পাংচার হয়ে গেল। আমি সনাতননাথের আশ্রমে পাত্তা লাগালাম। না, সেখানে ছোটে মহারাজ যাননি। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওই আনন্দ সরস্বতীকে। ওর ওখানে আমার লোক ঢুকতেই পারছে না।'

সুধাময় সেন মুখ তুললেন, 'না মশাই। কেউ ছোটে মহারাজকে ইলোপ করেনি। তিনি নিজেই হাওয়া হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কথাটা বলা যাবে না।'

'প্রমাণ পেয়েছেন কিছু ?'

'পেয়েছি। প্রথমে জেনেছিলাম ছোটে মহারাজ কলেজ থেকে লুকিয়ে খিদিরপুর ব্রিজের নিচে যেতেন গাঁজা খেতে। খুব অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু আমার লোক প্রমাণ এনেছে। তারপরে একটা সোর্স বলল ওরা গাঁজা কিনেছে কিন্তু খায়নি। ওঁর সঙ্গে যে ছেলেটা যেত সে-ও কলকাতা থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। সে নাকি কড়া রাজনীতি করে। সি পি এম, কংগ্রেস কিংবা নকশাল নয়। সে বিশ্বাস করে এইসব রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে কিস্যু হবে না। মানুষকে জাগাতে হবে। তাদের সক্রিয় করতে হবে, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।'

'ব্যস ব্যস'। হাত তুলে থামাল ইউনিস, 'এইসব লম্বাচওড়া বাত আমি বহুৎ শুনেছি। কিন্তু এর সঙ্গে ছোটে মহারাজের কি সম্পর্ক ?'

'ছোটে মহারাজ যখন এই ছেলেটার সঙ্গে উধাও হয়েছেন তখন মনে হচ্ছে উনি ওই দলে জয়েন করেছেন।' গম্ভীর গলায় বললেন সুধাময়।

'আই বাপ ! কি বলছেন আপনি ?'

'ঠিকই। প্রহ্লাদকুলে দৈত্য। কেউ যদি একা লুকিয়ে থাকতে চায় তাহলে শেষপর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হয় না কিন্তু দল যদি তাকে লুকোতে সাহায্য করে তাহলেই মুশকিল। আমার লোক ওকে একটা বস্তি পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল। কিন্তু বস্তি থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।' সুধাময় বললেন।

'বস্তি ? ছোটে মহারাজ ? আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তো আমাদের জান চলে যাবে। এই রিপোর্ট আপনি আশ্রমে পাঠিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। ওখানে আমি অসৎ হতে পারব না।'

'আচ্ছা। আপনি আমাকে বস্তির ঠিকানাটা দিন, আমি একবার কৌশিস করি।'

সুধাময় মাথা নাড়লেন, 'কোন লাভ হবে না। আমার লোক কোন ক্লু পায়নি ওখানে। যে লোকটার কাছে উনি ছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়েছে সেখানে উনি থাকতেই পারেন না। ছোটে মহারাজ যে ভাবে মানুষ হয়েছেন তাতে তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়।'

ইউনিস চুপ করে দেখল সুধাময়কে। তার মনে হল সুধাময় যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না। বস্তিতে ওর লোক যেহেতু কিছু পায়নি তাই হয়তো ভয় হচ্ছে ইউনিস যদি কিছু পেয়ে যায় তাহলে বাবার কাছে হেয় হয়ে যাবে। সে ঠোঁট ওল্টালো, 'সেনসাহেব, এখন সময়ের দাম খুব বেশি। আপনার লোক যেভাবে খবর খুঁজছে আমার লোক তার উল্টো তরিকা নেবে। গলায় ছুরির চাপ পরলে সত্যি কথা বোবার পেট থেকেও হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে। উনি ওখানে নেই, কিন্তু কোথায় গিয়েছেন সেই খবরটা আপনাকে দেব।'

অগত্যা সেন একটা কাগজে বস্তির আর পশুপতির নাম লিখে দিলেন। ঠিক সেইসময় নিচে একটা সোরগোল উঠল। আর তার পরেই অফিসের একটা বেয়ারা ছুটতে ছুটতে বলল, 'মর গিয়া, একদম গাড়িকা নিচে চলা গিয়া।'

সুধাময় ধমকালেন, 'কি হয়েছে? কে গাড়ির নিচে পড়েছে!'

লোকটা দাঁড়াল, 'সার, নিচে হামলোঁগকো গলিমে। হাম ব্যালকনিমে খাড়া থা। এক বুড্ডা হামলোঁগকো গলিমে যব ঢুকা ফটকে ট্যাক্সি উনকো ওপর আ গিয়া হেভি স্পিডমে। অ্যাকসিডেন্ট নেহী, জানবুঝকে মার ডালা।'

ইউনিস বলল, 'ছেড়ে দিন। কলকাতায় রোজ এরকম গোটা দশেক কেস হয়।'

ইউনিসের সঙ্গে কথা শেষ করে সুধাময় সেনের মনে হল একটু শুতে পারলে ভাল হত। শরীর যেন আর পারছে না। সে ইউনিসকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোনদিকে যাবেন?'

'পার্ক সার্কাস। তারপর এই বস্তিতে।' কাগজ দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল ইউনিস। বলে নেমে গেল সে। সুধাময় ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি করে যাঁর দয়ায় আজ করে খাচ্ছেন তাঁর এতবড় বিপদে কোন উপকারে আসতে পারলেন না এখনও। মনের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধছিল। তিনি মুখ বাড়িয়ে নিচের গলির দিকে তাকালেন। বেশ ভিড় জমে গেছে সেখানে। ট্যাক্সিটা নেই। নিশ্চয়ই কেউ এতক্ষণে পুলিশকে খবর দিয়েছে। হাই তুললেন সুধাময়। এখন এই মুহূর্তে পাঁচজন দক্ষ অফিসার তাঁর কোম্পানির হয়ে ছোটে মহারাজকে খুঁজে যাচ্ছে। অতএব বাড়িতে নয়, এখানেই, অফিসেই বিশ্রাম নিতে হবে। ঘরে ফিরে আসতেই পাগলের মত ইউনিস ঢুকল, 'সেনসাহেব, সর্বনাশ হো গিয়া। আই বাপ, আভি কিয়া হোগা?' কপাল চাপড়াল লোকটা।

'কি হল?' মুহূর্তে সুধাময়ের শরীর থেকে ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন।

'তিনুমহারাজকা মার ডালা।'

'তিনু—?' নামটা পুরো উচ্চারণ করতে পারলেন না সুধাময়।

'হ্যাঁ। আপনার গলিতে ওঁকে একটা ট্যাক্সি এসে চাপা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। কেউ নাম্বারটাও বলতে পারছে না। খুন।' ইউনিস টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল।

সংবিৎ ফিরে পেলেন সুধাময় ইউনিসের ছুটে যাওয়া দেখে, 'কাকে ফোন করছেন?'

'আশ্রমকে। বড়ে মহারাজকে।'

'দাঁড়ান। আপনি ওই ঘরের ফোনে ওসির সঙ্গে কথা বলুন। আমি দেখছি।'

ইউনিসের চোখেমুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠলেও সে নিজেকে সামলে নিল। তারপর কাঁধ নাচিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সুধাময় চেয়ারে ফিরে এসে রিসিভার তুললেন। এস টি ডিতে লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। লাইট্‌নিং কল বুক করলেন তিনি। লাইন পাওয়ার আগেই ইউনিস বেরিয়ে এল, 'ওসি খবর পেয়ে গেছেন। আমি চলি।'

'দাঁড়ান ইউনিসভাই। কথা আছে।' সঙ্গে সঙ্গে রিঙ শুরু হতেই রিসিভার তুলে নিলেন সুধাময়, 'হেলো, বড় মহারাজাকে চাই। সুধাময় বলছি কলকাতা থেকে। মহারাজ, সুধাময় বলছি। না, এখনও কোন খবর পাইনি তবে যা সূত্র—, না, না, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ, না, না, আপনি লাইনটা কাটবেন না। কি বললেন ? আপনি খবরটা পেয়েছেন ? কখন পেলেন ? ও, ও, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ইউনিস ? আচ্ছা। আচ্ছা!' রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছলেন সুধাময়। এই সাত-সকালেও তাঁর কপালে ঘাম জমেছে। তাঁর গলা থেকে অদ্ভুত স্বর বেরুলো, 'ইউনিস ভাই!'

'কি হল ?' ইউনিস চেয়ার টেনে নিলেন, 'উনি কি বললেন ?'

'উনি খবরটা পেয়ে গেছেন।'

'সেকি ? কে খবর দিল ?'

'নাম বলেনি। শুধু বলেছে তিনকড়ি রায় যিনি মহারাজ ছিলেন, একটু আগে সুধাময় সেনের গলিতে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন। এরকম অ্যাক্সিডেন্ট যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে বাবা যেন একটু ভাবনা-চিন্তা করেন। সাহস বুঝুন!'

'এ তো রীতিমত ওয়ার্নিং। খুন করেই ওয়ার্নিং দিয়েছে। কারা ?'

'বড় মহারাজ বললেন এখনই কোন সিদ্ধান্ত না নিতে। আর ওসিকে বলতে তিনি যেন খুনের কেস না বলে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে ব্যাপারটাকে ট্রিট করেন। এব্যাপারে যা করার আপনি করুন।' সুধাময় মাথায় হাত দিলেন।

ইউনিস একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'বড়ে মহারাজ আমার কথা কিছু বললেন ?'

'হ্যাঁ। এখন থেকে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে বললেন।'

ইউনিস সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আমি ওসিকে সামলাচ্ছি। কিন্তু সেনসাহেব, মনে হচ্ছে যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল। এখন খুনকা বদলা খুন চলবে।'

'খুন ? তিনু মহারাজ খুন হননি বলতে হবে কিন্তু।'

'তা জানি। এখন যতগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হবে তাকে অ্যাক্সিডেন্টই বলতে হবে।'

ইউনিস বেরিয়ে গেল। এইসময় টেলিফোন বেজে উঠতে সুধাময় রিসিভার তুলে খুব ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলছেন ?'

'স্যার, আমি ব্যানার্জি। দারুণ একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছে। ছোটে মহারাজ রাত আটটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে ঢুকেছিলেন।'

সুধাময়ের হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এল, 'তারপর ?'

'ওইসময়ের ট্রেনগুলো দেখছি।'

'ননসেন্স। হাওড়া স্টেশন থেকে তখন গাদা গাদা ট্রেন ছাড়ে দূর পাল্লার।'

'তা ছাড়ে। কিন্তু লোকাল ট্রেন বেশি ছাড়ে না। সঙ্গে কোন জিনিষপত্র ছিল না বলেই এই পয়েন্টটা ভাবছি। মনে হল আপনি ইন্টারেস্টড হবেন, তাই ফোন করলাম।'

'ইন্টারেস্টেড হবেন! হয়ে করবটা কি? ছোটে মহারাজকে হাওড়া স্টেশনে দেখা গেছে, এইটে বলে আমি কোথাও পৌঁছলাম? ওটা শিয়ালদা হলে কি এসে যেত?' লাইনটা কেটে দিলেন সুধাময়। এরকম নাকে দড়ি দিয়ে অনেকদিন কেউ তাকে ঘোরায়নি।

শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়ে তৃপ্তি করে দুপুরে খেল নির্মল। এখন তার পরনে পাজামা আর গেঞ্জি। ময়লা হয়ে যাওয়া পোশাক প্রায় জোর করেই কেচে দিয়েছেন মহিলা। খাওয়া শেষ হলে তিনি এলেন নির্মলের কাছে, 'তুমি বিড়ি সিগারেট খাও না?'

মাথা নাড়লো সে, না। তারপর লাজুক হাসল।

'কি ব্যাপার বল তো?' তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন?' নির্মল একটু সঙ্কুচিত হল।

'তোমার আগে আরও দুজনকে রাখতে হয়েছে আমাকে। তোমার দলেরই লোক। তাদের মত তোমার আচরণ তো দূরের কথা, কথাবার্তাও নয়। তুমি খুব বড়লোকের আদুরে ছেলে?'

কি বলবে বুঝতে না পেরে নির্মল বলল, 'আদুরে কি না জানি না তবে আমার বাবা অনেক বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। অবশ্য নিজের নামে বা উপার্জনে নয়।'

'সে আবার কি কথা? তোমরা নিশ্চয়ই কয়েক পুরুষের বড়লোক। তা বাপু তোমার গায়ের রঙ, মুখের গড়ন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।' মহিলা হাসলেন।

'আপনার কাছে বুঝি এইরকম হুট করে লোক আসে?'

'না না। দুজনই এসেছিল। অবিনাশ নিয়ে এসেছিল। প্রথমবার রাখতে খুব ভয় লেগেছিল। তারপর দেখলাম ছেলেদুটো একটু জেদী তবে খারাপ নয়। তুমি এদের দলে কতদিন ঢুকেছ?'

'বেশি দিন নয়। অবিনাশবাবু কোন খবর দেননি, না?'

'না। কেন, এখানে খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'না, না। উনি বলেছিলেন খবর পেলেই দেবেন, তাই।'

'খবর পায়নি হয়তো। আচ্ছা, কি করতে চাইছ তা তোমরা ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল নির্মল।

'এই উত্তরটা তোমার আগের দুজনই ওইভাবে বলেছিল। কিন্তু আমি ভাই কোন আশা দেখি না। অতবড় নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত বিফল হল। অবিনাশ বলে, এখন আর সশস্ত্র আন্দোলন নয়, জনসাধারণকে সচেতন করবে ওরা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে। এদেশের মানুষ যেন মাটির পুতুল। কদিন পরেই তোমরা হতাশায় ভুগবে।' মহিলা ঘর থেকে মুখ বের করে বললেন, 'অমু, কাপড় শুকিয়েছে কিনা দ্যাখ।' মহিলাকে বেশ পছন্দ হয়েছিল নির্মলের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অবিনাশবাবু কি বলেন এ ব্যাপারে?'

'ও কি বলবে ? একসময় সি পি আই করত, তারপর সি পি এম। নকশাল আন্দোলনের সময় নিজের দলের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটলেও দল ছাড়েনি। দল ছেড়েছে ওর পার্টি যখন ক্ষমতায় এল। বলল, 'দুবছর ক্ষমতায় এসেও যে দল একটি পাড়ার একটা রাস্তার মানুষকে সচেতন করতে পারেনি, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি, তাদের দিয়ে বুরোক্রেটিক শাসনব্যবস্থা চালানো সম্ভব কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা অসম্ভব।'

'আপনি অবিনাশবাবুর সঙ্গে আছেন ?'

'ওর দলে আছি নাকি ? না বাবা। নার্সের চাকরি করি। কোনমতে বেঁচে আছি। গরীবের ঘোড়ারোগ হলে আর দেখতে হবে না।'

যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে করব করব করেও করতে পারেনি নির্মল, সেটা এবার আচমকা বলে ফেলল, 'অবিনাশবাবু কি আপনার আত্মীয় ?'

মহিলার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারপর হাসিতে ভেঙে পড়লেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আত্মীয়তার চেষ্টা করছি সেই পনের বছর বয়স হতে। বেজাত বলে হল না সেইবয়সে। বিয়ে হল আমার। বিধবাও হলাম। অবশ্যি তার আগেই অবিনাশের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। ছেলেমেয়ে হয়নি। ওর বউ আমার কথা জানে। তবে ভাই একটা কথা বলি, আমার পেটে ব্যথা হলে জেনেছি ওরও হয়। যেদিন আমি কোন কারণে খেতে পারিনি সেদিন শুনি অবিনাশও না খেয়ে থেকেছে। একে যদি আত্মীয়তা বল, বলতে পার। উঠি, একটু গড়িয়ে নিই ভাই। শরীর ভারী হলে দুপুরে না গড়িয়ে উপায় নেই।' মহিলা চলে গেলেন। আশ্রমের জীবনে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে একটি শৃঙ্খলা সবসময় বজায় থাকত। যেখানে অনুলোম অথবা প্রতিলোম বিবাহের ব্যাপারেই বিধিনিষেধ ছিল সেখানে এইরকম বিবাহোত্তর সম্পর্ক বজায় রাখলে আশ্রম কোন সম্পর্ক রাখত না। কিন্তু এই মহিলাকে দেখে তার খারাপ লাগছে না কেন ? কেন মনে হচ্ছে অবিনাশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি অকপট। মা বলতেন, যে কাজ করে পরে কোন অনুশোচনা হয় না সেই কাজ কখনই পাপ নয়। মহিলা সম্ভবত সেই স্তরে পড়েন।

দুপুরটা কাটতেই চাইল না। ঘরে বসে বসে একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হল সে। বিকেলে মেয়েটি এল দুধের গ্লাস নিয়ে। সেটা দেখে নির্মল জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'দুধ কেন ?'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি সামলাতে চেষ্টা করল। নির্মল বলল, 'আমাকে চা দিলেই ভাল লাগবে।' মেয়েটি না দাঁড়িয়ে চলে গেল। কিন্তু মহিলা এলেন, 'কি ব্যাপার, তুমি দুধ খাবে না ?'

'না। আমাকে চা দেবেন, দুধ খেতে ভাল লাগে না।'

'চা খেয়ে তোমার বমি হয়ে গিয়েছিল না ?'

'ওঃ। কিন্তু তা বলে আবার চেষ্টা করব না ? আমি অসম্ভব বলে কিছু আছে বিশ্বাস করি না। সবাই যা পারে আমি তা নিশ্চয়ই পারব।' নির্মল বলল।

মহিলার মুখে চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'তুমি কে বল তো ?'

হকচকিয়ে গেল নির্মল, 'মানে ?'

'তুমি কোন সাধারণ পরিবারের ছেলে নও।' মহিলা চলে গেলেন। মেয়েটি চা

নিয়ে এল খানিক পরে। নির্মল মেয়েটির দিকে তাকাল। এখন ও ওর ছোট্ট কপালে টিপ পরেছে। বেশ লাগছে দেখতে। মেয়েটি কথা বলল না। একটা মানুষ এত চুপচাপ থাকে কি করে কে জানে!

সন্ধের পর দরজায় শব্দ হল। নির্মল তার ঘরে বসেই গলা শুনল, 'সব ঠিক আছে তো? নির্মলবাবু কোথায়?'

একটা হাসি বাজল, 'এতকাল পরেও আমার ওপর কি আস্থা! ছেলেটি কে?'

'কেন? হঠাৎ এরকম প্রশ্ন?' গলাটা অবিনাশের।

'আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। সাধারণ পরিবারের ছেলে নয়।'

'সেটা হতেই পারে। তোমাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে?'

'না, না। ও সেরকমই নয়। সারাদিন ঘরে বসে বই পড়ে গেছে।'

এরপরেই ওর ঘরে অবিনাশ এলেন, 'কানাই আজ রাত্রে আসছে। সঙ্গে দুজন নেতা থাকবেন। আপনাকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। হয়তো আজ রাত্রেই আপনাকে এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে।'

নির্মল হাসল, 'আমার তো তৈরি হবার জন্যে সময়ের দরকার নেই।'

অবিনাশ ওর খাটে বসলেন, মহিলা দরজায়, 'নির্মল, আমাকে এখনই কোলাঘাটে ফিরে যেতে হবে। দূরত্বটা তো দেখেছেন। এক কাজ করুন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। ওরা তো আমার বাড়িতেই প্রথমে আসবেন। কথাবার্তা ওখানে বলেই ঠিক করা যাবে সবকিছু।'

মহিলা বললেন, 'ওরা কি কোলাঘাট থেকে ফিরে যাবে, না এদিকেও আসবে?'

'বুঝতে পারছি না। শুধু বলা হয়েছে ওকে খবরটা দিতে।'

নির্মল উঠে দাঁড়াল, 'চলুন। আবার ওদের নিয়ে কেন এতদূর ফিরে আসবেন?'

অবিনাশ হাত তুললেন, 'দাঁড়ান। এত তাড়াতাড়ি কে ফিরছে। চা খাওয়াবে?'

মহিলা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন। হঠাৎ পাল্টে গেলেন অবিনাশ, 'নির্মল, আমাদের কাজ, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির কথা আপনি জানেন?'

'লিফলেট এবং কানাই-এর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি।'

'আপনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিতে পারবেন?'

'এইভাবে সারা দিনরাত যদি ঘরে বসে থাকতে হয় তাহলে অবশ্য কিছুই বলা সম্ভব নয়।'

'এটা তো টেম্পোরারি। কারণটা আমার চেয়ে আপনি জানেন ভাল করে।'

'হ্যাঁ জানি। মুশকিল। হল কলকাতায় কি হচ্ছে তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'আমি জানি না কলকাতায় আপনি এমন কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছেন কিনা যে কারণে আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমি কিন্তু বারংবার বলেছি প্রত্যেককে ক্লিন শ্লেট হতে হবে। জনসাধারণ যেন আমাদের সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা পোষণ না করে।'

'আমি কখনও কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।' নির্মলের কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কর্তৃত্ব ছিল যে অবিনাশের মনে হল ও সত্যি কথা বলছে। তাছাড়া এমন উজ্জ্বল চেহারার যুবক কেন অপরাধ করতে যাবে। যদিও এভাবে লুকিয়ে থাকাটাও তার পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু একটু বাদেই তিনি তাঁদের ভাবনা ও কাজের সমন্বয়মূলক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও সি পি এমের সদস্য হিসেবে তিনি কিছুই করতে পারেননি। শুধু দলের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া তাঁর করণীয় কিছু ছিল না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, পশ্চিমবাংলার একটি এলাকার মানুষকেও আজ পর্যন্ত বোঝানো সম্ভব হল না যে, কম্যুনিজম কতটা প্রয়োজনীয়। এখনও প্রতিটি নির্বাচনের সময় সদলে ঘনঘন বক্তৃতা করে নিজেদের সম্পর্কে প্রচার করতে হয়। মানুষের আস্থা অর্জন করার মত কোন কাজ দল করেনি। পরবর্তীকালে নকশালরা বিপ্লবের কথা বলেছিল মাটি তৈরি না করেই। এবং সেই বিপ্লব কার বিরুদ্ধে ? কিছু পুলিশের গলা কেটে, কিছু মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে, কিছু স্কুল পুড়িয়ে দিয়ে ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের দখল পেয়ে গেল ওরা, কিন্তু কদিন ? মিলিটারি যদি অস্ত্র ধরতো তাহলে এক দিনেই ধ্বংস হয়ে যেত তারা। বিপ্লব প্রাদেশিকভাবে সম্ভব নয়। বিশেষত সেই বিপ্লব যদি সশস্ত্র হয়।

'কয়েক শ' যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে এদেশের মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১৮৯৩ সালে বিদেশযাত্রার সময়ে জাহাজে বসে বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে কথাগুলো লিখেছিলেন। তিনি আরও লিখেছিলেন, এমন কিছু নিঃস্বার্থ যুবক চাই যারা, 'ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ হবার জন্যে আমরণ চেষ্টা করবে।' অবিনাশ বললেন, 'আজকের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ তুললেই অনেকে নাক কোঁচকান। তাঁর সময়ে যারা অত্যাচারী ছিল তারা এখন নেই। কিন্তু তাদের জায়গা পাল্টে গিয়েছে কিন্তু লুপ্ত হয়নি। আর একদল কায়েমী স্বার্থান্বেষী মানুষ সেটা দখল করেছে। পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেসকে আমরা অত্যাচারী শোষক বলতাম। তার আগে ব্রিটিশের ওই ভূমিকা ছিল। গত দশ বছরে কংগ্রেসের জায়গা নিয়েছে যারা তারা কিন্তু নিজেদের অজান্তেই ওই ভূমিকায় কাজ করছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরলেই এটা সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। আমার কয়েক বিঘে জমি আছে। ভাল ফসল হয়। কিন্তু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি শাসক দলকে ভোট দিইনি। পার্টি অফিসে আমার যাতায়াত নেই। অতএব ফসল ফললেই আমার জমিতে সারারাত হাত চালিয়ে সেটি যদি উধাও করে দেওয়া হয় তাহলে থানা কোন ডায়েরি নেবে না। যারা মাঠে কাজ করবে তাদের বলা হবে আমাকে বয়কট করতে। এক কিংবা দুবছর চাষ করার চেষ্টা না করে আমি জমি ফেলে রাখলাম। তারপর একদিন কিছু শ্রমিক সেখানে চাষ করতে এল। আমি বাধা দিতে গিয়ে মার খেলাম। পুলিশ জানাল, গোলমাল না করে কোর্টে যেতে। আদালত মানেই অনন্তকাল।

'তাদের কোন উপায় নেই, রাস্তা নেই, সাহায্যকারী বন্ধু নেই। রাক্ষসের মত নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করছে, তার যন্ত্রণা তারা পাচ্ছে

কিন্তু জানে না কোথা থেকে ওই মার আসছে। আর যারা মারছে তারা বেশ সুখী; শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের কাতর ধ্বনিতে তাদের দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না।'

নির্মল মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। বিবেকানন্দের রচনা সে পড়েছে। অবিনাশ সেই বক্তব্যকে সমকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রয়োগ করছিলেন তাতে তার বিস্ময় বাড়ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বাবার কোন বিরোধ এখনও হয়নি। ও ব্যাপারে তিনি কখনও কথা বলেননি। বিবেকানন্দ মানে একজন ধর্মপ্রচারক এই রকম ধারণা তারও প্রথম দিকে ছিল। বিবেকানন্দের যে কথাটা তাকে প্রথম নাড়া দিয়েছিল তা হল ধর্ম সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার মতামত। 'ধর্মের কতগুলো আচরণকে ধর্ম নাম দিয়ে ধর্মধ্বজীরা স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে বহুবছর ধরে। যদি এই অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাহলে যখন জনগণ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় উত্থিত হবে, তখন ধর্মকে বিসর্জন দেবে শোষণের যন্ত্র জ্ঞান করে।' ভোগাধিকারসাম্য ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না। আজ সমস্ত পশ্চিমবাংলার শহরে, পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, তাঁদেরও মেরুদণ্ড আছে, তাঁদেরও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাহলে সময়টা পাল্টে যাবেই। ক্ষুধার্তের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পোড়া রুটি অথবা কাঁকর ভর্তি ভাত পরিবেশন করা হয়েছে। তাকে ওই দুটির একটিকে নির্বাচন করতে হবে বেঁচে থাকার জন্যে। আর কোন তৃতীয় বস্তু তার সামনে নেই। সে হয়তো পোড়া রুটি ফেলে কাঁকর বাছার চেষ্টা করে ভাত খাচ্ছে ক্ষুধার জ্বালায়। এই পরিস্থিতিতে মুক্তি সেবা, সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা নিয়ে বন্ধুর মত তাদের পাশে দাঁড়ালে তারা নির্বাচন নামক ব্যবস্থার মাধ্যমেই নিজেদের অধিকার কায়েম করতে পারবে। এর জন্যে সময় লাগবে। মানুষের বিশ্বাস অর্জনে যে কাজ করতে হবে তা কন্টকশূন্য হবে না। যাদের স্বার্থ এতে স্পষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তারা বাধা দেবেই। কিন্তু পরিণতিতে জয় অবশ্যম্ভাবী। সোনার পাথরবাটি বলে যারা এই ধারণাকে ঠাট্টা করবেন, তাদেরই একদিন নিজের রসিকতা গিলতে হবে।

অবিনাশ চলে গেলেন। তিনি নির্মলকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না। বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে একটা গোপন জায়গায় সাবধানে রাখতে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আবার আজ রাত্রেই আসব।' যাওয়ার আগে অবিনাশ মহিলার সঙ্গে বাইরের ঘরে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। অন্ধকার ঘন হলে নির্মলের মনে হল যদি একটু বাইরে নেমে পায়চারি করা যায় তাহলে একঘেয়েমি কাটবে। সে পাজামার ওপর জামা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরের ঘরে মহিলা একা বসে আছেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। নির্মলের মনে হল, ওর চোখদুটো ঈষৎ ফোলা। চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'আমি একটু বাইরে হাঁটতে চাই। অসুবিধে হবে?'

'বেশিদূরে না যাওয়াই ভাল।' মহিলা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সেইসময় হাওয়া আরম্ভ হল। গাছগাছালি দুলতে শুরু করেছে। মাটিতে নেমে খুব ভাল লাগল নির্মলের। এই কদিন অদ্ভুত টেনসনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কেন? আইনের চোখে সে প্রাপ্তবয়স্ক। এখন কোথায়

থাকবে, কি করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। তাহলে এই লুকিয়ে বেড়ানো কেন ? বাবার শিষ্য সেবকরা এলে সটান বলে দেবে, 'আমি বেশ আছি। আশ্রমজীবনের পবিত্রতা আমার জন্যে নয়।' এরপরেও জোর করলে তখন পুলিশের সাহায্য চাওয়া যাবে। এই পর্যন্ত ভেবে বেশ খুশি হল সে। বাবার মুখ মনে পড়তেই সেই খুশি অবশ্য অন্তর্হিত হল। বাবা কি ক্ষমা করবেন ? যিনি ক্ষমা করতে না চেয়ে নীরবে থাকেন তাঁকে বোঝা যায় কিন্তু নীরবতা সম্পর্কে যখন সন্দেহ থাকে তখনই গোলমাল হয়। বাবা একদিন বলেছিলেন, 'শরীরের কোন অংশে পচন এলে তা সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

এই নির্জন অন্ধকারে একা একা হাঁটতে নির্মলের বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ল। কানাই কখনও আলোচনার সময়ে বিবেকানন্দের কথা বলেনি। অবিনাশ যখন কম্যুনিস্ট পার্টি শুরু করেন, তখন কানাই জন্মায়নি। সেই মানুষ এখন বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করছেন স্বচ্ছন্দে। নির্মলের মনে হচ্ছিল ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া মার্কসের সঙ্গে বিবেকানন্দের কোন পার্থক্য নেই সাম্যচিন্তায়। সব কিছু ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন এবং তিনি মনে করতেন, 'হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না।' কিন্তু বিবেকানন্দ যে পথের সন্ধান দিয়েছেন তা যে কোন সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে আদর্শ হওয়া উচিত। এদেশের মানুষকে মেরুদণ্ডহীন করে রাখা হয়েছে। যারা ব্যবসা করে, তারা নানারকম উপায়ে লাভের পরিমাণ দিনভর বাড়িয়ে হয় বাবা নয় সনাতননাথের আশ্রমে গিয়ে দক্ষিণা দেয় শান্তির জন্যে। যারা চাকরিসূত্রে ঘুষ নেয় তারা বাবার শ্রীচরণে গড়াগড়ি খায় পরকালের জন্যে পুণ্য সঞ্চয় করতে। এদেশের বাবারা জেনেশুনেই এদের নিয়ে আছেন। রাজনৈতিক নেতারা তথ্যটি চমৎকার জানেন বলেই এদের ভাঙিয়ে কাজ আদায় করেন। ওই ব্যবসায়ীরা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের ফাণ্ডে অর্থ দেয়, ওই সাধারণ চাকুরেরাই ভোটের বাক্স ভরাট করে। ধর্ম এবং রাজনীতির লীলাক্ষেত্র হল ওইসব মেরুদণ্ডহীন মানুষ, যাদের কথা কেউ ভাবে না, যারা নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে গিয়েও এক পায়ের বেশি এগোতে পারে না। এবং এই সময়ে বিবেকানন্দের সেই লাইনটি তার মনে পড়ল, 'হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম সেরূপ করে না।'

অবিনাশ, কানাই এবং আরও তিনজন এলেন ঠিক রাত দশটায়। নির্মল তখনও বাড়ির সামনে একটা পাথরের ওপর বসে। এই এতক্ষণে সে মাত্র দুটি মানুষকে দেখেছে যারা নিজের প্রয়োজনে যাওয়ায় তার উপস্থিতি লক্ষ করেনি। অবিনাশরা এলেন হেঁটে। এতটা রাস্তা ওরা হাঁটল কেন ভাবতেই নির্মলের মনে হল এটা অনাবশ্যক চিন্তা। এখন থেকে সে এইসব অনাবশ্যক ভাবনা পরিহার করবে। অন্ধকারেও চিনতে পেরে সে সোজা এগিয়ে গেল। কানাই তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হল, 'আরে, তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?'

'আর কতদিন ইঁদুর হয়ে ঘুরে বেড়াব, এবার একটু মানুষের মত আচরণ করি।'

নির্মলের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যা কানাইকে চমকে দিল। অবিনাশ বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা না বলে ভেতরে চলুন।'

নির্মল গম্ভীর গলায় বলল, 'অবিনাশবাবু, আমরা নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তার আগে আপনি একা যান। ভদ্রমহিলা প্রচুর সাহায্য করছেন ঝুঁকি নিয়েও। কিন্তু তাঁকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়াটা আমি পছন্দ করছি না। ওটা মিটিয়ে নিন।'

অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'আমি মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছি?'

'আপনি চলে যাওয়ার পরে উনি কাঁদছিলেন। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার অবশ্য আমাদের নেই। কিন্তু উনি এমন অন্যমনস্ক ছিলেন যে, আমাকে বেরিয়ে আসতে দিতেও আপত্তি করেননি। আমাদের একটা ভাল জায়গা আমরা হারাতে চাই না।' নির্মলের কথা শেষ হওয়ামাত্র অবিনাশ হনহনিয়ে উঠে গেলেন।

কানাই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেমন আছ নির্মল?'

'চমৎকার। এই প্রথম মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। এটা আমার প্রথম উপলব্ধি।'

'এরপরে কোন উপলব্ধি আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগতভাবে কে কেমন আছে, তা জানার বা জানাবার সময় এটা নয়।'

কানাই আবার হোঁচট খেল। নির্মলের কথাবার্তা এমন পাল্টে গেল কি করে, এত ব্যক্তিত্ব ও পেল কোথায়! সে সঙ্গীদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল, 'উত্তরবাংলার বালুরঘাটের সুদীপ মণ্ডল, মেদিনীপুরের অনিল চক্রবর্তী আর কলকাতার লাবণ্য মিত্র। এর কথা বলেছিলাম, নির্মল।' প্রত্যেকে হাত মেলালো। নাম শুনে ভ্রূ কুঁচকেছিল, হাত মেলাতে স্পষ্ট হল। প্যান্ট সার্ট পরা ছেলেদের মত চুল ছাঁটা তৃতীয়জন মহিলা। এইসময় অবিনাশ নেমে এলেন ওপর থেকে, 'আসুন'।

ওরা আর কথা না বলে ওপরে উঠে আসতেই মহিলাকে দেখতে পেল। ওদের বসতে বললেন তিনি। নির্মল লক্ষ করল ইতিমধ্যেই তাঁর মুখচোখ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি চা খাবেন?'

কানাই বলল, 'চা চলতে পারে। কিন্তু দিদি, আপনি যদি কয়েকটা রুটি আর একটা ভাজা করে দেন তাহলে বেশি খুশি হব।' মহিলা হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

নির্মল তখন বাকি তিনজনকে দেখছিল। অনিলবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছে। সুদীপ তিরিশ ছুঁয়েছে নিশ্চয়ই। আর লাবণ্য কি কলেজে পড়ে? মুখচোখে রুক্ষতা ছড়ানো। চট করে মেয়ে বলে বোঝা মুশকিল। গায়ের ফরসা চামড়ায় সামান্য ছায়া লেগেছে। কানাই বলল, 'নির্মল, তিনকড়ি রায় মারা গেছেন।'

নির্মল চমকে উঠল। কিন্তু দ্রুত সামলে নিল সে। বলল, 'ও।'

কানাই সেটা লক্ষ করল। সে বলল, 'সকালে থিয়েটার রোডের কাছে একটা গলির ভেতর জেনেশুনে ট্যাক্সি চাপা দিয়েছে তাকে। অবশ্য বলা হয়েছে, এটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'জেনেশুনে বলছ কেন?' নির্মল জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি ইন্টারেস্টেড হবে ভেবে আমি একটি ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম খোঁজ

নিতে। সে লোকাল লোকের কাছে শুনেছে ট্যাক্সিটা গলিতে ঢুকেছিল ওঁকে মারতেই। অথচ কেন ঘটনাটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালানো হল জানি না।'

'এটা কি জানতে চাওয়ার মত বিষয়? আমাদের কোন কাজে লাগবে?'

'সরাসরি নয়। পুলিশকে না জানিয়ে প্রথমে তোমাকে পরে আমাকে খুঁজে বের করতে তোমার বাবার অনুচররা সমস্ত পরিচিত জায়গা চষে বেড়াচ্ছে। তিনকড়িবাবু তোমার দায়িত্বে ছিলেন। জানি না সেই কারণে এই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটল কিনা।'

নির্মল হাসল, 'কানাই, যে জীবন এবং মানুষদের আমি ফেলে এসেছি তাদের সম্পর্কে আমি লিস্ট ইন্টারেস্টেড। তোমরা কাজের কথা আরম্ভ কর।'

'কিন্তু সন্ধান পেলে ওরা তোমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'আশ্চর্য! আমি বাচ্চা ছেলে নই। একুশ বছর পেরিয়েছি। আমি ঠিক করেছি এইভাবে লুকিয়ে থাকব না। তোমাকে তো বললাম, ইঁদুরের জীবন আর ভাল লাগছে না।' বেশ উত্তেজিত গলায় বলল নির্মল।

এবার অনিল চক্রবর্তী কথা বললেন, 'নির্মলবাবু, ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক কিন্তু এটা তো সত্যি ঘটনা, এদেশের খুব প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দলগুলোও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর কৃপা প্রার্থনা করে। আমি আপনার পরিচয় জেনেছি। ইচ্ছে এবং ধৈর্য থাকলে আপনি আপনার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত ওই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান সিংহাসনে বসতে পারতেন। কিন্তু আপনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন আদর্শের তাগিদে। আমরা যে সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি, তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে লড়তে হবে ধর্ম এবং রাজনীতির বিরুদ্ধে।'

এইখানে তাঁকে থামিয়ে দিল লাবণ্য, 'কথাটা ঠিক বলা হল না। ধর্ম বা রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য নেই। আমাদের লড়াই ভ্রষ্ট ধর্মগুরু অথবা স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেই। জানি, কোন গুরুই নিজেকে ভ্রষ্ট বলে চিন্তা করতে পারেন না।'

অবিনাশ বললেন, 'সে বিচার করবে কে? একজন ভক্ত যদি তাঁর গুরুকে ভগবান মনে করেন তাহলে আমরা কিভাবে তাঁকে বোঝাবো, তিনি তা নন।'

'খুব সহজেই।' নির্মল বলল, 'কারণ কোন মানুষ ভগবান হতে পারে না।'

সুদীপ মণ্ডল বলল, 'কিন্তু আপনার পিতৃদেব শুনেছি অলৌকিক কাজের মাধ্যমে অনেক শিষ্য পেয়েছেন। তাঁর সেইসব অলৌকিক ক্রিয়ার কোন ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ না পেয়ে অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করেছে। এর কারণ কি?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। তবে একথা ঠিক কোটি কোটি মানুষের চেয়ে নিশ্চয়ই তিনি আলাদা। কোটি কোটি মানুষ যা করতে পারেনি তিনি তা পেরেছেন। এই পারাটা নিশ্চয়ই একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিনের যোগাভ্যাস ওঁকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। বাবার কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় আমিও পেয়েছি। পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে হলে মানুষকে তো কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিতেই হয়।'

এরপর আলোচনা ক্রমশ রাজনীতিতে ফিরল। ওপর ওপর রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জনসাধারণের ওপর কিছু চাপিয়ে দিলে সেটা ঝেড়ে ফেলতে তাদের সময় লাগবে না। হয়তো কিছুদিন সেই চাপে ওরা নুয়ে থাকবে

মাত্র। এই ঘটনা বারংবার এদেশে ঘটেছে। পরিস্থিতি যা, তাতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা চিন্তাও করা যায় না। ধর্মের দোহাই দিয়ে একধরনের গোঁড়া সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অস্ত্র ধরানো যায় অথবা বঞ্চিত জাতির কথা বলে একটি বিশেষ ভাষাভাষীকে উত্তেজিত করে গেরিলা যুদ্ধের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু সেইসময় যুদ্ধ নেহাতই অন্ধ ভাবাবেগের পথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ভিন্দ্রেওয়ালরা বা ঘিসিংদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্যে সেটা পৌঁছায় না। দল চায় না সেই পথে গিয়ে জনসাধারণকে আরও বিভ্রান্ত, আরও সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে। জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে, তাঁদের একত্রিত করার চেষ্টা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে তাঁদের জন্যে কাজ করার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করতে হবে। এর জন্যে যে সময় লাগে লাগুক। পশ্চিমবাংলার নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে এখন থেকেই ছড়িয়ে পড়তে হবে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার অর্জনের জন্যে এলাকাভিত্তিক আন্দোলন শুরু করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাভাজন কমরেড নির্বাচিত করতে হবে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্যে। তাঁরা একশজন সহকর্মী নিয়ে এখনই কাজে নেমে পড়বেন। নির্বাচন লক্ষ্য থাকবে না আপাতত, দলের প্রচারও নয়, কাজের মাধ্যমে সে এলাকার মানুষের আপনজন হতেই হবে। মানুষ এখনও ভালবাসার মানুষকে কিছু মূল্য দেয়। নইলে নির্দল প্রার্থীরা নির্বাচিত হত না। একথা ঠিক, শুধু রাজ্যের নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করলেই জনসাধারণের জীবনযাত্রা পাল্টে দেওয়া যাবে না। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও কাজ করে কিছুটা দুর্গতি লাঘব করা সম্ভব হবেই। অবশ্য নির্বাচনে নামার আগে বামপন্থীদল একথাই বলেছিল। দুর্গতি লাঘবের বদলে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করলে জনসাধারণ নতুন করে কাউকে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ভিত যদি হয় পরিবারে পরিবারে তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ জানবে এরা ঘরের লোক। যে কোন কাজে সঙ্গী পেতে তাই অসুবিধে হবে না। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করার খসড়া করা হল। এই জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল পার্টিকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হচ্ছে না। পুলিশের তাড়া খাওয়ার কোন ভয় নেই। আন্দোলন অস্ত্র বিনা ব্যাপক অর্থে? প্রায় প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহল থেকে শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে এলাকার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে। রাত দুটোর সময় আলোচনা শেষ হল। এত রাত্রে এখান থেকে বের হওয়া উচিত হবে না। রুটি তরকারি খেয়ে ওরা যে যার মত পড়ে রইল। নির্মল নিজের ঘরে যাওয়ার সময় অস্বস্তি বোধ করছিল। লাবণ্য চেয়ারে শরীর এলিয়ে পা তুলে দিয়েছে মোড়ার ওপর। তার ঘরে তক্তাপোষ রয়েছে। ওখানে লাবণ্যকে শুতে বলা যায়। এইসময় মহিলা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। ঘন্টা তিনেক আগে খাবার দিয়ে তিনি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। নির্মল কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝলেন ওঁর ঘুম এখনও চোখ ছেড়ে যায়নি। মহিলা বললেন, 'খাটটা, ঘরটা আমি তোমাকে দিয়েছি থাকার জন্যে। কাউকে দাতব্য করার অধিকার কিন্তু দিইনি। যাও, শুয়ে পড়।'

বড় এবং মেজ মহারাজ বাবার বাম দিকে বসে আছেন। ডান দিকে নয়জন মহারাজ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে অপেক্ষা করছেন বাবার আদেশের জন্যে। বাবার চোখ বন্ধ। বেশ কিছুক্ষণ তিনি ওই অবস্থায় রয়েছেন। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি, 'তিনু তার যাবতীয় বিষয়চিন্তা সত্ত্বেও নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে। ওর শরীর আর আমাদের মধ্যে নেই। আশ্রম একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। ওর কাজের দায়িত্ব অন্য একজনকে দেওয়া প্রয়োজন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট বরদাচরণ সেনগুপ্তকে সেই দায়িত্ব অর্পণ করে বড় তুমি যোগাযোগ কর।'

বড় মহারাজ নীরবে মাথা নাড়লেন।

'তোমরা নিশ্চয়ই জানো হিন্দুধর্ম বিনাশের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। পৃথিবীতে সব যুগেই কলঙ্ক লেপন করা প্রচলিত রীতি। এ-নিয়ে আমি চিন্তা করি না। কিন্তু সনাতননাথ আর আনন্দ সরস্বতী শুধু বদনাম দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমাকে আঘাত করার কাজেও নেমেছে। একজন ম্যাজিসিয়ান আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি নাকি অলৌকিক কাণ্ড করবেন। আমি ম্যাজিক জানি না। আমার শিষ্যরা যে অলৌকিক অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে তা তারা নিজেদের ভাগ্যেই অর্জন করেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি তিনুকে যারা সরিয়ে ফেলল তারাই ছোটেকে সরিয়েছে কিনা! এতদিন হয়ে গেল কেউ ছোটের খবর পেল না, এ হতে পারে না। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বক্তব্য আছে?'

বড় মহারাজ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাত তুলে তাকে থামালেন বাবা। নয় মহারাজের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরাই আমার দক্ষিণ-হস্ত। তোমরা কিছু বল?'

মহারাজরা উশখুশ করছিলেন। শেষপর্যন্ত একজন বললেন, 'বাবা, আপনি ছাড়া জগতে আমাদের কেউ নেই। আপনার সম্মান রক্ষার জন্যে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিতে পারি। ছোটে মহারাজের কোন ক্ষতি করলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।'

বাবা মাথা নাড়লেন, 'ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ শুরু হবে। কিন্তু যাদের কিছু হারাবার ভয় নেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। যার কিছু নেই তার কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু আমাদের সামান্য ক্ষতি অনেক বড় হয়ে উঠবে। অতএব মুখোমুখি সংঘর্ষে নয়। ওদের ফেলতে হবে বোকামির ফাঁদে। তা দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে ওদের চরিত্র। তিনুর আত্মা নিজের জায়গা খুঁজে পেলেও শান্তি পাবে না যদি না একটা বিহিত হয়। কিন্তু তোমরা কখনই প্ররোচনাতেও উত্তেজিত হবে না। এটা আমার আদেশ।' বাবা থামলেন, 'আমার শরীরের বয়স হচ্ছে। ছোটের জন্য মন চঞ্চল। আমি বিশ্বাস করি ছোটের মধ্যে যে শক্তি আছে তা তাকে সবসময় রক্ষা করবে। কেউ ওকে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু যদি শোন, আমি নেই, যদি হঠাৎ ইচ্ছে হয় এই জীর্ণদেহ ত্যাগ করতে, তাহলে আমার বাণী, আমার সাধনা, আমার কর্ম বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমাদের ওপর। কিন্তু তার আগে ছোটেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি তাকে দীক্ষিত করে যেতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজ মহারাজ প্রায় ককিয়ে উঠলেন, 'বাবা, এমন কথা বলবেন না। আপনাকে ছাড়া আমরা কিছু ভাবতেই পারি না।'

'তুমি ভাবপ্রবণ। বড় আত্মমুখী। তোমাদের দুজনকেই এই কুবোধ ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীতে যখন কেউ জন্মায় তখনই তার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়। কর্মের দ্বারা, আচরণের দ্বারা মানুষ সেই মৃত্যুর আবির্ভাবকে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র। তোমাদের অনেকবার বলেছি শরীরের মৃত্যু মানেই অস্তিত্বের মৃত্যু নয়। আমাকে যদি তোমরা সঠিক অনুসরণ কর, তাহলেই দেখবে আমি তোমাদের মধ্যে বেঁচে আছি। না, না। আমি এখনই দেহত্যাগ করছি না। শুধু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তেমন সময় এলে স্থির থেকো। ছোটের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

বাবা নীরব হতেই নয় মহারাজের একজন বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোটে মহারাজ দীক্ষিত হলে তাঁর স্থান কোন স্তরে থাকবে?'

বড় মহারাজ বললেন, 'তার নামেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কনিষ্ঠতম মহারাজ হবে সে।'

বাবা হাসলেন, 'সবকিছুর সমাধান যদি এত সরলভাবে হত, বড়, তাহলে কি ভালই না হত। না, ওই প্রশ্নের জবাব দেবে সময়। তোমাদের তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। তুমি বরদাচরণ সেনগুপ্তকে লিখে দাও, ব্যারিস্টার জে সি ঘোষকে নিয়ে অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করতে। এ ব্যাপারে যা কিছু আমি কাগজপত্রে লিখে রাখতে চাই। আর হ্যাঁ, ধ্যানেশ-এর কোন খবর জানো?'

মেজ মহারাজ জবাব দিলেন, 'ইউনিসের মাধ্যমে ধ্যানেশকে জানানো হয়েছে যে, সে যদি আপনার নামগান করতে চায় তাহলে স্বচ্ছন্দে তা করতে পারে। এতে সে আনন্দিত হয়েছে। আগামীকাল থেকে সম্ভবত সে রাজপথে গান শুরু করবে।'

'ভাল। কর্মের দ্বারাই মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে। আগামীকাল কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় আসছে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। কিন্তু আমি আশ্রমে কোন পুলিশ অথবা কম্যান্ডোকে প্রবেশ করতে দিতে চাই না। তোমরা সবাই এই ব্যাপারটি ভাল ভাবে দেখবে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে কিছু বলার আছে?'

বড় মহারাজ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তাঁর মুখে মলিন ছায়া মাখামাখি। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করিয়ে দিলেন, 'আশ্রমে একটি মিনি এয়ারপোর্ট— ।'

'না। ওটা এখন নয়। মনে রেখ শত্রুরা যখন আক্রমণ করে তখন সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বড় করে দেখাতে নেই। যেদেশের মানুষ কেউ গাড়িতে চড়ে গেলে ঈর্ষাকাতর হয় সেদেশে ব্যক্তিগত এয়ারপোর্ট করার চেষ্টাকে কি চোখে দেখা হবে বুঝতে পারার মত বাস্তবজ্ঞান তোমার হওয়া উচিত। শত্রুদের হাতে অস্ত্র তুলে না দিয়ে সময়ের জন্যে অপেক্ষা কর।'

বাড়ির সামনে সামিয়ানা টাঙানো। শতাধিক অনুরাগীকে নিয়ে খোল-করতাল সহযোগে ধ্যানেশকুমার বাবার নামগান করছেন আজ সকাল থেকে। ভক্তি

ভক্তদের টানে। বেলা যত বাড়ছে তত ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। তারস্বর চিৎকারে আশেপাশের বাড়ির মানুষেরা ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠল। যদিও বাবার নামগান চলছে তবু ভক্ত ধ্যানেশের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না সে-ই এই জনতার প্রধান আকর্ষণ। বাবার বিশাল ছবিটিতে মালা পরিয়ে গান চলছিল।

ধ্যানেশের বাড়ির কাছাকাছি আছেন এক জাঁদরেল উকিল যিনি সনাতননাথের অনুগত শিষ্য। খবরটা সেই সূত্রে পৌঁছল সনাতননাথের আশ্রমে। ঘনবসতি অঞ্চলে চিৎকার করে শান্তিভঙ্গ হচ্ছে এই অভিযোগ স্বচ্ছন্দেই তোলা যায়। সেই মর্মে লোকাল থানায় একটি ডায়েরি করা হল। থানার অফিসার ঘটনাস্থলে ঘুরে গেলেন কিন্তু নামগানের উন্মাদনা দেখে কোন ব্যবস্থা নিলেন না। আশ্রম থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও ধ্যানেশকুমার নামগান করছেন এই খবর যত রটতে লাগল তত ভিড় বাড়তে লাগল। ধ্যানেশ ঘোষণা করল এই নামগান চলবে বাহাত্তর ঘন্টা ধরে। ভিড়ের জন্যে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। সনাতননাথের একজন শিষ্য এই অঞ্চলের পুলিশের বড় কর্তা। তিনি এসে হুকুম করলেন, 'জনসাধারণের যাতায়াতের পথ এইভাবে বন্ধ করা বেআইনি কাজ। রাস্তা খালি না করে দিলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।'

আজ যারা ধ্যানেশের সঙ্গে নামগান তদরকি করছিলেন, তাঁদের অনেককেই সে আগে দ্যাখেনি। বস্তুত আশ্রমের কর্মীদের সে ডাকেনি সংস্রব নষ্ট করতে বলায়। যাঁরা তদারকি করছিলেন তাঁরা খুবই দক্ষ বলে মনে হচ্ছিল তার। তাঁদের একজন ঘর্মাক্ত মুখে ধ্যানেশের সামনে এসে বলল, 'রাস্তাটা যেন ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। এমন ভিড় বাড়ছে যে, এর পরে সামলানো যাবে না।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'এসবই হচ্ছে আপনার জন্যে। আপনার ইমেজ বাড়াবার দারুণ সুযোগ এটা। নামগান এই ছোট্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত কলকাতায় ছড়িয়ে দিন।' লোকটা পরামর্শ দিল।

'কিভাবে?' ধ্যানেশ উৎসাহিত বোধ করল।

'ভক্তদের নিয়ে মিছিল বের করুন। গান গাইতে গাইতে আমরা শহর পরিভ্রমণ করব। এতে আরও লোক যোগ দেবে। সবাই বুঝবে আপনি বাবার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।'

ব্যাপারটা মনে ধরল ধ্যানেশের। এবং সেইমত ঘোষণা করা হল। যদিও বিখ্যাত হবার পর আজকাল আর হাঁটাহাঁটির অভ্যেস নেই তবু, সে থেমে গেল না। কিন্তু উদ্যোক্তাটি পরামর্শ দিল এই ভিড়ে সবার মাথা ছাড়িয়ে ধ্যানেশকে যদি জনসাধারণ দেখতে না পায় তাহলে সুযোগটাই বৃথা যাবে। ধ্যানেশের একটা হুডখোলা মারুতি জিপসি ছিল। তাকে জিপে তোলা হল মাইক সহ। সেই জিপ নিয়ে মিছিল শুরু হল। পেছনে হাজার দুয়েক ভক্ত নামগান করছে। ক্রমশ একটা কিছু করার উন্মাদনা ধ্যানেশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। তার গলা ভারী হয়ে গেলেও সে প্রাণপণে গান গেয়ে যাচ্ছিল। খোল করতাল বাজছে সমানে। পেছনে ট্রাম-বাস এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। সেই উদ্যোক্তাটি ধ্যানেশের জিপে দাঁড়িয়ে মিছিল পরিচালনা করছিল। এক ফাঁকে সে বলল, 'দেখছেন, মানুষের সংখ্যা কেমন হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। এরা যত আসছে তত আপনি

বাবার কাছে নতুন করে চলে যাচ্ছেন। আর বাবা যদি বোকামি করে আপনাকে গ্রহণ নাও করেন তাহলে আপনি নিজেই এদের নিয়ে একটা সম্প্রদায় খুলতে পারবেন।'

হাসতে গিয়েও পারল না ধ্যানেশ। লোকটা বলে কি ? বাবাকে অস্বীকার করে সে সম্প্রদায় চালাবে ? ধ্যানেশবাবা ? দূর ! তা কি সম্ভব ? এত লোক তাকে চাইছে নাকি ? ব্যাপারটা ভাবতেই সাহস পাচ্ছিল না সে। লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি কে ?'

'আমি ?' লোকটা বিনয়ে গলে গেল যেন, 'ধ্যানেশকুমার ফ্যানক্লাবের সেক্রেটারি।'

চোখ বড় হয়ে গেল ধ্যানেশের, 'আমার ফ্যানদের আবার ক্লাব হয়েছে নাকি ?'

'হয়েছে। আপনি এত ওপর তলায় থাকেন যে খবর রাখেন না। এবার কোন দিক দিয়ে যাব ?

'যেদিক দিয়ে ইচ্ছে। নামগান ছড়িয়ে দেব সারা কলকাতায়।'

'স্যার, আপনি এককালে রাইটার্সে চাকরি করতেন। সেদিকেই বরং চলি।'

ঘাড় কাত করে চলন্ত জিপে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিল ধ্যানেশ। এককালে সে রাইটার্সে কেরানির চাকরি করত, কেউ পাত্তা দিত না। আজ একটু নামগান শুনিয়ে আসা যাক। শ্রীচৈতন্যও নবাবের বাড়িতে নামগান শোনাতে গিয়েছিলেন। মিছিল যাচ্ছে রাজভবনের দিকে। প্রবল চিৎকার উঠছে। হঠাৎ কেউ চিৎকার করে উঠল, 'পুলিশ।' ধ্যানেশ দেখল সামনে পুলিশের একটা বিশাল বাহিনী কর্ডন করে আছে। মিছিল সামান্য থমকে দাঁড়াতেই একজন অফিসার মাইকে ঘোষণা করলেন, 'এই এলাকায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা আছে। আপনারা একেই বেআইনি মিছিল বের করেছেন, পুলিশের অনুমতি নেননি। এর পরে আর এগোলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মিছিলের মানুষেরা দ্বিধায় পড়ল। ধ্যানেশ তাকিয়ে দেখল সেই উদ্যোক্তাটি কাছে-পিঠে নেই। কিন্তু এখন এই অবস্থায় পিছু হটা মানে তার নতুন তৈরি ইমেজ ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া। সে মাইকে চিৎকার করে বলল, 'এই পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি। বাবার লীলাভূমি। আমরা বাবার নামগান করছি। তাই কোন অশুভশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারে না। বলুন সবাই, জয় বাবা।'

হাজার কণ্ঠ চিৎকার করল, 'জয় বাবা।'

মিছিল এগোল। পুলিশ দ্বিতীয়বার ওয়ার্নিং দিল। এবং তারপর মুখোমুখি হতেই ওরা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। কিছু লোক ভয়ে পালাচ্ছিল। ধ্যানেশ চিৎকার করল মাইকে, 'বন্ধুগণ, ধর্মের ওপর পুলিশের অত্যাচার আপনারা মুখ বুজে সইবেন না। মাথার ওপর বাবা আছেন।' ততক্ষণ ইঁটবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। চওড়া রাস্তায় জিপে ধ্যানেশ একা। এমন কি তার ড্রাইভারও নেই। পুলিশ ও জনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ধ্যানেশ লক্ষ করল জনতার ভেতরে কিছু লোক শিক্ষিত ভঙ্গিতে পুলিশকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। একজন এ. সি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই পুলিশ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে একজন

ভক্ত মাটিতে পড়ে যেতেই জনতা ছত্রভঙ্গ হল। ধ্যানেশ দেখল যে লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়েছে সে আর নড়ছে না। গুলি লেগেছে তার মাথায়। দুহাতে মুখ ঢাকল সে। জলজ্যান্ত একটা মানুষ মরে গেল? ধ্যানেশ লক্ষ করেনি পুলিশের দল তার দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ রূঢ় গলায় একজন তাকে হুকুম করল জিপ থেকে নেমে আসতে। বলা হল, 'বেআইনি মিছিল করে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা এবং জনতাকে সেটা করতে উত্তেজিত করার জন্যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।' দুটো পুলিশ তার দুই হাত ধরে টানতে টানতে ভ্যানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ধ্যানেশের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। পেছনে একটা অফিসার যেভাবে রিভলভার উঁচিয়ে আছে, তাতে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে আসতেই পারে। একটার বদলে দুটো শরীর মাটিতে পড়লে কি এমন ক্ষতি হবে! কিন্তু ভ্যানের ঘেরা সিটে বসে সে দ্বিতীয় আনন্দের সন্ধান পেল। এই ঘটনা নিশ্চয়ই চাপা থাকবে না। খবরটা কাগজে ছাপা হবেই। জনপ্রিয় গায়ক ধ্যানেশকুমার গ্রেপ্তার। দেশের মানুষ তার হেনস্থার কথা জানবে। আশ্রম থেকে বিতাড়িত হওয়ায় তার ইমেজ যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এই সংবাদ সেটা দ্বিগুণ ফিরিয়ে আনবে। সে ধর্মানুষ্ঠান করতে গিয়ে, বাবার নামগান করতে গিয়ে পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে। নিজের অসাবধানতায় যে পথ থেকে সরে গিয়েছিল আবার সে-পথে ফিরে আসতে পারল। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়? নামগান মিছিল করে যাওয়ার জন্যে যে তাকে উৎসাহ দিয়েছিল তাকে সে অনেকক্ষণ দ্যাখেনি। গুলিছোঁড়া তো দূরের কথা, লাঠি চার্জ করার আগে থেকেই লোকটাকে দেখতে পায়নি ধ্যানেশ। কিন্তু সে যেই হোক, ধ্যানেশ তার কাছে কৃতজ্ঞ। ওর বুদ্ধি না পেলে আজ সে ভ্যানে বসে থাকার সুযোগ পেত না। বলা যায় না, সব থেমে গেলে ওরা তাকে ভ্যান থেকে নামিয়েও দিতে পারে। কথাটা মাথায় আসতেই ধ্যানেশ চিৎকার করে বলল, 'কি হচ্ছে কি? ভ্যানটা ছাড়তে বলুন না।'

আকাশবাণী পুলিশের গুলি চালনা এবং এক ভক্তের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করল। সেইসঙ্গে বিখ্যাত গায়ক ধ্যানেশকুমার গ্রেপ্তার হয়েছেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে নামগান করার অপরাধে, তা সবাই জানল। পরের দিন অবস্থাটা বদলে গেল। হাজার হাজার ভক্ত জড় হতে লাগল রাজভবনের সামান্য দূরে যেখানে গুলিতে তাঁদের গুরুভাই নিহত হয়েছেন। লালবাজারের স্পেশ্যাল ফোর্স কোনক্রমে সামাল দিচ্ছিল তাদের। আজ পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে কোন অবস্থায় গুলি না চালাতে। জনতা ক্ষিপ্ত। তারা দোষী পুলিশের বিচার চাইছিল। আইন ভাঙা অপরাধ হলে তার বিচার করবে আদালত। পুলিশ কেন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা করবে?

সেই সন্ধ্যায় সমস্ত দেশব্যাপী বাবার শিষ্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন বড় মহারাজের নেতৃত্বে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানোর। আগামীকাল একটি শোকমিছিল বের হবে। যদিও ধ্যানেশকুমার এখন আর আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু ধর্মাচরণ করতে গিয়ে একজন বাবার ভক্ত নিহত হয়েছেন যে সরকারের পুলিশের হাতে, শোক মিছিলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানানো হবে। ধ্যানেশকুমার এখন লালবাজারে বন্দী। তাকে মুক্ত করার কোনো প্রচেষ্টা দেখা

গেল না।

পরদিন সকালে বাবার বক্তব্য প্রতিটি খবরের কাগজ ছাপাল। বাবা বললেন, 'প্রশাসন যখন অশুভ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই দেশের ঘোর দুর্দিন আসে। যুগে যুগে শাসকরা ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে ভীত হয়ে। একশজন চাঁদ কাজী একজন নিমাইকেও শত চেষ্টা করেও কোনদিন বশ মানাতে পারে না। আমার এক ভক্তকে হত্যা করা হয়েছে কারণ সে নামগান করতে চেয়েছিল একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে। কতটা উন্মত্ত হলে সরকার ধর্মাচরণের ওপর বাধা সৃষ্টি করতে চায়, এই ঘটনা তার বড় প্রমাণ। এই অবস্থায় আমি আমার আশ্রমে চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

'আমি সরকারকে এই বলে সাবধান করতে চাই, এর পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। আগামীকাল সমস্ত দেশব্যাপী আমার ভক্তরা শোকমিছিল বের করবেন। সেই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্যে তারা আমাকে অনুরোধ করেছিল কিন্তু আবেগ বাঁধ ভাঙতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি যোগ দেব না বলে স্থির করেছি। এই সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ অনেক। আমি রাজনীতি বুঝি না। আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। সেই মানবতা বিপন্ন হলে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না।'

বাবা তাঁর বক্তব্যে কোথাও ধ্যানেশকুমারের নাম উল্লেখ করেননি।

আজ সকালে কানাই, সুদীপ এবং অনিলবাবু চলে গিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, নির্মল এবং লাবণ্য দায়িত্ব নেবে কলকাতার। কলকাতার সব কটি বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে দলের যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে এ মাসের মধ্যেই নির্মল এবং লাবণ্য কাজ শুরু করবে। কানাই চেয়েছিল নির্মল আরও কিছুদিন আত্মগোপন করে থাক। নির্মল সেটা আর চাইছিল না। এই সময় লাবণ্য একটা পরামর্শ দিল। গোর্খাল্যান্ডের দাবী নিয়ে দার্জিলিং জেলায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার জের ছড়িয়ে পড়েছে ডুয়ার্সের অর্ধেক জায়গায়। যদিও সেই আন্দোলন তেমন জোরদার হয়ে ওঠেনি এখনও কিন্তু বামফ্রন্টের কাজ করার জায়গা তাতে সংকুচিত হয়েছে। পরিস্থিতি এখন এমন যে তিস্তার ওপারের মানুষ প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করছেন। কলকাতার কাজ শুরু করার আগে নির্মলের উচিত ওই এলাকায় কিছুদিন থাকা। দলের কিছু কর্মী ওখানে তৈরি হয়ে আছেন। সেখানে সংগঠনের কাজ এই সুযোগে চালু করে দেওয়া সম্ভব। লাবণ্যের প্রস্তাবে সবাই একমত হয়েছিল। এমন কি নির্মলও। ঠিক হয়েছিল, কলকাতাকে এড়িয়ে আজকের দুপুরের বাস ধরে ওরা বর্ধমান যাবে। সেখান থেকে দার্জিলিং মেল ধরবে। দুপুরে আকাশবাণীর খবরটা শোনার পরই ওর বাবার মুখ মনে পড়ল। হঠাৎ এসব কি আরম্ভ হল? তার চলে আসার জন্যে নিশ্চয়ই বাবার সুনাম হানি হয়েছে। তিনু মহারাজের মৃত্যু এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ভক্ত নিহত হল। ঘটনাগুলো কোন কিছু নির্দেশ করছে বলে মনে করতে পারল না সে। অবশ্য ব্যাপারটা এত সাধারণ যে বাবার দুর্গে কোন আঘাত হানবে না।

বারোটা নাগাদ ওরা মহিলার কাছে বিদায় নিল। তার আগে অবশ্য একটা

ছোট ঘটনা ঘটেছিল। লাবণ্যকে নির্মল বলেছিল, 'আমরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের একজন হয়ে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছি। এক্ষেত্রে আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যার ফলে সাধারণ মানুষ আমাদের দূরের লোক বলে ভাবে। ওই পোশাকে আপনি নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দ কিন্তু একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলা আপনজন ভাববে না। চুল বড় করার আপাততো কোন উপায় নেই। কিন্তু আপনি শাড়ি পড়লে কি খুব অসুবিধে হবে?'

লাবণ্য অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তাকে শাড়ি পরতে কেউ কখনও জোর করেনি। বাড়ির আবহাওয়া এমন ছিল যে, সার্টপ্যান্টে কোন অসুবিধে হয়নি। আজকের পশ্চিমবাংলায় ষোল–সতের বছরের মেয়েদের দশজনের অন্তত তিনজন প্যান্ট পরে। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। প্যান্টে সে স্বস্তি পায়, চটপটে হওয়া যায়। একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও সে সামলে নিল। নির্মলের চোখেমুখে, তাকানোর ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক মায়াময় ব্যক্তিত্ব আছে যার সামনে দাঁড়িয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে করে না। কানাই-এর কাছে সে নির্মলের ইতিহাস শুনেছে। গুরুবাদে তার কোনদিনই বিশ্বাস নেই। বাবাকে সে কখনও দ্যাখেনি, আগ্রহও নেই। কিন্তু গতরাতে আলোচনার সময় তো বটেই, আজ যতবার নির্মল কথা বলেছে মনে হয়েছে এক ধরনের জ্যোতি ওকে ঘিরে রেখেছে। সবকথা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত নির্মল বলছে এমন নয়। মাঝে-মাঝেই তাকে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মনে হচ্ছে। প্রায় শিশুর সারল্য নিয়ে সে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তত্ত্বগত ব্যাপারে কথা বলার সময়ে খুব দৃঢ় দেখাচ্ছে ওকে। মনে হয় যেন নেতৃত্ব দিতেই ও জন্মগ্রহণ করেছে। চট করে পাঁচটা ছেলের থেকে ওকে আলাদা মনে হয়। লাবণ্য বলল, 'মুশকিল হল নির্মলবাবু, আমার সঙ্গে শাড়ি নেই। প্যান্ট সার্ট নিয়েই বেরিয়েছি।'

'কাজটা ঠিক করেননি। কোলাঘাটে পৌঁছে কোন দোকান থেকে এক প্রস্থ কিনে নিন।'

নির্মল কথা শেষ করতে যদি লাবণ্যের ঠোঁটে চিলতে হাসি ফোটে তাই মহিলা হেসে উঠলেন সশব্দে। খুব বোকার মত কিছু বলে ফেলেছে কিনা ঠাওর করতে পারল না নির্মল। সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। মহিলা হাসি থামিয়ে বললেন, 'উফ্! তুমি বুঝি মেয়েদের সঙ্গে কোনদিন থাকনি?'

'না। আমার মা বাল্যকালেই মারা গিয়েছেন।'

'শোন। শুধু শাড়ি কিনলেই হবে না, মাপমত মেলানো জামা চাই, পেটিকোট দরকার। কোলাঘাটের দোকানে ও এই বেশে সেসব কিনতে গেলেই দোকানদার সন্দেহ করবে কিছু গোলমাল আছে। তাছাড়া রেডিমেড জামায় তো সবার ফিটিংস ঠিক হয় না। যে দেখবে সেই বুঝবে।' খুব সরলভাবে কথাগুলো বলেছিলেন মহিলা। কিন্তু কথাগুলো নির্মল নিয়েছিল বেশ গুরুত্বের সঙ্গে। শুধু একটা সুন্দর শাড়ি মানেই পরিপূর্ণতা নয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে অন্যান্য উপকরণ দরকার। অর্থাৎ সব কিছু একত্রিত না হলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয় না। আলাদা আলাদা করে কারো তেমন মূল্য নেই তা যত বড়ই হোক না কেন?

নির্মল বলল, 'আপনি কি বাড়িতে শাড়ি পরেন না?'

লাবণ্য অকপটে স্বীকার করল, 'না। খুব মুশকিলে ফেলে দিলাম না? আচ্ছা,

আমাকে মেয়ে বলে ট্রিট করার দরকার কি ? ট্রিট মি অ্যাজ এ পার্শন।'

বেরিয়ে আসার মুখে মহিলা বললেন, 'তোমার কথা অনেকদিন মনে থাকবে নির্মল। যদি কখনও এদিকে আসো তখন দেখা করো।'

নিচে নেমে হাঁটতে হাঁটতে নির্মল পেছন ফিরে তাকাল। পেছনের জানলায় সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে অপলক তাকিয়ে আছে। হঠাৎ নির্মলের খেয়াল হল গতরাত থেকেই ওকে সে বেশি দেখেনি। এখন মুখটাকে খুব করুণ দেখাচ্ছে। লাবণ্য মেয়েটিকে লক্ষ করেছিল। বলল, 'মেয়েটি কথা বলতে পারে না অথচ ভীষণ এক্সপ্রেসিভ।'

চমকে উঠল নির্মল। ছোট ছোট ঘটনাগুলো মনে পড়ল ওর। এমন কি বমি করার পর যেভাবে মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল তাও। ভেবেছিল ভীষণ লাজুক বলেই কথা বলতে চায়নি মেয়েটি। কখনও কখনও কথার কোন প্রয়োজন হয় না। বোঝাতে যে পারে তার কাছে কথা হার মানে। সে আবার পেছন ফিরে তাকাল। গাছের আড়ালে জানলা ঢাকা পড়ে গেছে।

মৃতদেহ নিয়ে শোকমিছিল বের করতে দিল না পুলিশ। কিন্তু সমস্ত শহর অবাক হয়ে দেখল দীর্ঘ তিনমাইল ব্যাপী একটি শোকমিছিল শহর পরিভ্রমণ করল। কোন পোস্টার নেই, লরি-বাসে গ্রাম থেকে পয়সা দিয়ে লোক না এনেও এমন মিছিল করা সম্ভব যা যে কোন রাজনৈতিকদলের ক্রিয়াকাণ্ডকেও হার মানায়। শোকমিছিল যেখানে সবশেষে জমায়েত হয়েছিল সেখানে বাবার পক্ষ থেকে বড় মহারাজ মৃত ভক্তদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করলেন। তিনি লক্ষ ভক্তদের বললেন, 'ধর্মাচরণের স্বাধীনতা হরণ করার কোন অধিকার এই সরকারের নেই। ধ্যানেশকুমারের সঙ্গে আশ্রমের সম্পর্ক সাময়িকভাবে ছিন্ন হলেও তিনি বাবার পবিত্র নাম প্রচার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমাদের গুরুভাইরা সরল মনে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নাম যখন হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় তখন কে শিষ্য কে নয়, তা বিচার করে দেখা বাতুলতা। ধ্যানেশ অন্যায় করেছিল কিনা তা বিচার করার জন্য আদালত রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন খুনের আসামীকে কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু স্বার্থসর্বস্ব সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার পাঁচকোটি গুরুভাইকে কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি। আপনারা পূজনীয় বাবার পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করুন। ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা ভক্তের প্রধান কর্তব্য। সেই আদেশ না আসা পর্যন্ত সবাই স্থির থাকুন।'

এই শোকসভার বিবরণ পাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে মেজ মহারাজ টেলেক্স মারফত আশ্রমে বসে খবর পেলেন রাজ্যমন্ত্রী বাবার দর্শনপ্রার্থী। তিনি রাত দশটায় বাবার আশ্রমে আসতে চান। বাবা কি অনুমতি দেবেন ?

পরিস্থিতি এখন এমন যে,মেজ মহারাজ জানেন,বাবা রাজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। রাত দশটার সময়ে তিনি বহিরাগতদের সঙ্গে দেখা করেনও না। তাছাড়া গুলিচালানোর ঘটনা আকাশবাণী প্রচার করার কয়েক ঘণ্টা পরেই দিল্লী থেকে খবর এসেছে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তাঁর কর্মসূচী এগিয়ে এনে আগামীকাল সকালে

কলকাতায় পৌঁছেই এখানে উপস্থিত হবেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর আসার খবর স্থানীয় সরকারি কর্তারা জানেন। আজ জেলা শাসক এবং এস পি তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আশ্রমের ভেতরে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের। পুলিশ যদি আশ্রমে ঢুকতে চায় তাহলে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না। এস. পি. খবরটা ওপরতলায় জানাবেন বলে চলে গিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যমন্ত্রীর এই আচমকা দেখা করতে চাওয়াটা বিস্ময়ের। তিনি সময়সুবিধে মত একবার আসবেন বলে কিছু দিন আগে জানিয়েছিলেন। মেজ মহারাজ আনন্দভবনে ছুটলেন গাড়ি নিয়ে।

বাবা গতকাল থেকে জলস্পর্শ করছেন না। দুই ভক্তর মৃত্যুসংবাদের পর তিনি জল এবং অন্ন গ্রহণ করবেন না আটচল্লিশ ঘণ্টা, বলে স্থির করেছেন। এই খবরও সংবাদপত্র মারফত প্রচারিত হয়েছে। আজ ও গতকাল সাংবাদিকরা তাঁর দর্শন পাওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করে ব্যর্থ হয়েছে। একজন শিষ্যচিকিৎসক সবসময় আনন্দভবনে তৈরি আছেন বাবার শরীরের ওপর লক্ষ রাখতে। আশ্রমের সর্বত্র একটা কি হয় কি হয় ভাব।

অসময়ে আসার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে অপেক্ষা করছিলেন মেজ মহারাজ। বড় মহারাজ এখন কলকাতায়। অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে আলোচনার পর বড় মহারাজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছেন তিনি। বড় মহারাজ কি আশঙ্কা করছেন বাবা তাঁকে প্রধান উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যাবেন না! সেদিন আলোচনার সময় বাবা যদিও স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা ব্যক্ত করেননি তবু ওইরকম একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। বাবা বারংবার ছোটে মহারাজের নাম বলছিলেন। এটা মেজ মহারাজেরও পছন্দ হয়নি। অবশ্য তিনি ছোটে সম্পর্কে তাঁর কোন ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেননি। আবার বড় মহারাজকে কলকাতার জনসভায় বক্তৃতা দিতে পাঠিয়ে বাবা তাঁর মনে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের জায়গা কোথায়? মেজ সন্তান হয়ে জন্মাবার জন্যে তিনি তো দায়ী নন। কিন্তু কেউ যদি প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে বাবার আদর্শ অনুসরণ করে থাকে সে তো তিনিই।

অনুমতি পাওয়া মাত্র মেজ মহারাজ কক্ষ পেরিয়ে বাবার সামনে উপস্থিত হয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম জানালেন। বাবা শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে। চিকিৎসক তাঁর প্রেসার মাপছিলেন। কাজটি শেষ হলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দেখলে বৈদ্য?'

চিকিৎসক অত্যন্ত বিনীত স্বরে বললেন, 'ধৃষ্টতা মাফ করবেন, আপনার প্রেসার খুব নেমে গেছে। এখন আহার এবং বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন।'

বাবা হাসলেন, 'আগামীকাল সকালের আগে তো ওই চিন্তা করা বাতুলতা। এবার এসো তুমি।' চিকিৎসক চলে গেলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'জনসভায় কোন গোলামাল হয়েছে?' মেজ মহারাজ বললেন, 'না। খুবই শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে খবর পেলাম।'

'হুঁ! ছোটের কোন খবর পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সুধাময় এবং ইউনিস যে এত ব্যর্থ হবে আমি ভাবিনি। ওদের তুমি

শেষবারের মত নির্দেশ দাও। আগামী পূর্ণিমার মধ্যে ছোটের খবর চাই আমি। এখানে কি কারণে আসার প্রয়োজন হল এই সময়ে?'

'বাবা, এইমাত্র খবর পেলাম রাজ্যমন্ত্রী আজ রাত্রে আপনার দর্শন চান।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো অসুস্থ।'

'সেইমত জানিয়ে দেব।'

'দাও। না, না। অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হলে সনাতননাথেরা ভাববে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আসতে দাও ওকে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলবে।' বাবা নিঃশ্বাস ফেললেন,'কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে অভ্যর্থনার সব আয়োজন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে রাজ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আপনার অনুমতির কথা জানিয়ে দিতে পারি। সময় বেশি নেই।' মেজ মহারাজ সোজা হয়ে বসলেন।

'যাও। কিন্তু ছোটের কথা মনে রেখ। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

রাজ্যমন্ত্রী এলেন সরকারী হেলিকপ্টারে, ঠিক দশটা বাজতে দশ মিনিট আগে। তার সঙ্গে কোন সরকারি কর্মচারি ছিল না। মন্ত্রীসভায় তাঁর একান্ত অনুগত এক তরুণ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিচে নেমে এলেন। তাঁর এই আগমনের কথা জেলা শাসককেও জানানো হয়নি। কোন সিকিউরিটির ব্যবস্থাও হয়নি। মেজ মহারাজ এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানাতে রাজ্যমন্ত্রী স্মিতমুখে হাত জোড় করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কেমন আছেন?'

মেজ মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'প্রেসার খুব কমে গেছে। চিকিৎসক দেখছেন।'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'অসময়ে এলাম। কোন অসুবিধে হবে না তো?'

মেজ মহারাজ হাসলেন, 'আপনার কথা শুনে উনি আপত্তি করেননি।'

'আগামীকাল কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তো এখানে আসছেন।'

'হ্যাঁ। তাঁকে বাবা শৈশব থেকেই চেনেন।'

গাড়িতে ওঠার আগে রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমি আসার এই খবরটা প্রচার হয়নি তো?'

'আজ্ঞে না। আশ্রমে রাত নটার পর শিষ্যদের ঘরেই থাকতে হয়। তাছাড়া সবাই এখন শোকবিহ্বল। তবে সাংবাদিকদের কাছে খবরটা পৌঁছয়নি।'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'ওইটেই গোলমাল। আমি চাই না এ নিয়ে প্রচার। এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত সফর।' গাড়িতে যেতে যেতে মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে এত এলাকা জুড়ে আশ্রম করেছেন আপনারা, আসল উদ্দেশ্য কি?'

'ধর্মাচরণ।' মেজ মহারাজ জবাব দিলেন এক কথায়।

আনন্দভবনের পেছনের দরজায় গাড়ি থামল। সাংবাদিক বা কোন উৎসুক দৃষ্টি এড়াতেই এই ব্যবস্থা। গাড়ি থেকে নেমে মেজ মহারাজ একজন সেবককে বললেন, 'বিশেষ অতিথি এসেছেন। খবরটা দাও।' মিনিট খানেকের মধ্যে সেবক ঘুরে এল, 'বাবা এখন কিছুক্ষণ মৌনী আছেন। আধঘণ্টা পরে কথা

বলবেন।'

রাজ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কথা বলছেন না কেন ?'

মেজ মহারাজ বললেন, 'গুলিতে নিহত ভক্তদের আত্মার শান্তির জন্যে।'

রাজ্যমন্ত্রী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেজ মহারাজ বললেন, 'আপনি আমাদের অতিথিশালায় চলুন, সেখানেই বিশ্রাম করবেন।'

রাজ্যমন্ত্রী মাথা নাড়লেন, 'না, না। এই বেশ আছি। এই নির্জন পরিবেশ খুব ভাল লাগছে।' উপাসনাগৃহ থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছিল। মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি কোন মন্দির ?' মেজ মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'না। বাবা মনে করেন মানুষের মনই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় মন্দির। ওটি এই আশ্রমের উপাসনাগৃহ। আসুন না।' মেজ মহারাজ সম্মতির জন্যে অপেক্ষা না করে এগিয়ে যেতেই রাজ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গীসহ অনুসরণ করলেন। বাবা এইটুকু পথ গাড়িতে যান। কিন্তু সেবকদের পাহারায় মেজ মহারাজ রাজ্যমন্ত্রীকে পথটুকু হাঁটিয়েই আনলেন। উপাসনাগৃহের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে মেজ মহারাজ নতজানু হয়ে বাবার নাম জপ করলেন। তারপর উঠে দেখলেন রাজ্যমন্ত্রী তেমনই ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'সত্যি, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে বেশ শান্তি হয়। ধ্যানের পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য বলে ফেললেন, 'ধ্যান ?'

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন না। তিনি তখন ধীরে ধীরে চারধার ঘুরে দেখতে ব্যস্ত। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে সেবক ছুটে এসে জানাল, বাবা স্মরণ করেছেন। দ্রুত পথটুকু পার হবার পর মেজ মহারাজ লক্ষ করলেন রাজ্যমন্ত্রী সিঁড়িগুলো প্রায় যুবকের মত ডিঙিয়ে এলেন। জুতো খুলে দ্বিতীয় কক্ষে ওঁরা প্রবেশ করতেই মেজ মহারাজ নতজানু হলেন। রাজ্যমন্ত্রী তাই দেখে নতজানু হতে গিয়েও সামলে নিয়ে দুটো হাত বুকের ওপর যুক্ত করে রাখলেন। বাবা বসেছিলেন ইজিচেয়ারে, সেই একই ভঙ্গিতে। এবার সামান্য মাথা নেড়ে ইঙ্গিতেই বসতে বললেন। মেজ মহারাজ খানিকটা দূরত্ব রেখে মেঝের ওপর বসছেন দেখে রাজ্যমন্ত্রী সেইখানেই বসে পড়লেন। মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য বসলেন রাজ্যমন্ত্রীর পেছনে।

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আপনার শরীরের কথা আমি শুনেছি। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না।'

'আমি যদি বিরক্ত হতাম তাহলে কি দেখা হত ?' বাবা মৃদু হাসলেন, 'আর অসময় আবার কি ? যত রাত হবে তত তোমার সুবিধে, মানুষজনের সামনে পড়তে হবে না। তারা তোমাকে দেখার জন্যে হুড়োহুড়ি করবে না। এটাই তো তোমার ঠিক সময়।'

রাজ্যমন্ত্রী রুমাল বের করেও আবার সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে, মানে, একটু নিভৃতে, বুঝতেই পারছেন।'

'নিভৃতে ? এর চেয়ে নিভৃত পেতে গেলে মেজকে আর তোমার সঙ্গীকে চলে যেতে বলতে হয়। মেজর ওপর আমার বিশ্বাস আছে, তোমার সঙ্গীর ওপর কি তোমার আস্থা নেই ? সেক্ষেত্রে অবশ্য—।' বাবা আবার হাসলেন। রাজ্যমন্ত্রী খুব অস্বস্তিতে পড়লেন। তাঁর সঙ্গী উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু রাজ্যমন্ত্রী ইঙ্গিতে তাকে

বসতে আদেশ করলেন। করে মেজ মহারাজের দিকে তাকালেন একবার। ইতিমধ্যে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ বল ? তোমার তো আরও পরে আসার কথা ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি জানেন কিনা জানি না, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমরাই একমাত্র দল যারা জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করেছি। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। ভারতবর্ষের সংবিধানানুযায়ী রাজ্যের হাতে বেশি ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রে যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল সরকার রয়েছে তাই নানা কাজে আমাদের বাধা পড়ছে। তবু আমরাই একমাত্র দল যারা মানুষের উপকারে আসতে পেরেছি। এই অবস্থায় জনসাধারণ যদি কোন ব্যাপারে আমাদের ভুল বোঝে, তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নেই বাধা পড়বে।'

বাবা মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। যারা কাজ করতে চায় তাদের সেটা করতে দেওয়া উচিত।' রাজ্যমন্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল, 'পুলিশের গুলি চালনার ব্যাপারে জনসাধারণের কিছু অংশ আমাদের ভুল বুঝেছে। আমি আপনার স্টেটমেন্ট কাগজে পড়েছি। ওই শোকমিছিলে আপনি যাননি বলে কৃতজ্ঞবোধ করছি।'

বাবা বললেন, 'দ্যাখো, এতক্ষণ তুমি যা বললে তাতে যদি রাজনীতি থাকে তাহলে সেটা আমার বোধগম্য হয়নি। রাজনীতি আমি বুঝি না। কিন্তু তোমার ভাই যদি পুলিশের গুলিতে মারা যায় তাহলে তুমি দুঃখিত হবেই, এটা আমি বুঝতে পারি।'

'ঠিকই। খুব অন্যায় করেছে পুলিশ। আসলে পুলিশবাহিনীর একাংশ আমাদের সমর্থক নয়। তারাই এই ধরনের বিপাকে আমাদের ফেলে দেয়।'

'তা তুমি কেন ছুটে এলে বল ?'

'আজ শোকসভায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আপনার পরবর্তী আদেশের জন্যে ভক্তরা যেন অপেক্ষা করেন। এ ব্যাপারে আমি আপনার শরণাপন্ন।'

'আমার ? সেকি ! কেন ? তুমি তো আমার শিষ্য নও।'

'ঠিকই। কিন্তু জনসাধারণ যাঁকে শ্রদ্ধা করে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আপত্তি নেই। একসময় আমরা সুভাষ বোসকে গ্রহণ করতে পারিনি কিন্তু জনসাধারণ তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে দেখে এখন গ্রহণ করেছি।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না বাপু। তুমি বলছ জনসাধারণ তোমাদের বিশ্বাস করে, কাছের লোক বলে মনে করে। তাহলে আর তোমাদের ভয় কি ?'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'জনসাধারণের মন হল জলের মতন। যে পাত্রে থাকবে সেই পাত্রের আদল নেবে। ভুল বুঝতে ওদের জুড়ি নেই।'

বাবা হাসলেন, 'তাহলে তোমরা কাছের লোক হলে কি করে ? এখন কি করতে চাও ?'

রাজ্যমন্ত্রীর মুখে ছায়া নেমেছিল। সেটি সরিয়ে তিনি বললেন, 'যিনি মারা গিয়েছেন তাঁর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেব। প্রশাসনিক তদন্তের ব্যবস্থা করব যাতে দোষী পুলিশরা শাস্তি পায়।'

বাবা হাসলেন, 'এসব করে কি তুমি নিহত মানুষটির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে

পারবে ?'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'না। আমার সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আপনি যদি আদেশ করেন কোন কাজ সম্পন্ন করতে, আমি বিনা দ্বিধায় সেটা করে দেব।'

বাবা বললেন, 'কারণ ?'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আপনি বিচক্ষণ। নইলে এত মানুষ আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করত না। আমরা রাজনৈতিক দলগুলো যাই প্রচার করি এদেশের মানুষের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। আপনিও জানেন মুসলমানরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে অটল। হিন্দুরা একটু সহনশীল। কিন্তু আপনার শিষ্যরা প্রমাণ করছেন যে, আদেশ পেলে তাঁরা উগ্র হতে পারেন। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'বেশ। আমি তোমার ওপর আর একবার আস্থা রাখছি। এবার তুমি যাও, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে।' বাবা ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

রাজ্যমন্ত্রী হাত জোর করলেন, 'আপনি, আপনি কিছু বলবেন না ?'

বাবা গম্ভীর হলেন, 'অনেক কথাই তো বললাম।'

রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আপনি যদি আমাদের হয়ে কাগজে একটা বিবৃতি দেন— '।

বাবা বললেন, 'তোমাদের কাউকে তো জানি না বাপু। তুমি এসেছ, তোমার হয়ে বলব, শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া মানবধর্মের অঙ্গ।'

রাজ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, 'নির্বাচন আর কয়েকমাস বাদে। পাঁচ কোটি ভোটের অভাব আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

'সেকি ! এই পাঁচ কোটি ভোট যারা দেবে তাদের তোমরা বোঝাওনি ?'

'চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার আদর্শ ওঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'

'সেটা ভাল না মন্দ ?'

'মন্দ হলে ওঁরা নিশ্চয় ভুল বুঝতে পারতেন।'

'বেশ। এই ঘটনার জন্যে কোন ভোট হারাবে না তুমি।'

রাজ্যমন্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। দাঁড়িয়েই তিনি প্রণাম সারলেন। তারপর বললেন, 'বিদায় নেওয়ার আগে আর একটা কথা বলতে পারি ?'

'স্বচ্ছন্দে। তবে বেশি সময় নিও না।'

'আগামীকাল কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আসবেন দর্শনের জন্যে।'

কিন্তু রাজ্যমন্ত্রীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হাত তুলে থামালেন বাবা, 'অন্যের ঘরে উঁকি মারা অভ্যাস অত্যন্ত অশোভন। নিজেরটা সামলে থাকলেই তো হল। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আর তুমি আমার কাছে সন্তানতুল্য। আগে থেকে কান ভারী হলে আমার খুব জ্বালা হয় শরীরে। এসো।'

হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত রাজ্যমন্ত্রী কোন কথা বলেননি। মেজ মহারাজ সঙ্গে ছিলেন, ওঠার আগে রাজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আপনাদের যদি সরকারি লেভেলে কোন প্রয়োজন থাকে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আর এই বিবৃতি আমি ফিরে গিয়েই কাগজে পাঠাবো যাতে আগামীকাল বের হয়। বাবা কাগজ পড়েন তো ?

মেজ মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। বাবা সব খবরই রাখেন।'

দার্জিলিং মেইল নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন পৌঁছলো বেশ লেটে। স্টেশন থেকে বেরোবার আগে খবরের কাগজ কিনল নির্মল। প্রথম পাতার মাঝামাঝি জায়গায় তার চোখ পড়ল। রাজ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন,'গুলি চালানোর ব্যাপারে প্রশাসনিক তদন্ত হবে। মৃত ভক্তের আত্মীয়দের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দোষী পুলিশরা শাস্তি এড়াতে পারবে না।' ঠিক তার পাশেই বাবার বিবৃতি 'এই দুঃখজনক ঘটনা মেনে নেওয়া সত্যি অসম্ভব। ভক্তদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু রাজ্যমন্ত্রীর ওপর এখনও আস্থা রাখছি আমি। প্রশাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি থাকলেও তিনি পরিস্থিতি সামলে উঠবেন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে ভক্তশিষ্যরা যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন।'

নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে ডুয়ার্সে যাওয়ার জন্যে যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, তার একটায় বসে নির্মল খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়ল। ধ্যানেশকুমারের সঙ্গে তার সামান্যই আলাপ ছিল। কিন্তু ভারতবিখ্যাত ওই গায়ককে আনন্দভবনে বাবার ঘরের সামনে পড়ে থাকতে সে দেখেছে অনেক বার। তিনি আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। মন্ত্রী কিংবা সচিবেরা মাঝেমাঝেই আশ্রমে যেতেন। আজ ওই বিবৃতি দুটো পড়ে মনে হল দুজনের কথার মধ্যে কোথাও একটা গোপন সমঝোতা আছে। কিন্তু বাবা কখনই রাজনীতির ধারেকাছে যাবেন না। কানাই যা বলেছিল, বাবা রাজনীতিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের পরিচালনা করবেন। শিষ্যশক্তিতে ক্ষমতাবান গুরুরা এদেশে তাই করে থাকেন। নির্মলের মনে হল আশ্রমের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ সূত্র থাকলে ভাল হত। অথচ ওখানে এমন কেউ নেই, যে বাবাকে লুকিয়ে তাকে খবরাখবর দিতে পারবে। পাঁচ কোটি ধর্মান্ধ মানুষ বাবার প্রতি উৎসর্গ করেছে নিজেদের। এই পাঁচ কোটি মানুষের আনুগত্য পেলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দেশের সমগ্রিক জীবনযাত্রা পাল্টে দেওয়ার কাজ সহজ হত। ধর্মের আকর্ষণশক্তি রাজনীতির চেয়ে কয়েক'শ গুণ বেশি। চোখ বন্ধ করে বসেছিল নির্মল।

লাবণ্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে নির্মলকে চুপচাপ লক্ষ করছিল। সেই কোলাঘাট থেকেই ও বুঝতে পেরেছিল এভাবে যাতায়াতের অভ্যাস নির্মলের নেই। খুব বড়লোকের ছেলেরাও যেসব ব্যাপারে অভ্যস্ত থাকে বলে অসুবিধায় পড়ে নির্মল অবশ্যই সেই গোত্রের নয়। কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়েছে বাস্তবজীবনের নিয়মকানুনগুলোর সঙ্গে ওর এতকাল কোন সম্পর্কই ছিলনা। কানাই-এর মুখে লাবণ্য কিছুটা শুনেছে। পশ্চিমবাংলায় বাস করে বাবার নাম শোনেনি এমন বাঙালি পাওয়া যাবে না। সেই বাবার কনিষ্ঠ সন্তান মানে প্রায় ইংলন্ডের রাজবংশধর। পরিচয় দিয়ে কোথাও দাঁড়ালে মাটিতে কয়েক'শ মানুষ শুয়ে একেই প্রণাম করবে। এরকম পরিবারের ছেলেকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু ওকে দেখার পর লাবণ্যর ভাবনা পাল্টেছে। আশ্রমের গন্ধ একেবারে ঝেড়ে ফেলেছে নির্মল। শুধু অনভ্যাসের দাগগুলো মাঝে মাঝে স্পষ্ট হচ্ছে। গতরাত্রে ট্রেনে জায়গা না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ও। অথচ পরে উঠেও অনেকে জায়গা করে নিচ্ছিল। শেষপর্যন্ত লাবণ্য উদ্যোগী হয়ে পাশে

জায়গা করে দেয়। নির্মল বলেছিল, 'জোর করে একজনকে সরে বসতে বলাটা ঠিক নয় বলে মনে হচ্ছিল।' লাবণ্য নিজেও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছে। কিন্তু এরকম উত্তর পেয়ে আর কথা বলতে পারেনি। হঠাৎ নির্মল বলেছিল, 'জানেন, মনে হচ্ছে আমি এতকাল জেলখানায় বন্দী ছিলাম। অবশ্য জেলখানার পরিবেশ কিরকম সেটা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু এখন নিজেকে খুব হালকা লাগছে।'

যে-লোকটা শুধু পাঁউরুটি, দুধ, বিস্কুট খেয়ে রয়েছে, কোলাঘাট থেকে বের হবার পর তার মুখে এইরকম কথা শুনে একটু গোলমাল লাগে বইকি। এখন ডুয়ার্সমুখী বাসে বসে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছেন বলুন তো তখন থেকে?'

নির্মল মুখ ফেরাল, 'খবরটা পড়ুন।' কাগজ এগিয়ে দিল সে লাবণ্যর দিকে।

লাবণ্য খবরগুলো পড়ল, 'খুব সাধারণ ঘটনা। আপনার বাবাকে রাজ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন, রাজ্যমন্ত্রীকে হয়তো কোন কাজে লাগাবেন আপনার বাবা। নিচে দেখুন, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আজ আশ্রমে যাচ্ছেন বাবার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে। এটাও ওই একই ব্যাপার। কিন্তু আপনার হারিয়ে যাওয়ার খবর কাগজে দিচ্ছে না কেন? আমি পর পর কয়েকদিনের কাগজে এসম্পর্কে কোন খবর পাইনি।'

'খবরটা বোধহয় প্রচারিত হয়নি। বাবা চাননি পাঁচজন জানুক।'

'আপনার বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।'

'বুদ্ধিমান না হলে এতবড় ধর্মরাজ্য চালানো যায় না।'

একপাশে তিস্তা অন্য পাশে পাহাড় রেখে বাস চলছিল। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে বাতাসের গায়ে। নির্মল মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেবক ব্রিজের ওপরে এসে ওরা প্রচুর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর লোক দেখতে পেল। প্রত্যেকে সশস্ত্র হয়ে পাহারা দিচ্ছে। পাহারাদার পুলিশ পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ে ওঠার পর থেকেই। কিন্তু সেবক পেরিয়ে বাগরাকোট ওদলাবাড়িতেও তাদের দেখা গেল। একজন সহযাত্রী বললেন, 'গোর্খাল্যান্ডের দাবী তো এখন দার্জিলিং ছাড়িয়ে এই অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ছে। প্রায়ই রেললাইনে বোমা পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত ফরেস্ট বাংলো পুড়িয়ে ফেলছে।'

নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'সরকারি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে ওদের কি লাভ?'

'প্যানিক তৈরি করা। এই যে আমাদের বাস যাচ্ছে এ পথে, বলা যায় না বন্দুক দেখিয়ে বাস থামিয়ে আমাদের নামিয়ে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দিতেও পারে।' ভদ্রলোক এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী। বললেন, 'এই অঞ্চলের নেপালিরা শান্তিপ্রিয় ছিল। দার্জিলিং থেকে তাড়া খেয়ে জি এন এল এফ সাপোর্টাররা এই এলাকায় নেমে এসেছে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে দিনের বেলায়। ওরা কিন্তু বাঙালিদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসছে না। কেউ মারা গেলে দেখা যাচ্ছে লোকটা নেপালি। তবু আমরা মশাই সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছি।'

নির্মল চুপচাপ শুনছিল। মাঝে মাঝে বাস এক একটা ছোটখাটো জনপদে ঢুকছিল। সমতলের এই অঞ্চলেও বাঙালির সংখ্যা খুব বেশি নয়। ভদ্রলোককে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঙালির পার্সেন্টেজ এদিকে কেমন?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'খুব কম। অন্তত এই বেল্টে। বেশিরভাগই মদেশিয়া, লেপচা, নেপালি আর রাজবংশী। বাঙালি ধরুন টোয়েন্টি পার্সেন্ট। চাকরি, দোকান, নয় আমার মত ব্যবসা।'

মালবাজার নামে একটা জায়গায় নেমে গেলেন ভদ্রলোক। নির্মলের মনে হল এখানে প্রচুর বাঙালি আছে। হয়তো একটি থেকে আর একটি জনপদে পৌঁছবার সময় যখন পনের-বিশ কিলোমিটার পথ পার হতে হয় তখন দুপাশে শূন্য মাঠ, জঙ্গল অথবা চায়ের বাগান পড়বে সেখানে কোন বাঙালি থাকে না। এই অঞ্চল যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই, তাই দু'শ বিরানব্বইটি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে এই অঞ্চলেও কি বামপন্থী দলগুলো সক্রিয় নেই? দক্ষিণবঙ্গে যেমন তাদের সদম্ভ উপস্থিতি টের পাওয়া যায় এখানে তার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তাহলে তাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে এই এলাকা অনেক বেশি অনুকূল। এইসময় লাবণ্য বলল, 'উত্তরবাংলায় এলেই চোখের বড় আরাম হয়। এত সবুজ চারপাশে, আর সবুজটাকে দেখুন, ভীষণ টানে।'

বানারহাট নামে একটা জায়গায় লাবণ্য ওকে নামতে বলল। স্ট্যান্ডে আসবার আগে রেললাইন পেরিয়েছিল বাস, নির্মলের চোখে ন্যারো গেজ লাইনের ছোট্ট স্টেশন পড়েছিল। দুপাশে কাঠের প্রায় জীর্ণ দোকান, বাড়িঘর। বাস থেকে নেমে লাবণ্য যেন একটু ধন্দে পড়ল। অনিলবাবু তাকে যে সহকর্মীর ঠিকানা দিয়েছিলেন তিনি একটি ফটোর দোকানের মালিক। বানারহাটের চৌমাথায় তার দোকান। অথচ এখানে সেরকম কোন দোকান তার নজরে পড়ছে না। নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোকের নাম কি?'

'অনিলবাবু বলেছিলেন কানা মিত্তির বললেই সবাই চিনবে।'

'কাউকে তাই জিজ্ঞাসা করুন।'

লাবণ্য মাথা নাড়ল, 'সবাই কিভাবে দেখছে আমাদের লক্ষ করেছেন? বুঝে নিয়েছে নতুন এসেছি। ঔৎসুক্য বেড়ে যাওয়া মানে আমরা ওদের কাছে ফরেনার হয়ে গেছি। তার চেয়ে চলুন, আর এক জায়গায় যাই। একটা দিন ওখানে থেকে তারপর কানা মিত্তিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।' পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে সে চারপাশে তাকাল। একদিকে লেখা আছে গয়েরকাটা, অন্যদিকে পশালবাড়ি। চৌমাথাটা খুবই শান্ত। কিছু দোকানপাট রয়েছে, বাস এলে দাঁড়ায়। স্থানীয় কিছু লোক ওদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। নির্মলের মনে হল এরা লাবণ্যর সাজপোশাক দেখছে। ওরা বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে খানিকটা এগোতেই একটা থানা দেখতে পেল। পুলিশের জিপ বেরিয়ে আসছিল থানা থেকে। লাবণ্য হাত তুলতেই সেটা দাঁড়িয়ে গেল। লাবণ্য এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, রিয়াবাড়ি টি এস্টেটে কি ভাবে যাব বলতে পারেন?'

অফিসার পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কাছে যাবেন?'

'সানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যানেজার।'

মোড় থেকে বাস পাবেন চামুর্চি। আচ্ছা, এক কাজ করুন, পেছনে উঠে বসুন। আমি ওইদিকেই যাচ্ছি। মেইন রোডে নামিয়ে দেব। বাকিটা আপনাদের

হেঁটে যেতে হবে।' অফিসার কথা শেষ করতেই ব্যাগ নিয়ে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছিল লাবণ্য। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি সামনে বসতে পারেন।'

অতএব নির্মল পেছনে বসল। তার সামনে পাশে বন্দুকধারী সেপাইরা রয়েছে। মনে হল এরা যেন ঠিক স্বাভাবিক নেই। লাবণ্য বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'দ্যাটস্ নাথিং। আমরা তো ওদিকেই যাচ্ছিলাম। মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। হাতে সময় থাকলে আপনাদের ওর বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসতাম। কিন্তু আমাদের যেতে হচ্ছে একটা রেইডে। এখন তো এইটেই লেগে আছে।' অফিসার বললেন।

'রেইড মানে, অ্যান্টিশোস্যাল কিছুর বিরুদ্ধে?' লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল।

'না, অ্যান্টি ন্যাশনাল। জি এন এল এফ। রিয়াবাড়ি ছাড়িয়ে একটা বস্তিতে দুজন স্পেটার নিয়েছে বলে এইমাত্র খবর পেলাম।'

'খবরটা পান কি করে?'

'এখনও ভাই এ অঞ্চলে আমাদের সোর্সগুলো সক্রিয় আছে। বাইরে থেকে কেউ ঢুকলেই থানায় খবর চলে আসে। আপনারা কি জন্যে এসেছেন?'

'বেড়াতে।'

অফিসার একবার তাকলেন লাবণ্যর দিকে কিন্তু কিছু বললেন না। দুপাশে সবুজ গালচের মত চাবাগান রেখে দারুণ চমৎকার কালো রাস্তা দিয়ে জিপ ছুটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে চা বাগানের গায়ে সুন্দর বোর্ডে কোম্পানি এবং বাগানের নাম চোখে পড়ছিল। এত শান্ত এবং সুন্দর পরিবেশ দেখে শরীরের ক্লান্তি পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল নির্মল।

পিচের রাস্তার একপাশে জিপ থামিয়ে অফিসার বললেন, 'ওই যে রিয়াবাড়ি চা বাগানের বোর্ড। পাশ দিয়েই রাস্তা। হেঁটে গেলে বেশিক্ষণ লাগবে না।' ওরা নেমে পড়ে আর একবার ধন্যবাদ দিতেই জিপটা বেরিয়ে গেল। লাবণ্য হেসে বলল, 'আমার এই সাজগোজ কোন কাজে লাগছে না নির্মলবাবু, পুলিশ আমাকে ঠিকই মেয়ে বলে চিনতে পেরেছিল নইলে এতটা দূর লিফট দিতে চাইতো না।'

নির্মল তাকাল লাবণ্যর দিকে। কি করে যে সে ছেলে ভেবে নিজেকে ভুল বোঝায় তা বোধগম্য হয় না। মুখে কমনীয়তা ছাড়াও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রকাশ যে কোন দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করবে। লাবণ্য হাঁটা শুরু করেছিল, সে ওকে অনুসরণ করল। দু'পাশে চায়ের গাছ, মাঝে মাঝে লম্বা ছায়াগাছ যেন প্ল্যান করেই ছড়ানো। পাখি ডাকছে অদ্ভুত সুরে। খানিকটা হাঁটতেই যেন বিশ্বচরাচর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চারধারে শুধু সবুজ আর মাথার ওপরে নীল আকাশ। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল নির্মলের। সে দাঁড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। গোটা কুড়ি সবুজ টিয়া হঠাৎ একটা গাছ থেকে একইসঙ্গে ডানা মেলে দিল আকাশে। নির্মলের মনে হল এত সুখের দৃশ্য সে কখনও দ্যাখেনি। ঘাড় ঘুরিয়ে টিয়ার ঝাঁকটাকে দেখতে দেখতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে কতটা এগিয়ে গিয়েছে খেয়াল করেনি। এবার সামনে তাকাতে শূন্য নুড়ির পথ আর চায়ের গাছ নজরে এল। লাবণ্য গেল কোথায়? সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পা চালাল। হঠাৎ নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হল

তার। এবং এই প্রথম উপলব্ধিতে এল যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পেয়েও মানুষ সুখী হয় না যদি সে একাকীত্ব বোধের শিকার হয়। বাঁক ঘুরতেই নির্মল দেখল লাবণ্য চা বাগানের গায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করছে। দ্রুত কাছে পৌঁছতেই সে দেখল, একটি মহিলা গাছের তলায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। বয়স অন্তত পঞ্চাশের কাছে। চেহারা দেখে নেপালি শ্রমিক বলে মনে হচ্ছে। লাবণ্য পাশে বসে কপালে হাত দিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ভাল জ্বর আছে গায়ে। কি করা যায় বলুন তো ?'

'মিস্টার ব্যানার্জির ওখানে গিয়ে খবর দিলে হয় না ?'

'হয়। কিন্তু এ হাসপাতালে যেতে চাইছে না।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, হাসপাতালে গেলে মরে যাবে। এই চাগাছের গন্ধ নাকে এলে ও নাকি ভাল হয়ে যাবে।' হাসতে গিয়েও সামলে নিল লাবণ্য। তারপর ঝুঁকে বলল, 'ও মা, তোমার ঘর কোথায় ?'

প্রৌঢ়া শ্রমিক কোনমতে বিড়বিড় করল, 'লাইন।'

নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'লাইন মানে কি ?'

লাবণ্য মাথা নাড়ল, 'কুলি-লাইন বলে একটা কথা পড়েছিলাম। কুলিরা যে জায়গায় থাকে সেই জায়গাটাকেই লাইন বলে। চলুন, একে হাসপাতালেই নিয়ে যাই।'

'হাসপাতাল এখানে কোথায় জানেন ?'

লাবণ্য ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'এই বুড়িকে আপনি কাঁধে তুলতে পারবেন ?'

'তা পারব। এত রোগা, ওজন কিছুই হবে না।'

লাবণ্য ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?'

'মরনেকো লিয়ে। কুছ নেহি খায়া দোদিন।' বুড়ি চোখ মেলল। অত্যন্ত নির্জীব চাহনি। শরীরে যে একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই, তা স্পষ্ট। নির্মল এগিয়ে গেল সামনে। হঠাৎ বুড়ির চোখের তারা নড়ে উঠল। ঠোঁট কেঁপে উঠল। মুখ থেকে একটা কান্না জড়ানো শব্দ ছিটকে এল। এবং ধীরে ধীরে দুটো শীর্ণ হাত যুক্ত হয়ে মাথার ওপর ঠেকাতে লাগল ঘাসের ওপর শুয়ে। নির্মল হতবাক্। লাবণ্য এই পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে পারল না। সে দ্রুত বুড়ির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার ? অমন করছ কেন ?' বুড়ি একবারও নির্মলের ওপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি। সেই অবস্থায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'দেওতা, মেরি দেওতা আ গিয়া। ব্যস। ব্যস।' অবাক লাবণ্য সেখান থেকেই মুখ ঘুরিয়ে নির্মলের দিকে তাকাল। হাত দুয়েক দূরে হতভম্ব নির্মল দাঁড়িয়ে। কিন্তু পেছনের নীল আকাশের চালচিত্রে নির্মলকে তার এক অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ বলে মনে হল। আর তখনই নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

লাবণ্য হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আপনি সত্যি সুন্দর। একটু বেশি সুন্দর।'

লজ্জা পেল নির্মল, 'কি আজেবাজে বকছেন।'

'নইলে ও আপনাকে দেবতা বলে ভাবত না।' লাবণ্য হাসল, 'দেবতা

সবসময় ভক্তকে রক্ষা করে। অতএব ওকে কাঁধে তুলুন।' একটু ইতস্তত করে বুড়ির শরীরটাকে যখন নির্মল কাঁধে তুলে নিল তখন সেই দুর্বল কণ্ঠ প্রায় চিৎকার করে যাচ্ছে, 'দেওতা, দেওতা, দেওতা।'

বর্ধমান থেকে দু সেট পাজামা পাঞ্জাবি আর অন্তর্বাস কিনেছিল নির্মল। সেই ব্যাগটা এখন লাবণ্য বইছে। বুড়ি আর শব্দ করছে না। হাঁটতে হাঁটতে নির্মলের মনে হল এই মহিলা এতদিন বেঁচে ছিলেন কি ভাবে। পাখির মত হালকা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা যায়? আর তখনই নিজের মায়ের চেহারাটা মনে পড়ল। এখন যদিও ঝাপসা হয়ে এসেছে তবু চেহারার আদল গেঁথে আছে মনে। প্রায় এইরকমই শীর্ণ ছিল মা। বাংলাদেশের মায়েরা কি ভাবে বেঁচে থাকে? প্রায় মিনিট পনের হেঁটে আসার পর একটা চেকপোস্ট মত নজরে এল। বাঁশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা আছে। আশেপাশে কিছু কোয়ার্টার্স। ওদের দেখে অবাক হওয়া এক নেপালি দারোয়ান গোছের লোক জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা যায় গা আপলোগ?'

'মিস্টার ব্যানার্জি।' ম্যানেজার।'

লোকটা এবার সসম্ভ্রমে সেলাম করল, 'ইনকো কাঁহাসে মিলা?'

'চা বাগানের মধ্যে পড়ে ছিলেন। খুব অসুস্থ। একে চেনেন আপনি?'

'জী। এই বাগানে পাতি তুলতো। ওর ছেলে—।' হঠাৎ থেমে গেল লোকটা, 'এখন আর নৌকরি নেই ওর। কাল রাত্রে হসপিটালসে ভাগ গিয়া থা।' কথাটা শুনে লাবণ্য নির্মলের দিকে তাকাল। নির্মলের মুখেও বিস্ময়। লোকটা আবার বলল, 'উসকো ইঁহা পর রাখ দিজিয়ে। উধার মৎ লে যাইয়ে।'

'কেন?'

'উসকো লেড়কাকা সবকোই ডরতা হ্যায়। ব্যস। আউর মৎ পুছিয়ে।'

কিন্তু কথাটাকে আমল দিল না ওরা। লোকটা কিছু চেপে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারলেও এমন একটা অসুস্থ মানুষকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। লোকটার নির্দেশিত পথে এগোতে ইঞ্জিন চলার শব্দ এল। চায়ের ফ্যাক্টরি নিশ্চয়ই কাছাকাছি। অফিসবাড়িগুলো বাঁ দিকে। একজন সুদর্শন যুবক বৃদ্ধা নেপালি মহিলাকে কাঁধে নিয়ে প্যান্ট পরা মেমসাহেবের মত বাঙালি মেয়ের সঙ্গে হাঁটছে, দৃশ্যটি ভিড় জমিয়ে তুলতে বেশি দেরি করল না। এরমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে হাসপাতালের হদিশ জেনে নিয়েছিল লাবণ্য। কিন্তু বাড়িটার সামনে গিয়ে অত্যন্ত হতাশ হল সে। ছোট্ট একতলা হলুদ-রঙা বাড়ি। একদিকে ডিসপেন্সারি অন্যদিকে পেশেন্টদের ব্লক। নির্মল ধীরে ধীরে বেঞ্চির ওপর বৃদ্ধাকে নামিয়ে দিতেই দেখা গেল সে বেহুঁশ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে বেশ সাড়া পড়ে গেল। একজন মহিলা, তিনি সম্ভবত নার্সের দায়িত্ব পালন করেন, এসে বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে আপনারা কোথায় পেলেন? কে আপনারা?' লাবণ্য লক্ষ করল, মহিলা প্রশ্ন করছেন আর নির্মলের দিকে তাকাচ্ছেন। সে ঘটনাটা বলল।

মহিলা বললেন, 'ভেগে যাওয়া পেশেন্টের নামে থানায় ডায়েরি করতে হয়। ওদের লাইনে খবর পাঠিয়েছি, কেউ আসেনি। আপনারা এখানে এসে ঝামেলায় ফেললেন।' এবার নির্মল বলল, 'ওরকম একজন অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা না

করে ঝামেলার কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে ? বিশেষ করে এটা একটা হাসপাতাল ।'

মহিলা বললেন, 'আপনি এখানে নতুন । এদের চেনেন না তো । কি চীজ সব । মরে গেলে বলে আমরা মেরে ফেলেছি । ঠিক আছে থাকুক ওখানে, ডাক্তারবাবু এলে যা ভাল মনে হয় করবেন । আমার কিছু বলার নেই ।'

লাবণ্য দেখল সামনে ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মুখ এখন বেশ থমথমে । সে বলল, 'কোন পেশেন্ট ওভাবে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলে তার দায়িত্ব কিন্তু কর্তৃপক্ষের ওপর পড়ে ।'

এখানে ওসব নিয়ম চলে না । বাচ্চা বিয়োনোর পর রেজিস্টারে লেখার আগেই কোলে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে কত । এটা শহর নয় ।' মহিলা চলে যাচ্ছিলেন । কিন্তু নির্মল তাঁকে পেছন থেকে ডাকল, 'শুনুন ! আপনি একটু সদয় হবেন ?'

নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে যে মহিলার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটল, তা লাবণ্যর নজর এড়াল না । নির্মল বলল, 'অনেকক্ষণ এই বুড়ি বাইরে পড়েছিল । ডাক্তারবাবু আসবার আগে আপনি যদি দয়া করে ওকে কোন ওষুধ দেন তাহলে আমাদের ভাল লাগবে ।'

মহিলা এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন । তারপর বললেন, 'ডাক্তারবাবু না বললে আমার উচিত হবে না ওষুধ দেওয়া তবে ওর বিছানার ব্যবস্থা করছি ।' মহিলার নির্দেশে দুটো লোক বৃদ্ধাকে তুলে ভেতরে নিয়ে গেল । নির্মল পেছন পেছন গিয়ে দেখল গোটা বারো সিঙ্গল খাটে যত রোগী শুয়ে আছে তার সমানই পড়ে আছে মেঝেতে পাতা কম্বলের বিছানায় । বৃদ্ধার কপালেও সেইরকম একটা জুটল । চোখ মেলল বৃদ্ধা কম্বলে শুয়ে । নির্মল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল । বৃদ্ধা আবার বিড়বিড় করল, 'দেওতা, দেওতা । বাঁচাও ।' শব্দটা কেউ কেউ শুনতে পেল । সঙ্গে সঙ্গে তারা নির্মলের দিকে ফিরে তাকাল । গত কাল ট্রেনেও সে এইধরনের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে পড়েছিল । কিন্তু এই দৃষ্টিতে অন্যকিছু আছে যা তাকে খুব সংকুচিত করল । তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সে লাবণ্যর পাশে দাঁড়াতেই দেখল ভিড়টা তখনও সরে যায়নি । সবাই তার দিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাচ্ছে । নির্মল বলল, 'চলুন ।'

ম্যানেজার সানু ব্যানার্জির বাংলোর দিকে ওরা হেঁটে যাচ্ছে দেখে ভিড়টা ক্রমশ পাতলা হয়ে গেল । নির্মলের শরীরে তখনও বৃদ্ধার উত্তাপ রয়ে গেছে । একটা ঘোর যেন জমা হয়েছিল তার মধ্যে । সেটা কাটাতেই জিজ্ঞাসা করল, 'সানু ব্যানার্জির সঙ্গে আপনার পরিচয় কিভাবে ?'

লাবণ্য বলল, 'বাবার খুব অন্তরঙ্গ । ভদ্রলোক একসময় স্টেটসম্যানে ছিলেন । একবার এভারেস্ট একস্‌পিডিসনে ছবি তুলতে গিয়েছিলেন । কলকাতায় গেলেই আমাদের বাড়িতে যেতেন । খুব হইচই করা লোক । বেশ দুঃসাহসী । বাবার এই একটি জুনিয়ার বন্ধুকে আমার ভাল লাগে ।' বলতে বলতেই ওরা বিশাল লনওয়ালা একটা বাংলো বাড়ির সামনে উপস্থিত হল ।

গেট খুলে খানিকটা এগোতেই চৌকিদার গোছের একটা লোক এগিয়ে এসে সেলাম করল, 'কাকে চান আপনারা ?' লোকটা বাঙালি নয়, কিন্তু কথায় টান আছে ।

লাবণ্য মিস্টার ব্যানার্জির নাম করতেই চৌকিদার বলল, 'সাব জলপাইগুড়ি গিয়েছেন।'

লাবণ্য নির্মলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কেউ নেই?'

'মেমসাহেব আছেন।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বল, কলকাতা থেকে আসছি।'

বারান্দায় সাজিয়ে রাখা সুদৃশ্য বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে লোকটা ভেতরে চলে গেল। নির্মল একটু কাহিল বোধ করায় বসে পড়ল। চারপাশের সবুজ রকমারি গাছপালা, মাথার ওপর টাটকা নীল আকাশ, ওর ভারি পছন্দ হচ্ছিল। এখানেও বাঙালির সংখ্যা খুব বেশি নেই। কিছু হাফপ্যান্ট পরা লোককে ফ্যাক্টরির কাছে দেখেছিল সে, যাদের বাঙালি বলেই মনে হয়েছে। এখন বেশ খিদে পাচ্ছে তার। লাবণ্য অবশ্য এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করছে না। মেয়েদের কি খিদেটিদে বেশি পায় না?

'আপনারা?'

প্রশ্নটি এল নির্মলের পেছন থেকে। লম্বা বারান্দার ওপাশে কিছু সৌখিন গাছ টবে বেড়ে উঠেছে। সেগুলোর আড়ালে ছিল সম্ভবত দরজাটা। ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন সেখান থেকেই। লাবণ্য দেখতে পেয়েছিল বলেই এগিয়ে গেল, 'নমস্কার। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। মিস্টার ব্যানার্জি বাইরে গিয়েছেন শুনলাম। উনি কি আজই ফিরবেন?'

'হ্যাঁ, আজ বিকেলের মধ্যেই ফেরার কথা ছিল। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেলে কাল ফিরবেন। পাঁচটার তো বেশি দেরিও নেই। আপনাদের তো চিনলাম না?' মহিলা কথা বলছিলেন চমৎকার ব্যক্তিত্ব নিয়ে। লাবণ্যর মনে হল একটু বেশি রকমের সুন্দরী ইনি। যেন সিংহী পার্ক বা মার্বেল প্যালেসের স্ট্যাচুকে লাল শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লাবণ্য জবাব দিল, 'আমার বাবার সঙ্গে ওঁর অনেকদিনের সম্পর্ক। সেই যখন স্টেটসম্যানে ছিলেন।' বাবার নাম ও বিশদে বলল নিজেদের পরিচয়। ভদ্রমহিলা বললেন, 'মনে হচ্ছে শুনেছি আপনাদের কথা। আসলে এত লোকের সঙ্গে ও মেশে যে, সবার নাম আমি মনে রাখতে পারি না। সানু এলে খুব ভাল হত। আপনারা তো আজ রাত্রে এখানে থাকবেন? এদিকে কোথাও বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

নির্মল উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হয়নি। এখন ওঁর কথাগুলো খুব অপছন্দ হচ্ছিল। সে শুনল লাবণ্য বলছে, 'আমরা কাজেই এসেছিলাম এদিকে। ভাবলাম সানুকাকুর সঙ্গে দেখা করে যাই। আপনার অসুবিধে হলে কাছাকাছি কোথাও—।'

ভদ্রমহিলা হেসে উঠলেন, 'অসুবিধে বলতে আমি যেহেতু আপনাদের আগে কখনও দেখিনি তাই আপনারা আমার কাছে উটকো লোক। কিন্তু এখন রাস্তায় পৌঁছে আপনারা কোন বাস পাবেন না। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জি এন এল এফের ভয়ে। আর পেলেও পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটারের মধ্যে কোন হোটেল পাবেন না। কথা শেষ করে ভদ্রমহিলা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ডাকলেন, 'চৌ-কি-দার।'

কাছেপিঠে ছিল সম্ভবত, তৎক্ষণাৎ ছুটে এল লোকটা, জী।'

'এদের আউট হাউজে নিয়ে যাও।' ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ালেন না।

লোকটাকে অনুসরণ করে ওরা বাড়ির সমান্তরাল একটা এক কামরার বাংলোয় এল। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে লোকটা তড়িঘড়ি বাথরুম দেখে এল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা চা খাবেন তো?' লাবণ্য মাথা নেড়ে বলল, 'খালি চা খেতে পারব না, সঙ্গে কিছু এনো।' লোকটা বেরিয়ে গেলে নির্মল হেসে ফেলল, 'যাক। আপনারও তাহলে খিদে পেয়েছে।'

'পেয়েছে মানে? প্রচণ্ড পেয়েছে। মিসেস ব্যানার্জি যদি কাটিয়ে দিতেন তাহলে যাওয়ার আগে খাবার চেয়ে নিতাম। এটা কিন্তু সত্যি আউট হাউস, গেস্ট হাউস নয়।'

'দুটোর পার্থক্য কি?'

'গেস্ট হাউস একঘরের হয় না। গেস্টকে আরাম দেবার ব্যবস্থা অনেক বেশি থাকবে।'

'আপনি কি আগে স্নান করবেন?'

'আপনি করে নিন আগে।'

লাবণ্য কোন কথা না বলে তার ব্যাগ খুলে এক প্রস্থ জামাকাপড় বের করে বাথরুমে ঢুকে গেল। এঘরে দুটো চেয়ার একটা টেবিলের দুপাশে। ডাবল বেড একটা। একটা ওয়ার্ডরোবের মত কিছু। পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসতেই কাঁচের জানলার ওপাশে দেওদার গাছের গা ঘেঁষে পড়ে থাকা চা বাগানের ওপর সূর্যদেবকে শেষবার আলো ছড়াতে দেখল সে। ওপাশের আকাশটা ক্রমশ লাল হয়ে এল। টুপ করে সূর্য নেমে গেল চাগাছের আড়ালে। প্রচুর পাখি ছোটাছুটি করছে আকাশে। শরীরে ক্লান্তি এবং ক্ষুধা যতই প্রবল হোক এই মুহূর্তে নির্মল সবই বিস্মৃত হল। হঠাৎ তার অবচেতন মনে কেউ যেন মৃদুস্বরে বলে উঠল, 'দেওতা, দেওতা।' তারপরেই সেই বৃদ্ধা অসুস্থা রমণীর মুখ ভেসে উঠল। পরমপ্রাপ্তির আনন্দ সেই মুখে। এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। লাবণ্য কিছু বলল। কি বলল সেটা কানে ঢুকল না নির্মলের। যেন অসীম আকাশ থেকে সে সোঁ সোঁ করে নিচে নেমে আসছে।

'কি হয়েছে আপনার? কি ভাবছিলেন?'

নির্মল দেখল লাবণ্যর পরিষ্কার মুখ তার সামনে ঝুঁকে রয়েছে বিস্ময়ে। এমনটা তার কখনও হয়নি। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি দ্বিগুণ হয়েছে। ম্লান হাসল সে, 'না কিছু নয়।' তারপর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পুঁটলি নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে শাওয়ার দেখতে পেয়ে সেটা খুলে দিয়ে নিচে দাঁড়াল। বৃষ্টিধারার মত জল নামছে শরীরে। আরাম। একটু একটু করে ক্লান্তি মুছে যাচ্ছে। তাকে দেবতা বলল কেন বৃদ্ধা? বৃদ্ধা কি দেবতার ছবি দ্যাখেনি আগে? তাহলে! বড় ধন্দ লাগল। হাসল নির্মল। কোটি কোটি ভক্তর কাছে বাবা দেবতা। যে দেবতা বাণী দেন, কখনও অলৌকিক কাণ্ড করেন, যাঁর আশীর্বাদ অনেকের জীবনে সুদিন আনে। তার তো সেসব ক্ষমতাই নেই। হোক তাও চায় না সে। তোয়ালে ঝুলছিল ব্র্যাকেটে। সেটা তুলতেই চোখের দৃষ্টিতে অস্বস্তি লাগল। মেয়েদের অন্তর্বাস সে নিজের চোখে আগে কখনও দ্যাখেনি।

স্নান করে লাবণ্য ধুয়ে ওখানে মেলে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন আড়ালে, শরীরের প্রয়োজনীয় পোশাককে এভাবে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হবে কেন ? সে যখন বর্ধমানে নিজের অন্তর্বাস কিনেছিল তখন তো লাবণ্য পাশেই ছিল। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয়নি তখন। আর হবেই বা কেন ? লাবণ্যর এই ব্যবহারের কোন হদিশ পাচ্ছিল না সে।

নতুন পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে আসার আগে সে পুরোনো পোশাক জলে ধুয়ে মেলে দিল বাথরুমেই। তার বেশি ঘাম হয় না কিন্তু এরমধ্যেই সেগুলো গন্ধ ছাড়ছিল। নতুন পাজামা পাঞ্জাবিতে খুব তাজা লাগছে এখন। টেবিলে তখন খাবার সাজাচ্ছে লাবণ্য। একটা চায়ের পট, এক জোড়া কাপডিস, ওমলেট, এবং টোস্টের সন্নিবেশ চোখের আরাম এনে দিল। এবং তারপরেই নজরে পড়ল লাবণ্যকে। আশ্চর্য, এখন একদম মেয়ে মেয়ে লাগছে। হলদে পাজামা এবং কলার তোলা হলুদ পাঞ্জাবি পরেছে লাবণ্য। ছেলেদের মত চুল ছাঁটা সত্ত্বেও বেশ মমতাময়ী বলে মনে হচ্ছে। স্নান করলে মেয়েদের চেহারা কি এমন টাটকা হয়ে যায় ? লাবণ্য বলল, 'বাড়ি থেকে বের হবার সময় কিছু জিনিসপত্র তো সঙ্গে আনলে পারতেন। চিরুনি ওখানে আছে।' মেয়েলি চিরুনিতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্মল বলল, 'কিভাবে এসেছি যদি জানতেন তাহলে বলতেন না। কাপড় পাকানো দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে, মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে সেইদিনই আমার শেষদিন। তার ওপর বোঝা বইতে গেলে দেখতে হত না।'

দুটুকরো ডিমের ওমলেট মুখে পোরার পর বিদ্‌ঘুটে গন্ধটায় শরীর আক্রান্ত হল। প্রাণপণে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিল নির্মল। সে একটা টোস্ট তুলে নিয়ে কামড়াল। নতুন মাখনের গন্ধ আগের অস্বস্তিকে সামান্য ঢাকল যেন। লাবণ্য সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

'কখনও ডিম খাইনি। গন্ধটা খুব—।'

'খাচ্ছেন কেন ? আপনি টোস্টগুলো খেয়ে নিন।'

'না। সবাই যা পারে আমি তা পারব না কেন ?'

কিন্তু মিনিট দশেক পরেও নির্মলের মনে হচ্ছিল অস্বস্তিটা শরীর জুড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত শরীর কিছুতেই মানতে চাইছে না। সে বলল, 'একটু ফাঁকা জায়গায় হেঁটে আসি। আপনি বিশ্রাম নিন।' লাবণ্যকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে বেরিয়ে এল। যদি বমি করতেই হয় তাহলে নির্জনে একা একা করাই ভাল।

অন্ধকার নেমে এসেছে চা বাগানে। কলকাতা কিংবা আশ্রমে এত ঘন অন্ধকার সে কখনও দ্যাখেনি। ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে শরীর শীতল হল। অস্বস্তি কমতে লাগল। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল তার। এতদিন আদরে মানুষ হয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এত পার্থক্য নিয়ে কেউ তাদের জন্যে কাজ করতে পারে ? কিন্তু মনের সায় যার আছে তার পক্ষে কি শরীরকে বশ মানানো অসম্ভব ? এই যে, কাল রাত থেকে, প্রায় বিশ ঘন্টা অন্নজল ছাড়া ছিল, তা কি আগে কখনও কল্পনা করতে পারত ?

হাঁটতে হাঁটতে বাংলোর উল্টোদিকের গেটে চলে এসেছিল সে। সেটাকে

খুলে অন্ধকারে আর একটু এগোতেই চায়ের তীব্র গন্ধ নাকে এল। এখনও ফ্যাক্টরি চলছে নাকি? আওয়াজ কানে আসছে না তো। সে আলো লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই হাসপাতালটিকে পেয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই দারোয়ান গোছের একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'বলিয়ে সাব!'

'নার্স নেই?'

'নেহি। ডিউটি খতম হো গিয়া।'

'ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?'

'আয়া থা। চলা গিয়া।'

নির্মল একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভেতরে যেতে পারি? একজনকে একটু দেখব?'

'আভি তো অন্দর যানা মানা হ্যায়। আপ ওহি বুড্ডিকো লিয়ায়া থা না?'

'হ্যাঁ। কেমন আছে?'

'থোড়া আচ্ছা হ্যায়। ডাকদারবাবু সুঁই দিয়া।' লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আপ বড়া সাহাবকো রিলেটিভ হ্যায় না? ঠিক হায়, আপ আইয়ে।' হঠাৎ মন পাল্টে ওকে ইঙ্গিত করে ভেতরের দিকে এগোল লোকটা। বৃদ্ধাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল নির্মলের। সে ওই একই পথে ভেতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। সমস্ত ঘর জুড়ে কাতরানি আর কান্না পাক খাচ্ছে। নির্মল অস্থির হয়ে উঠল। লোকটা বলল, 'আইয়ে সাব।' যন্ত্রণাকাতর মেয়েদের মধ্যে দিয়ে সে বৃদ্ধার কাছে পৌঁছাল। এত কাতরানির মধ্যেও বৃদ্ধা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। মুখে যেটুকু আলো পড়ছে তাতে বোঝা গেল গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। হয়তো ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওকে। লোকটা ডাকতে যাচ্ছিল, নির্মল নিষেধ [illegible] পা চালিয়ে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এল। তখনও [illegible] লেগে আছে। মানুষগুলো যন্ত্রণা পাচ্ছে [illegible]। এখানকার হাসপাতালের নিয়মকানুন [illegible]

[illegible] ফিরে এসে ব্যাপারটা বলল লাবণ্যকে। লাবণ্য তখন আলো জ্বেলে চুপচাপ শুয়েছিল। শোনামাত্র উঠে বসল, 'আমরা যদি কিছু করতে যাই তাহলে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? প্রথমত নার্সিং জানি না, ভাল করতে গিয়ে খারাপ না করে বসি। দ্বিতীয়ত, নতুন জায়গায় এসেই যদি লোকজনকে চটাই—, না, আজ থাক।'

জানলার পাশের চেয়ারে বসে নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ব্যানার্জি আসেননি?'

'সম্ভবত না। এলে নিশ্চয়ই দেখা করতেন।'

'দেখা হলে ওঁকে জিজ্ঞাসা করব মানুষগুলোকে এভাবে কুকুর বেড়ালের মত ফেলে রাখার কি মানে? একজন নার্স কি রাত্রে ওদের পাশে থাকতে পারে না?' নির্মল চুপ করে গেল। ওরা কেউ অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'এই চা বাগানের মালিক তো মিস্টার ব্যানার্জি নন। উনি ম্যানেজার। চাকরি করেন। মালিক তবে কে?'

লাবণ্য বলল, 'জানি না। চা বাগানের মালিকরা শুনেছি খুব বড়লোক হয়।'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'সে তো নিশ্চয়ই। নইলে তাদের বিলাসের জন্যে এইসব শ্রমিকরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবে থাকে।'

লাবণ্য বলল, 'মাঝে মাঝে আপনি অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন।'

নির্মল বলল, 'এসব আমার ভাল লাগার কথা। বলেছেন যিনি তাকে আপনিও জানেন। চেনেন কতটা তা জানি না। তিনি বলেছিলেন নতুন ভারত বেরুবে লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট বাজার থেকে। ওরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। দুঃখভোগ করে অর্জন করেছে অটল জীবনীশক্তি। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। ভারতের চিরপদদলিত এই শ্রমজীবিরাই নূতন ভারত গড়তে যাচ্ছে। স্বার্থান্বেষী ধনীরা যদি নিজেদের সমাধি খনন না করে এখনই তাহলে পরে সেই শক্তির উত্থানের সময় আর সুযোগ পাবে না।' নির্মল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লাবণ্যকে দেখল, 'এসব বিবেকানন্দের কথা।'

'আমার কেমন মনে হচ্ছিল। আমি কখনও পড়িনি। প্রচণ্ড সাম্যবাদী মানুষ ছিলেন। সম্ভবত অসময়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে।'

লাবণ্যর কথাটা খুব ভাল লাগল নির্মলের, 'এইটে আমি বিশ্বাস করি। বিবেকানন্দ যদি স্বাধীনতার পরে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে ভারতবর্ষ হয়তো দার্শনিক ধর্মপ্রচারককে পেত না, কিন্তু মার্কস, লেনিন মাও সেতুং-এর মতই জীবনীশক্তি সম্পন্ন এক বিপ্লবী নেতাকে পেত যিনি এদেশের চেহারাটাকে বদলে দিতে পারতেন।'

রাত দশটায় থানায় এল ইউনিস। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধ্যানেশকুমার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারল আজ। গুলিতে মৃত্যু নিয়ে আর কোন হৈ চৈ হবে না যখন তখন তাকে খামোকা ধরে রেখে লাভ কি!

থানার বাইরে নিজের গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে ইউনিস নির্দেশ দিল নেমে যেতে। 'আপনি এবার দূরে থাকবেন ধ্যানেশবাবু। বাবার আদেশ তাই।' ইউনিস বলল।

'কেন?'

'আপনি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত নন। এর বেশি আমাকে প্রশ্ন করবেন না।'

'আমি কি করব?'

'যা করছিলেন। গান বাজনা। যদি কখনও বাবার দয়া পান, তাহলে আশ্রমের জীবনে ফিরে আসবেন। ছোটে মহারাজকে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন।' ইউনিস ড্রাইভারকে ডাকল। সে এলে ধ্যানেশকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বাড়িতে ফিরে যাবেন?'

ধ্যানেশ পাথরের মত বসেছিল। সাড়া দিল না। তার মাথা কোন কাজ করছিল না। ভক্তের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী নয়। তাহলে আবার বাবা তার ওপর রুষ্ট হলেন কেন? সে ঠিক করল, কাল সকালেই আশ্রমে রওনা হবে। বাবা যদি দেখা না করতে চান তাহলে অনশন করবে।

এখন রাস্তা নির্জন। নিজের বাড়ির কাছে যে পৌঁছে যাচ্ছে খেয়াল করেনি ধ্যানেশ। ইউনিস তাকে সচেতন করল, 'ধ্যানেশবাবু, আপনার বাড়ি এসে গিয়েছে।'

হুঁশ ফিরতেই ধ্যানেশ জানলা দিয়ে মুখ বের করতেই চারধার কাঁপিয়ে শব্দ উঠল। গাড়িটা কেঁপে উঠে রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেল সশব্দে। পর পর পাঁচবার শব্দটা করে ফুটপাতের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা তীব্রগতিতে বেরিয়ে গেল। শব্দটা হতেই ইউনিস তার দীর্ঘকালের মানসিক প্রস্তুতিতে দুই সিটের নিচে কুঁকড়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু পাঁচিলে ধাক্কা লাগা মাত্র সামনের সিট পেছনে সরে এসে তাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে জ্ঞান হারাল সে।

মধ্যরাতে সুধাময় সেন টেলেক্সে খবর পাঠাচ্ছিল। মেজ মহারাজ সেই খবর দ্রুত লিখে নিচ্ছিলেন বাংলায়। 'অজ্ঞাত আততায়ীরা আজ রাত পৌনে এগারটায় ধ্যানেশকুমারের বাড়ির সামনে গুলি চালায়। গুলিতে ধ্যানেশ এবং ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। ইউনিসকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার পাঁজর এবং মাথা ভেঙে গেছে। ঘটনাস্থলে কোন প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে আততায়ীরা জানত, আজ রাত্রে ধ্যানেশ মুক্তি পাবে তাই তারা সেখানে অপেক্ষায় ছিল।'

বরদাচরণ সেনগুপ্তকে কলকাতা হাইকোর্টে সবাই অত্যন্ত সমীহ করেন। উনি যার কেস হাতে নেন সে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে অবশ্য তাঁর নাগাল পাওয়া শক্ত। খুব জটিল এবং ধনবানদের কেস না হলে তিনি গ্রহণও করেন না। বলেন, 'মাথা ঘামাবো অথচ পেট ভরবে না, তা কখনো হয়?' নিন্দুকেরা বলে, তার পেটের গহ্বর নাকি এক ডজন চালু অ্যাডভোকেটের চেয়ে গভীর। কিন্তু এখন তিনি বসেছিলেন নতজানু হয়ে। অত্যন্ত মন দিয়ে তিনি শুনছিলেন নির্দেশ। তারপর শ্রদ্ধা সহকারে বললেন, 'আমি চারদিনের মধ্যে আপনার আদেশ পালন করে এখানে উপস্থিত হব।' তিনি আবার প্রণাম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। আজ তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, বাবা ঠিক স্বাভাবিক নন। মুখে যেন বয়সের ছাপ পড়েছে। বরদাচরণ আর একটু সময় অপেক্ষা করলেন। বাবা বললেন, 'প্রয়োজন বোধ করলে আমিই সমস্ত কিছু ঘোষণা করব। তোমার ভূমিকা শুধু নীরব সাক্ষীর।'

বরদাচরণ মাথা নাড়লেন, 'এক্ষেত্রে আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।'

'তোমার ওকালতি কেমন চলছে? জে সি ঘোষকে নিয়ে এলে না কেন?'

'আপনার আশীর্বাদে বিশ্রামেরও সময় পাই না। মিস্টার ঘোষ এখন বিদেশে।'

'ও! না না, বিশ্রামের সময় তৈরি করে নেবে। শুধু পরিশ্রম করলে চলবে না। এসো।'

বরদাচরণ যখন আনন্দভবন থেকে বেরিয়ে এলেন, তখনই এক সেবক তাঁকে জানাল বড় মহারাজ অপেক্ষা করছেন। বরদাচরণ তাকে অনুসরণ করলেন।

বড় মহারাজ খুব বিমর্ষমুখে বসেছিলেন। তাঁর ঘরের জানলায় 'আত্মারাম' খাঁচায় ঝুলছে। বরদাচরণ ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই আত্মারাম বলল, 'জয়বাবা। নেকুবাবু এলেন।'

বরদাচরণ থতমত হয়ে পাখিটাকে দেখলেন। বড় মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আত্মারামকে বললেন, 'অসভ্যতা করো না! নইলে খাবার বন্ধ হবে। জয়বাবা।'

বরদাচরণ জবাব দিলেন, 'জয়বাবা।'

'বসো। আমাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে এখনও রহস্য আছে। সেটা তিনু মহারাজ কাগজে-কলমে লিখে যাননি। কিছু নয়ছয় হয়েছে।'

'তিনু মৃত্যুর সময় আর মহারাজ ছিল না। পাপের বেতন মৃত্যু। তিনুর তাই হয়েছে। কিন্তু এই একমাসের মধ্যে আশ্রমের ওপর একটার পর একটা আঘাত আসছে। এখন পর্যন্ত ইউনিসের মনে পড়ছে না, সে কোন আততায়ীকে দেখেছে কিনা।'

'ইউনিস তো সুস্থ এখন?'

'প্রায়। একটু নার্ভাস হয়ে রয়েছে। ধ্যানেশের হত্যাকারীকে পুলিশ বের করতেই পারছে না। যদিও সে আমাদের কেউ ছিল না। যাক। বাবার সঙ্গে কথা হল?' খুব সাধারণ গলায় প্রশ্নটি করলেন বড় মহারাজ। আর এইরকম একটা প্রশ্নের সামনে পড়বেন বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন বরদাচরণ। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

pathagar.net

'তুমি আদেশ পেয়েছ?'

'আজ্ঞে।'

'না না। তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তোমার মন্ত্রগুপ্তি নিশ্চয়ই রক্ষা করবে।'

'মেজ মহারাজ কি আশ্রমে আছেন?'

বড় মহারাজের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'মেজকে দরকার? কেন?'

'না। আশ্রমে এলাম, দর্শন করব।'

'ও। মেজ তো আশ্রম থেকে সচরাচর কোথাও যায় না।'

'ছোটে? ছোটে নেই। ছোটে নেই।' আত্মারাম হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

বরদাচরণ পাখিটিকে দেখলেন। বড় মহারাজের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন, 'পাখিটা বড্ড বাজে কথা বলছে আজকাল।'

বরদাচরণ উশখুশ করে বললেন, 'অপরাধ নেবেন না, ছোটে মহারাজ সম্পর্কে কিছু উড়ো খবর কলকাতায় ভাসছে। অবশ্য হাতে কোন প্রমাণ নেই।'

'কি রকম?' বড় মহারাজ কৌতূহলী হলেন।

'আমার কাছে নানান ধরনের লোক আসে। তাদের কেউ দাবি করেছিল, সে ছোটে মহারাজকে একটি প্যান্টশার্টপরা মেয়ের সঙ্গে বর্ধমান স্টেশনে দেখেছে।'

'বাজে কথা। ছোটে বেড়াতে গিয়েছে। মেয়েছেলের সঙ্গ ছোটে করবে এটা ভাবলে কি করে?'

'না, না, আমি ভাবিনি। আমি ভাবতে পারি না।' বরদাচরণ যেন আঁতকে

উঠলেন।

'তুমি কি আর কোন খবর দিতে পার?'

'উপস্থিত না।'

'বেশ। এসো এখন।'

বরদাচরণকে বিদায় করে বড় মহারাজ কলকাতায় টেলিফোন করলেন। ইদানিং একবারে লাইন পাচ্ছেন না তিনি। কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে মিনিট পাঁচেক পরে সুধাময়কে পেলেন, 'ছোটের খবর কিছু জানো?'

সুধাময় গতরাত্রে ঘুমিয়েছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'একটা উড়ো খবর পেয়েছি।'

'কি খবর?'

'ওঁকে একটি প্যান্টপরা মেয়ের সঙ্গে বর্ধমানে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত সেখান থেকে ট্রেন ধরে উত্তরবাংলায় গিয়েছেন। আমি উত্তরবাংলা চষে ফেলার ব্যবস্থা করেছি। যে ছেলেটির সঙ্গে কলেজে ছোটে মহারাজ মিশতেন তার নাম কানাই। গোপন রাজনীতি করে। কানাই-এর এক মেয়েবন্ধু প্যান্টশার্ট পরে। যদি গুজব সত্যি হয়, তাহলে ছোটে মহারাজের সঙ্গে তাঁকেই দেখা গিয়েছে। উত্তরবাংলায় ওঁরা গেলে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না।' সুধাময় গড়গড় করে বলে গেলেন।

'গুজবটাকে সত্যি প্রমাণ কর।' বড় মহারাজের মুখে এতক্ষণে যেন রক্ত ফিরে এল।

সুধাময় বললেন, 'আমার লোকজন কাজে নেমেছে খবরটা পাওয়ামাত্র।'

'বাবা খুব অধীর হয়েছেন। আগামী পূর্ণিমার মধ্যে ছোটের খবর চান। এটা মনে রেখো।'

'এবার মনে হচ্ছে ব্যর্থ হব না।'

'ইউনিসকে দেখতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। মাথার চোট সারতে দেরি হবে। কিন্তু লোকটি খুব নার্ভাস হয়ে রয়েছে।'

'তুমি সাবধানে থেকো। জয় বাবা।'

'জয় বাবা।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বড় মহারাজের মনে হল অনেকদিন তিনি হেঁটে আশ্রমের পথে যাওয়া-আসা করেননি। আজ সেটি করলে কেমন হয়! সাধারণ ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যত বেশি থাকবে তত মঙ্গল। তিনি আত্মারামের দিকে তাকালেন। পাখিটা আজকাল বাইরের লোকের সামনে খারাপ কথা বলছে। এর জন্যে দায়ী অবশ্য তিনি নিজেই। যখন কাছে-পিঠে কেউ থাকে না তখন মাঝে মাঝে শব্দগুলো শোনার জন্যেই আত্মরামকে বলতেন। বাবা বলেন যা কিছু পাঁক নোংরা মনে পাক খায় তা বের করে দিয়ে নির্মল হও। এই যেমন একদিন একটা লোককে দেখে বড় মহারাজের খুব রাগ হল। মনের মধ্যে চট করে খচ্চর শব্দটি চলে এল। লোকটা একটি খচ্চর। কিন্তু উচ্চারণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেউ যদি শুনে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে ঢি ঢি পড়ে যাবে। কিন্তু নোংরাটা মন থেকে বের করে দেওয়া দরকার। একা কোন নির্জন

pathagar.net

জায়গায় দাঁড়িয়ে বললে মনে হয়, নিজের গায়েই শব্দটা জড়িয়ে গেল। সামনে একজন শ্রোতা চাই। তাই আত্মারাম। সে কান খাড়া করে, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্যাখে। ভবনের ছাদে নীল আকাশের তলায় আত্মারামকে নিয়ে গিয়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে বড় মহারাজ পাখির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তুই ব্যাটা খচ্চর।' পাখিটা মাথা নিচু করতেই মন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাঁর। যেন শরীর থেকে নোংরা ধুয়ে ফেলে নির্মল হলেন। একবার উচ্চারণ করা শব্দ শুনলে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না আত্মারাম। এইটাই যা বাঁচোয়া। কিন্তু পাখিটাকে বাবা একবার দেখতে চেয়েছিলেন। নানান ঝামেলায় সেটা খেয়াল ছিল না। বড় মহারাজ একজন সেবককে নির্দেশ দিলেন আত্মারামকে সঙ্গে নিয়ে আসতে।

মাটিতে পায়ে হেঁটে বড় মহারাজ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনু, ধ্যানেশ এবং ইউনিস তৈরি করা দুর্ঘটনায় পড়ার পর আশ্রমে পাহারা জোরদার করা হয়েছে। যে সমস্ত ভক্তরা আজ এখানে এসেছেন তাঁরা বড় মহারাজকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল তাঁর। আশ্রমের বিভিন্ন মহল পরিদর্শনের সময় অন্যান্য মহারাজরা তাঁর সঙ্গ নিলেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে তিনি মেজ মহারাজের দর্শন পেলেন। কয়েকজন নবীন দীক্ষিতের সঙ্গে কথা বলছিলেন মেজ মহারাজ। বড় মহারাজকে দেখেই তিনি বললেন, 'জয় বাবা।' শব্দদুটি ফিরিয়ে দিয়ে বড় মহারাজ বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটু নিভৃত আলোচনার দরকার।' মেজ মহারাজ শশব্যস্তে তাঁর ভবনের একতলায় বড় মহারাজকে নিয়ে এলেন। সঙ্গীদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হল। ঘরে ঢুকে বড় মহারাজ বললেন, 'তোমার এই ভবনটির কোন অংশ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ?'

'আজ্ঞে অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও সেটা করা হয়নি।'

'আঃ। মিছিমিছি এই গরমে কষ্ট পাচ্ছ। এটা প্রয়োজন। করে নাও। হ্যাঁ, ছোটের একটা হদিশ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে আশ্রমজীবনে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

বড় মহারাজ খুব বিমর্ষ মুখে জানাতেই মেজ মহারাজ চমকে উঠলেন, 'কেন ? কি হয়েছে তার ?'

বড় মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'সুধাময় টেলিফোনে বলল তাকে নাকি বর্ধমান স্টেশনে একটি ফিরিঙ্গি টাইপের মেয়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ছোটে নারীর আকর্ষণে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। সে নিশ্চয়ই নারীসঙ্গ ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। তার সঙ্গে প্যান্টপরা নারী ছিল। অর্থাৎ কোনরকম সঙ্কোচ লজ্জার বালাই যার নেই তার শরীর সম্পর্কেও কোন রক্ষণশীলবোধ থাকবে না। ছোটে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু খবরটা বাবাকে কিভাবে জানাবো ?'

মেজ মহারাজ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সৎ-ভাই সত্ত্বেও তিনি ছোটেকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

বড় মহারাজের কাছে বিবরণ শুনে তিনি মাথা নাড়লেন, 'আমরা প্রকৃত অবস্থা জানি না। শুধু অনুমান করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কি ঠিক হবে ? ছোটের চরিত্রবল এত অল্পে বিনষ্ট হবে, ভাবতে খারাপ লাগছে আমার।'

'জীবন বড় নিষ্ঠুর সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে মেজ। আর সত্যানুসন্ধানের

জন্যে সবসময় সাক্ষাৎ প্রমাণের দরকার পড়ে না। ক্ষুধার্ত এবং খাবার একজায়গায় থাকলে পরিণতি ভিন্ন হতে পারে না। ছোটের আর মহারাজ হবার যোগ্যতা নেই।'

'এই সিদ্ধান্ত তো বাবাই নেবেন। যত নিষ্ঠুর সংবাদ হোক, বাবাকে তা দিতেই হবে। তিনি সাংসারিক শোকতাপের ঊর্ধ্বে।'

'বেশ, তুমি আমার সঙ্গে চল। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল, আজ বরদাচরণ উকিল এসেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যারিস্টার জে সি ঘোষকে আনেননি। বাবার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে নিভৃতে। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

'আপনি মনে হয়, অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা করছেন।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। তৃতীয়ত, রাজ্যমন্ত্রী বিপদে পড়ে বাবার শরণাপন্ন হলেন, কেন্দ্রীয়মন্ত্রীও এলেন কিন্তু আশ্রমের জন্যে কিছুই পাওয়া গেল না তাঁদের কাছ থেকে। বাবা হঠাৎ এমন নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'জাগতিক কোন চাহিদা তো আমাদের নেই। প্রতিমাসে ভক্তরা যে প্রণামী পাঠায় তাই এখন উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গিয়েছে। এখন বিদেশের বড় শহরগুলোতে যাতে শাখা খোলা যায়, তার চেষ্টা চলছে। আর এই সমস্ত খরচ চলছে প্রণামীর টাকায়। মন্ত্রীরা আর কি দিতে পারেন! অবশ্য আপনি কোন পাওয়ার কথা বলছেন আমি জানি না।' মেজ মহারাজ বললেন।

'প্রতি মাসে প্রণামী বাবদ পাওয়া অর্থের অডিটেড রিপোর্ট তুমি দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বড় মহারাজ নীরবে মাথা নেড়ে বললেন, 'এসো, আমার সঙ্গী হও।'

দুই মহারাজ বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র এক বৃদ্ধ ভক্ত প্রায় আছাড় খেয়ে পড়লেন ওঁদের পায়ের সামনে। হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন তিনি। সেবকরা ছুটে এল। কিন্তু বৃদ্ধকে কিছুতেই তারা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। মেজ মহারাজ তাদের শান্ত হতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোমার? এত বিচলিত কেন?'

বৃদ্ধের গলার স্বর কান্নায় বসে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় তিনি কোনমতে বললেন, 'বাবার দর্শন চাই। আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র বাবা ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'কেন বাবার দর্শন চাও?'

বৃদ্ধ উন্মত্তের মত বললেন, 'মহারাজ, দয়া করুন। বাবার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। আমি তাঁর ছেলে। আমার বিপদে তিনি রক্ষা করবেনই।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'তোমার সমস্যা আমাকে খুলে বলতেই হবে। কারণ অনেকেই একটা মিথ্যে কারণ দেখিয়ে বাবার কাছে পৌঁছতে চায়। বাবাকে শুধুই বিরক্ত করে তারা। কিসে তোমার সর্বনাশ হল বল?'

বৃদ্ধ আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'নিজের মুখে কি করে বলব মহারাজ!'

মেজ মহারাজ বড় মহারাজের দিকে তাকালেন, 'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এর সঙ্গে কথা শেষ করে আসছি।'

বড় মহারাজ আপত্তি জানাতে গিয়েও জানালেন না। বললেন, 'আমি কৃষিপ্রকল্প ঘুরে আসছি। তুমি আমার সঙ্গে সেখানেই যোগ দিও।'

বৃদ্ধকে নিয়ে মেজ মহারাজ ভবনের অফিসঘরে চলে এলেন। অনুসরণকারীদের চলে যেতে বলে তিনি বৃদ্ধকে একটি চেয়ারে বসতে বললেন। কিন্তু বৃদ্ধ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গাল ভিজে যাচ্ছিল চোখের জলে। মেজ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বল, কেন তুমি এইরকম বিচলিত হয়েছ? কি ঘটনা ঘটেছে তোমার জীবনে?'

বৃদ্ধ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন। তারপর সেই অবস্থাতেই বললেন, 'আমার মেয়ের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সে সন্তানসম্ভবা।'

'সর্বনাশ? সে কি বিবাহিতা নয়? তোমার কাছে থাকে না?'

'আজ্ঞে না। আমি অত্যন্ত গরীব। গ্রামে চাষবাস করি। মেয়ে স্কুলফাইন্যাল পাশ করার পর বড় মহারাজের অনুমতি নিয়ে আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম। সে এখানকার সেবিকা।'

'সেবিকা?' চমকে উঠলেন মেজ মহারাজ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দশদিন হল, সে দেশে ফিরে গিয়েছে। আমার স্ত্রী খবরটা জানতে পেরে প্রায় উন্মাদিনী। এখন বাবা যদি দয়া না করেন তাহলে আত্মঘাতী হতে হবে আমাকে।' বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিলেন।

'এই ক্ষতিটি কি আশ্রমেই হয়েছে?' মেজ মহারাজের গলার স্বর কঠোর।

'আজ্ঞে। গত তিন বছর ধরে সে এখানেই ছিল। একবারও দেশে যায়নি।'

'ঘটনার জন্যে কে দায়ী?'

বৃদ্ধ আচমকা চুপ করে গেলেন। তাঁর চিবুক বুকের উপর নেমে এল।

'আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছেন সেই পাষণ্ডটি কে?'

এবার বৃদ্ধের মুখে আতঙ্ক ফুটল, 'না না, মহারাজ। আমাকে প্রশ্নটি করবেন না। তিনি পাষণ্ড নন। আমি জানি না আমার কি বলা উচিত। শুধুই আপনি আমাকে ওঁর নাম জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার মহাপাপ হবে। মহাপাপ।'

'শুনুন। তোমার মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, তার নাম উচ্চারণ করলে মহাপাপ হবে কেন?'

'হবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'অসম্ভব। দোষী শাস্তি পাবে না এমন কাজ করতে পারি না আমি। বাবার দর্শন চাইছিলে তুমি। বাবা তো জানতেই চাইবেন উত্তরটা।'

'বাবার কাছে আমি সব বলতে পারি। তিনি ভগবান।'

মেজ মহারাজ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। এই চাষী বৃদ্ধের হৃদয়ে বাবা কোন জায়গা নিয়েছেন? বৃদ্ধ তখন বলছেন, 'বাবা সব শুনলে নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচাবেন।'

'কি রকম বাঁচতে চাইছ তুমি? তোমার মেয়েকে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।'

'সেই সুযোগ আর নেই। সময় পেরিয়ে গিয়েছে।'

'তুমি যদি অপরাধীর নাম বলতে না পার তাহলে আমার কিছুই করণীয় নেই।' কিছুটা রেগে গিয়েই মেজ মহারাজ বেরিয়ে এলেন অফিসঘর থেকে।

কয়েকজন সেবক তখনও অপেক্ষায় ছিল। বৃদ্ধ তাদের নিষেধ অমান্য করে পেছনে পেছনে আসছিল। মেজ মহারাজের মন তেতো হয়ে গিয়েছিল। কে সেই লোক যার নাম উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছেন বৃদ্ধ? কেন মনে করছেন প্রকাশ করলে মহাপাপ হবে? মেজ মহারাজের মনে হল সেই ব্যক্তি শুধু এই আশ্রমের কিছু ক্ষমতার অধিকারী তো বটেই, ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন মহারাজ। কৃষি প্রকল্পের বদলে আনন্দভবনের দিকেই তিনি এগিয়ে চলছিলেন। পেছনে বৃদ্ধ যে তাঁকে অনুসরণ করে আসছেন তা খেয়াল করেননি। আনন্দভবনের সামনে উপস্থিত জনতা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই সহজ হবার চেষ্টায় তাঁদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেন তিনি। মধুসূদন নামের একটি দরিদ্র আদিবাসী যুবক দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটি প্রকৃত ধার্মিক। আশ্রমের যেকোন উৎসবে সব ফেলে ছুটে আসে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ওদের সম্প্রদায়ে বাবার শিষ্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। মধুসূদন দীক্ষা নিয়েছিল যখন সে শহরে এক ধনীর বাড়িতে কাজ করত। হঠাৎ মেজ মহারাজের মাথায় একটি চিন্তা প্রবেশ করল। তিনি মধুসূদনকে কাছে ডাকলেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

অনুগ্রহ পেয়ে গলে গেল মধুসূদন। মেজ মহারাজের পেছনে সে ঢুকে পড়ল আনন্দভবনে। সেবকদের বাধা মেজ মহারাজের ইঙ্গিতে দূর হল। নির্জনে দাঁড়িয়ে মেজ মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের জাতের মানুষেরা বাবা সম্পর্কে আগ্রহী নয় কেন, মধুসূদন?'

মধুসূদন মাথা নিচু করে কোনক্রমে জবাব দিল, 'কেউ ওদের দীক্ষিত করে না। তাই।'

'তুমি কোন যাজককে অনুরোধ করেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকজন—' হঠাৎ চুপ করে গেল মধুসূদন।

'কি হল? থামলে কেন?'

'আজ্ঞে, ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়ে যাবে।'

'কথাটা শুনিই না।'

'আমরা খুব গরীব। তাই বোধহয়।' মাথা নিচু করেই জানাল মধুসূদন।

'আশ্চর্য! যারা গরীব তারাও তো মানুষ। বাবার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। তাদের আত্মার উন্নতি, জীবনের স্থিতির জন্যেই দীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।' মেজ মহারাজ সোজাসুজি মধুসূদনকে দেখলেন, 'তোমার মধ্যে সবগুণ আছে। ভক্ত হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছ তুমি। তোমাকে যাজক হিসেবে দায়িত্ব দিতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে বসে পড়ল মধুসূদন, 'এত অনুগ্রহ হবে আপনার?'

'ভুল করলে। আমার নয়। বাবার। এখানে যা হয় তা বাবার ইচ্ছেতেই। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কি বিবাহিত?'

'আজ্ঞে না। আমি এত গরীব যে ওই চিন্তাই করি না।'

'আমি তাই জানতাম। অর্থ নেই বলে নিজেকে গরীব ভেব না, অন্তরে তুমি

অনেকের চেয়ে বিত্তশালী। তাছাড়া যাজকপদে উন্নীত হয়ে তুমি যাদের দীক্ষা দেবে, তারা মাসান্তে যে প্রণামী আশ্রমে পাঠাবে তার একটা অংশ তোমার প্রচার কাজের ব্যয় নির্বাহ করতে তুমি পাবে,মনে হয় তাতেই তোমার অভাব দূর হবে। যত দীক্ষা দেবে তত তোমার মঙ্গল হবে। আগামী পূর্ণিমায় আমার কাছে এস। সেদিন আমি তোমাকে নতুন দায়িত্ব দেব।' মেজ মহারাজ হঠাৎ দেখলেন সদর দরজায় একটা ঝামেলা হচ্ছে। সেই বৃদ্ধকে সেবকরা ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। তাঁর মুখে হাসি ফুটল। তিনি সেবকদের নির্দেশ দিলেন তাকে ভেতরে আসতে দেওয়ার জন্যে। প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়ালেন মাথা নিচু করে। তাঁর দিকে খানিক তাকিয়ে মেজ মহারাজ বললেন, 'মধুসূদন, কিন্তু তার আগে তোমার একটা কাজ করতে হবে।'

যাজক হবার সুযোগের আনন্দে মধুসূদন তখন স্বপ্ন দেখছিল। যাজকদের সে দেখেছে। প্রায় প্রত্যেকেই যাজক হবার পর প্রণামীর অংশ পেয়ে সংসারের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। সে যাজক হওয়ামাত্র যদি হাজার দুই মানুষকে দীক্ষিত করতে পারে তাহলে আর চিন্তা নেই। তাছাড়া যাজকদের সম্মানই আলাদা। সে তড়িঘড়ি জবাব দিল, 'আদেশ করুন।'

'এই বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত। এর কন্যাটিকে উদ্ধার করতে হবে বিনা বাক্য ব্যয়ে।'

মধুসূদন লজ্জায় কেঁপে উঠল। কিন্তু বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু ওর জাত, ওর ভাষা!'

মেজ মহারাজ কঠোর স্বরে বললেন, 'বাবার ভক্তের একটি মাত্র পরিচয় সে মানুষ। পূর্ণিমার আগেই কন্যাদান করো। মধুসূদন, তোমার আপত্তি আছে?'

মধুসূদন উঠে দাঁড়াল, 'বিন্দুমাত্র না।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'মেয়েটির কখনও যেন অযত্ন না হয়। সে এই আশ্রমের সেবিকা ছিল। সাধারণ মানুষ যে কাজের জন্যে অপরাধী হয় সে তা থেকে মুক্ত। কোনদিন তাকে অপ্রিয় প্রশ্ন করবে না। পূর্ণিমার আগেই বিবাহ শেষ করবে। তোমরা এস।'

এইসময় বড় মহারাজকে আত্মারামের খাঁচা নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে এগিয়ে গেলেন মেজ মহারাজ, 'ক্ষমা করবেন। ওই বৃদ্ধের সমস্যায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম বলে আমি সময় রক্ষা করতে পারিনি। আত্মারামকে সঙ্গে এনেছেন যে?'

'বাবা দেখতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধের সমস্যা নিয়ে বাবাকে বিব্রত করো না।'

'আজ্ঞে না। তার আর প্রয়োজন হবে না। আপাতত সমাধান হয়েছে।'

'কি রকম?'

'মধুসূদন নামের ওই দরিদ্র যুবকটি বৃদ্ধের কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে।'

'চমৎকার। যুবকটি কি দীক্ষিত?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওকে যাজক করে দাও।'

'সেইরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

'ভাল। এসো।' বড় মহারাজ আত্মারামকে নিয়ে এগিয়ে গেলে মেজ মহারাজ অনুসরণ করলেন।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সঙ্গে বাবার কথাবার্তা হয়েছিল নিভৃতে। তিনি ছিলেন মাত্র পনের মিনিট। কিন্তু খবরের কাগজগুলো এ ব্যাপারে নানান গালগল্প জুড়েছে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত না থাকায় গল্পগুলো পল্লবিত হচ্ছিল। পরে কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেছিলেন, 'নিছক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। আপনাদের রাজ্যমন্ত্রীও তো গতকাল ওঁর কাছে গিয়েছিলেন।' খবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে, তাই নিয়ে হৈচৈ উঠল। দলে দলে সাংবাদিকরা এসেছিলেন আশ্রমে। বাবার সাক্ষাৎ তাঁরা পাননি। মেজ মহারাজকে সেই ধকল সামলাতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল বাবার, রাজ্যমন্ত্রী কেন এসেছিলেন, এইসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ভাল মানুষেরাই তো আরও ভালমানুষের কাছে আসে।' সাংবাদিকদের বিদায় করে সেদিন মেজ মহারাজ যখন বাবার সামনে নতমস্তকে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন, তখন তিনি মৃদু হেসেছিলেন। কোন মন্তব্য করেননি। এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও ওই হাসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই মহামানব কি করে এমন নির্লিপ্ত থাকেন তা মেজ মহারাজের বোধগম্য হয় না। বাবা আজ বসে আছেন বাঘের ছালের ওপর। তাঁর চোখ বন্ধ, শরীরে দোল আসছে। বড় মহারাজ নতজানু হয়ে প্রণাম সেরে উঠে বসতেই বাবা চোখ তুললেন, 'তোমরা আসামাত্র আমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন? কি করেছ তোমরা?'

বড় মহারাজ বিব্রত হয়ে মেজ মহারাজের দিকে তাকালেন, তিনিও প্রণাম সেরে তখন নতজানু। বড় মহারাজ বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'আমরা আপনাতে নিবেদিত। আর কিছু করিনি তো।'

'ওটা কি? পাখি? ও, তোমার সেই পাখি। কি নাম যেন?'

'আজ্ঞে আত্মারাম।' বড় মহারাজ জানালেন।

শিশুর মত হেসে উঠলেন বাবা, 'আত্মারাম খাঁচাছাড়া হতে চায় নাকি? ও আত্মারাম?' সঙ্গে সঙ্গে দুবার ঘাড় ঘুরিয়ে আত্মারাম বলে উঠল, 'নেকু!'

বড় মহারাজের হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এল। চকিতে ঘুরে বসে খাঁচার ওপর দিয়েই তিনি পাখিটিকে প্রহার করতে গিয়ে শেষমুহূর্তে আত্মসংবরণ করে নিলেন। বাবা কিন্তু তাঁকে তিরস্কার করলেন, 'কি করছিলে তুমি? ছি ছি। ওই নির্বোধ প্রাণীকে তুমি প্রহারে শিক্ষিত করছ। আশ্চর্য! বোধ কবে সম্পূর্ণ হবে?' তারপর হাসি ফুটল বাবার মুখে, 'বেশ তো কথা বলে ও, নেকু! ঠিকই বলেছে। সব জেনেশুনে না জানার ভান করে আছি এ পৃথিবীতে। আত্মারাম তো আমার বিবেক।'

বড় মহারাজ দেখলেন আত্মারাম বাবার দিকে লেজ ঝুলিয়ে ঘুরে বসল। এই পাখিটা আগে কখনই খারাপ কথা বলত না। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলেন, 'সুধাময় আমাকে জানিয়েছে ছোটেকে সে কয়েকদিনের মধ্যেই খুঁজে বের করবে।'

'সব অপদার্থ। এদের ওপর আমার আস্থা নেই। আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি

ছোটের সন্ধানের জন্যে।' মেজ মহারাজ চকিতে মুখ তুললেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর চলে যাওয়ার আগে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তাঁকে হাসিমুখে অনুরোধ করেছিলেন বাবার তিন পুত্র অর্থাৎ তাদের তিন ভাই-এর ছবি দিতে। তিনি গত জন্মোৎসবে বাবাকে ঘিরে তোলা তাঁদের একটি গ্রুপ ছবি দিয়েছিলেন। বাবা কি গোপনে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর গোয়েন্দাসংস্থাকে তদন্ত করতে দিয়েছেন ?

বড় মহারাজ কথাটা ধরতে চাইলেন না, 'আমি সুধাময়কে শেষবার সুযোগ দিয়েছি। ছোটেকে নাকি বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ধরতে দেখা গিয়েছে। সে উত্তর বাংলায় এসেছে।'

'খুঁজে বের করো, খুঁজে বের করো।' বাবা অস্থির হয়ে উঠলেন হঠাৎ। বড় মহারাজ মেজ মহারাজের দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে নির্দেশ ছিল বাকিটা বলার জন্যে। মেজ মহারাজ দ্বিধায় পড়লেন। এবার বাবা বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমাদের কিছু বলার আছে। সময় নষ্ট করো না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বড় মহারাজই কথা বললেন, 'ছোটের সঙ্গে প্যান্টসার্ট পরা একটি নারী ছিল। যে নারীর স্বভাবচরিত্র সন্দেহজনক। ছোটের মত সংসারানভিজ্ঞ তরুণ ইতিমধ্যে বিপথে চলে যে যায়নি, তা কে বলতে পারে ?'

'নারীসান্নিধ্য সম্পর্কে তুমি অত্যন্ত কাতর, না ? কিন্তু একমাত্র ছোটেই বলতে পারে সে ঠিক কি করেছে। আমাদের তার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।' বাবা একমুহূর্ত ভাবলেন, 'আমার বিরুদ্ধে সনাতননাথ, আনন্দ সরস্বতী যে চক্রান্ত করছে, তোমরা সেই সম্পর্কে কিছু ভেবেছ ?'

বড় মহারাজ বললেন, 'ধ্যানেশের মৃত্যু নিয়ে তো শোকমিছিল করা সম্ভব ছিল না।'

'শোকমিছিল ! কি হবে করে ? তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানালে সে হাসবে দূরে বসে। এবার আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। ওরা একের পর এক আঘাত হেনেই চলেছে। আমি অপেক্ষা করছি ছোটের ফিরে আসার জন্যে। তার আগে কিছু করাটা ঠিক হবে না। ছোটে জীবিত কিন্তু তাকে ফিরে আসতে না দিলে ওদের সুযোগ বেড়ে যাবে।' বাবা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোন অভাব নেই যার সে কেন এমন ভুল করে কে জানে।'

হঠাৎ বড় মহারাজ বলে ফেললেন, 'কিন্তু অবস্থা যা তাতে ছোটে ফিরে এলে তাকে মহারাজ পদের সম্মান দেওয়ার আগে আপনি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন।'

'কারণ ?'

'দীক্ষার আগে স্ত্রীসংসর্গ এবং অন্যায়ভাবে কৌমার্যমোচন সম্ভবত প্রতিবন্ধক হতে পারে ?' বড় মহারাজ বেশ তেজী গলায় বললেন, যে গলায় তিনি কখনও কথা বলেন না। বিস্ময়ে বাবা তাঁর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় একবার ডানা ঝাপটাবার চেষ্টা করে আত্মারাম বলে উঠল, 'খচ্চর।'

মেজ মহারাজ চমকে উঠলেন। যেন এই ঘরে অ্যাটম বোমা পড়লেও এত অবাক কেউ হতো না। বড় মহারাজের চিবুক নেমে এসেছে তাঁর বুকে। এত লজ্জিত এবং অপমানিত তিনি কখনও হননি। আফশোসে তিনি দিশেহারা। কি দুর্মতি হয়েছিল তাঁর, না হলে এই হতচ্ছাড়া পাখিটাকে বাবার কাছে নিয়ে আসেন। অথচ এই পাখি গত সাতদিনে কোন ইতর শব্দ বলেনি। আজ অবশ্য

উকিলাকে একবার নেকু বলেছিল। কিন্তু ওই কতকাল আগে শোনা খচ্চর শব্দটাকে এই মুহূর্তে উগরে দেবে কে জানত। তিনি বাবার গলা শুনতে পেলেন, 'তোমরা এখন যাও। আমি বিশ্রাম করব। আর হ্যাঁ, আত্মারাম এখন থেকে আমার কাছে থাকবে। বড় সত্য কথা বলে ও।' মেজ মহারাজ চকিতে বাবাকে দেখলেন। বাবা নির্লিপ্ত। তিনি বেরিয়ে আসার সময় বড় মহারাজের দিকে তাকালেন। স্বস্তির চিহ্ন সেখানে। বাইরে বেরিয়ে এসে বড় মহারাজ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ডুবিয়ে দিয়েছিল পাখিটা। খুব জোর বেঁচে গেছি!' মেজ মহারাজ আর একবার অবাক হলেন মানুষটির নির্বুদ্ধিতায়।

'আপনি ঘুমাবেন না?' বিছানার একপাশে টানটান শুয়ে প্রশ্ন করল লাবণ্য। ওদের রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে সাড়ে আটটায়। নির্মল চুপচাপ বসেছিল চেয়ারে। মাথা নেড়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসছে না।'

'আমি আবার আলো জ্বললে ঘুমাতে পারি না।'

'ওহো। সরি।' নির্মল উঠে সুইচ অফ করতে যাচ্ছিল।

'কিন্তু আপনি শোবেন কোথায়?'

মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্মল, 'তাই তো! ঠিক আছে, আমি একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

'কি করবেন? তার চেয়ে বলি, মেয়ে হয়েই বলছি, সাধুত্ব হারাবার ভয় যদি না থাকে তাহলে এই চওড়া বিছানার একধারে শুয়ে পড়ুন, আমি বিরক্ত করব না।'

লাবণ্য হেসে ফেলল। নির্মল বলল, 'কি আশ্চর্য! আপনি খামোকা বিরক্ত করতে যাবেন কেন? ঠিক আছে, আমি একপাশে শুয়ে পড়ব।'

'খামোকা কি কেউ কাউকে বিরক্ত করে? ধরুন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। জীবনে কখনো কোন পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুইনি। আজ পছন্দসই পুরুষকে এরকম নির্জন রাত্রে চাবাগানের আউটহাউসের বিছানায় পেয়ে আমার অন্যরকম ইচ্ছে হল। সেই ইচ্ছেটাকে খামোকা বিরক্ত বলবেন?' অপাঙ্গে তাকাল লাবণ্য। আর সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল নির্মল। এরকম কাঁপুনি এ-জীবনে কখনও টের পায়নি সে।

'আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে, খুশি হলাম, কিন্তু আপনার সবকিছু আমার পছন্দ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা সমান হল না।' নির্মল বলল।

হাসি নিভে গেল লাবণ্যর, 'ও।'

'তাছাড়া আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে আদর্শহানি হয়।'

'আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন, না?'

'না তো!'

'হঠাৎ এমন জ্ঞান দিতে শুরু করলেন যে!' পাশ ফিরে শুলো লাবণ্য, 'শুয়ে পড়ুন, আপনার চরিত্র অটুট থাকবে।'

আলো নিভিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল নির্মল। এখন রক্তে তিরতিরানিটা রয়েছে। এই দুদিনে লাবণ্য কখনও ওই চোখে তাকায়নি। সে কাচের জানলার বাইরে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করল। কোথাও কোন আলো নেই। ব্যানার্জি সাহেবের বাংলো অন্ধকারে ঢাকা। রাত্রে চৌকিদারটা যখন খাবার নিয়ে এল

তখন সে নির্মলকে সাহেব আর লাবণ্যকে মেমসাহেব বলছিল। লোকটা নির্ঘাৎ ভেবেছে তারা স্বামী-স্ত্রী। খবরটা যদি আশ্রমে পৌঁছায় তাহলে তার পেছনে লাগা ফেউগুলো সরে যাবে। কানাই বলেছিল বাবার বাহিনী তাকে খুঁজে পেতে তোলপাড় করছে কলকাতা। খবরটা আজ না হোক পরশু পৌঁছবেই। কিন্তু উল্টোটা যদি হয়। ধর্ম নিয়ে যারা দিনরাত থাকে তাদের মনে উদারতা, ভক্তিভাবের প্রাবল্যের পাশাপাশি একটা রক্ষণশীল নিষ্ঠুরতা সক্রিয় সবসময়। সে আশ্রমের সম্মান নষ্ট করেছে, এই অপরাধে বাবা কি তাকে শাস্তি দেবেন ? বড় মহারাজ তো কিছুতেই মানতে পারবেন না।

নির্মল আর ভাবতে পারছিল না। সে অন্ধকার হাতড়ে বিছানার একটা পাশে চলে এল। সতর্কভঙ্গীতে শরীর এলিয়ে দিতেই যেন আরাম নেমে এল সর্বাঙ্গে। এবং তারপরেই অন্ধকার ঘরে লাবণ্যর নিঃশ্বাসের শব্দ কানে বাজল। একমুহূর্ত সেটা শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম আসছে না ?'

প্রায় হাত দেড়েক দূরে শোওয়া লাবণ্য বলল, 'এসেছিল, চলে গেল।'

'কেন ?'

'আপনার বাণীতে। আমার রসিকতা নিশ্চয়ই মাত্রা ছাড়িয়ে ছিল।'

নির্মল জবাব দিল না। কিন্তু জীবনে প্রথমবার একই বিছানায় কোন নারীর সঙ্গে শোওয়ার অস্বস্তি ক্রমশ প্রবল হতে লাগল। শরীরের প্রতিটি শিরায় যেন অস্বস্তি পাক খাচ্ছে। সে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজল।

পিঠের ওপর নরম আঙুলের আলতো ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল নির্মলের। চোখ বন্ধ রেখেই সে লাবণ্যর স্পর্শ টের পেল। এবং তখনই খুব চাপা গলায় লাবণ্য ডাকল, 'শুনছেন। নির্মল ?' নির্মল পাশ ফিরল, 'কি ব্যাপার ?'

আর তখনই জানলায় শব্দ হল। কেউ যেন কাচের ওপর আঙুলের শব্দ তুলছে। নির্মল মাথা তুলল। বাইরেটা দৃষ্টির আড়ালে। লাবণ্য প্রায় তার কাছে ঘেঁষে এসেছে। অদ্ভুত মায়াময় গন্ধ আসছে ওর শরীর থেকে। লাবণ্য বলল, 'মিনিট দুয়েক ধরে কেউ ওই জানলায় শব্দ করে যাচ্ছে। রাত এখন একটা। আপনার ঘুম ভাঙাতে পারছিলাম না।' উঠে বসল নির্মল, 'কে বলুন তো ? চৌকিদার নয় তো ?'

'চৌকিদার হলে তো ডাকাডাকি করত। দরজাটা খুলবেন ?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই লোকটার প্রয়োজন আছে।'

বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বাললো নির্মল। একবার জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। লাবণ্য ততক্ষণে উঠে বসেছে। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলতেই সে একটি লোককে সামনে দেখতে পেল। তারপর দ্বিতীয়জনকে তারার আলোয় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

'নমস্তে। আপনি তো আজ এই বাগানে প্রথম এসেছেন ?' লোকটা বাংলা বলছিল হিন্দি জড়িয়ে। লম্বায় বেশি নয়। স্বাস্থ্য ভাল। নির্মল মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমি ঘরে ঢুকতে পারি ?' লোকটা প্রশ্ন করতেই নির্মল জবাব দিল,

'আসুন।'

ঘরে ঢোকার আগে লোকটা বাইরে দাঁড়ালো, সঙ্গীকে হাত নেড়ে ইশারায় কিছু বলল। নির্মল এক পলকে ওই পাতলা অন্ধকারে যেন লোকটার হাতে কোন অস্ত্র দেখতে পেল। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লোকটা বলল, 'আমি এত রাত্রে এলাম খুব খারাপ লাগছে। আমার নাম প্রধান। আপনি আমার মাকে চাবাগান থেকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন বলে আমার ধন্যবাদ নিন। আমি কৃতজ্ঞ, তাই জানাতে এলাম।'

'উনি আপনার মা হন?'

'ইয়েস।' লোকটা হাসল, 'আন্দোলনের জন্যে আমি ঘরছাড়া, কিন্তু এই শালা হাসপাতাল তো মুরগির খাঁচা। ট্রিটমেন্টভি হয় না। শুনলাম, আপনি সন্ধ্যের পর আবার আমার মাকে দেখতে গিয়েছিলেন, কেন?'

নির্মল বলল, 'উনি কেমন আছেন জানতে ইচ্ছে করছিল।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! চাবাগানের কুলিকামিনদের শরীর খারাপ হলে ম্যানেজার তো দূরের কথা, বাঙালিবাবুরাও খবর নেয় না।' লোকটা নির্মলকে ভাল করে দেখল, 'লাইনের লোকজন যারা আপনাকে দেখেছিল তারা দেওতা দেওতা করছিল। আপনার চেহারাটা রামায়ণের হিরোর মতন। এ বাগানে কেন এসেছেন?'

নির্মল বলল, 'এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার!'

'ব্যানার্জিসাহেব আপনাদের কেউ হয় না বুঝতে পারছি, কারণ আপনাদের আউট হাউসে পাঠিয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মায়ের উপকার করেছেন বলে একটা পাল্টা উপকার করছি। যে ধান্দায় আপনি এখানে এসে থাকুন, এখনই বাগান ছেড়ে চলে যান। আমার সঙ্গে আসুন। একটা জায়গায় রাত কাটিয়ে সকালে বাস ধরবেন।'

'কেন?' নির্মল না, লাবণ্য প্রশ্নটা করে ফেলল।

'আপনাদের ভাল হবে তাতে।' হঠাৎ লোকটার মুখ শক্ত হয়ে গেল।

নির্মল বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি চাই না আপনাদের কোন ক্ষতি হোক। আপনার নামও আমি জানি না। কিন্তু আপনি আমার মায়ের উপকার করেছেন। এইটা আমি মনে রাখছি।'

'ধন্যবাদ। আমার নাম নির্মল, এর নাম লাবণ্য। মানুষ হিসেবে যে কাজটা না করলেই নয় সেটাই আপনার মাকে দেখে করেছি। কিন্তু ক্ষতির কথা কি বলছিলেন? আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে?' নির্মল সন্দেহের চোখে তাকাল। লোকটা ইনফরমার নাকি? এবং তখনই বিকেলে বাগানে ঢোকার মুখে দারোয়ানটির কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'মনে পড়ছে। আপনার মাকে নিয়ে যখন বাগানে আসছিলাম তখন একজনের কাছে আপনার কথা শুনেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সচকিত হয়ে উঠল, 'কার কাছে? কি নাম?'

'জানি না। এখানে আমরা নতুন। কাউকে চিনি না। আমি শুনেছিলাম দার্জিলিং-এই আপনারা আন্দোলন করছেন। আন্দোলন ঠিক না বেঠিক এ নিয়ে কোন কথা বলছি না। কিন্তু এই ডুয়ার্স অঞ্চলে ওই আন্দোলন করার কি কোন কারণ আছে?'

Pathagar.net

'নিশ্চয়ই । প্রথমত, আমাদের ভাইবোন দার্জিলিং-এ মার খাচ্ছে, আর আমরা এখানে বসে থাকতে পারি না চুপ করে । তাছাড়া ডুয়ার্স ছিল ভুটানিদের । ব্রিটিশরা লিজ নিয়েছিল । এই জায়গা ছিল কোচ রাজবংশী আর পাহাড়িদের । বাঙালিরা এখানে এসেছে চাকরির ধান্দায় । তাদের দেশ এটা নয় । এখানকার মাটি চাষ করে যারা, চা বাগানে পাতি তোলে যারা,তাদের ষাটভাগ পাহাড়ি আর চল্লিশভাগ রাচী-সাঁওতাল পরগনার লোক, যারা একশ-দেড়শ বছর আগে এসেছিল, যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই । কিন্তু আমরাই এখানে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত । ছেড়ে দিন এসব কথা । আজ রাত তিনটের সময় হাইওয়ের ওপাশে যে ফরেস্ট বাংলো আছে, তা পুড়িয়ে দেওয়া হবে । সেইসঙ্গে এই আউট হাউসটাও ।'

'পুড়িয়ে দেবেন ? কেন ?' হতভম্ব হয়ে গেল নির্মল ।

'আউটহাউসটা পোড়ানো হবে কারণ বাগানের মালিককে আমরা একটা ওয়ার্নিং দিতে চাই । আপনি আমার মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাই আমি সতর্ক করে দিচ্ছি এখনই এই ঘর ছেড়ে যেতে ।' উঠে দাঁড়াল প্রধান, 'আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন ?'

নির্মল লাবণ্যর দিকে তাকাল । তার মুখ শক্ত । লাবণ্য বলল, 'মিস্টার প্রধান, আপনি আর পাঁচটা মিনিট বসতে পারবেন ?'

প্রধান দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল । তারপর ফিরে এসে বলল, 'কি ব্যাপার ?'

'আপনারা আন্দোলন করছেন নিজেদের অধিকার পাকা করতে । কিন্তু এই যে একটার পর একটা সরকারি বাড়ি, বিশেষ করে ফরেস্ট বাংলো পোড়াচ্ছেন, এতে কার লাভ হচ্ছে ? সরকারের ক্ষতি করা মানে জনসাধারণের ক্ষতি করা । তাছাড়া যদি আপনারা সফল হন, এইসব সম্পত্তি থেকে নিজেদেরই বঞ্চিত করবেন না কি ?' লাবণ্য সরাসরি জিজ্ঞাসা করল ।

'আপনি তো সরকারের মত কথা বলছেন । ভারতবর্ষের কাগজগুলো রোজ যেসব খবর ছাপছে তাতে মনে হয় আন্দোলনটা যেন শুধু দার্জিলিং-এই হচ্ছে । বাগরাকোট, ওদলাবাড়ি,সামসিং থেকে আরম্ভ করে হাসিমারা পর্যন্ত ডুয়ার্সটায় যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সেই খবর কেউ ছাপে না । বাংলো পুড়িয়ে দিলে আবার হবে কিন্তু এইসব না করলে খবর ছাপবে না ।'

প্রধান হাসল, 'আপনাদের সঙ্গে কোন পার্টির সম্পর্ক ? সি পি এম ?'

লাবণ্য মাথা নাড়ল, 'না । আমরা সি পি এম,কংগ্রেস কিংবা নকশাল নই । আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই । কোন পার্টির ব্যানারে নয় ।'

'এটা আবার কিরকম ধান্দা ? শুনুন, আমাদের এলাকায় জি এন এল এফ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না । ওসব সঙ্গে থাকার মতলব ছাড়ুন ।'

'আপনাকে তো বললাম কোনরকম রাজনৈতিক প্রচার আমরা করব না । আপনার মা চা গাছের পাশে পড়ে ছিলেন । ওঁকে হসপিটালাইজড্ করে নিশ্চয়ই অন্যায় করিনি ?'

প্রধানের ঠোঁট মোচড় খেল, 'রেডক্রশ ?'

'সেইরকমই ।'

'দেখুন, আপনাদের সাবধান করে দিলাম, রিস্ক নেবেন তো নিন। কোন কিছুর ধান্দা ছাড়া কেউ পাবলিকের জন্যে কিছু করে না। আপনাদের বিশ্বাস করা মুস্কিল। যাহোক, আউট হাউস ছেড়ে দিন। সময় আর বেশি নেই। আমরা কাউকে জ্যান্ত পোড়াতে চাই না। একশ'র ওপর বাংলো পুড়িয়েছি কিন্তু কেউ এই বদনাম দেবে না।' প্রধান দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

লাবণ্য নির্মলের দিকে তাকাল। নির্মল মাথা নাড়ল, 'এসবের কোন মানে নেই। এই আউট হাউস পুড়িয়ে আপনারা কিছুই লাভ করবেন না। এটা একদমই বোকামি। পোড়াতে গেলে আমাদের কেন বাদ দেবেন? আপনারা গেরিলা যুদ্ধ করছেন, কিন্তু এটা কি ধরনের যুদ্ধ?'

প্রধান কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা যাবেন না?'

'না।'

'তাহলে আমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু কাউকে কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। সেরকম কিছু করলে এই এলাকা থেকে কোনদিন বেরুতে পারবেন না।' প্রধান আর দাঁড়াল না। নির্মল দরজাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোকটা এসেছিল কৃতজ্ঞতা জানাতে, গেল হুমকি দিয়ে।'

'কিন্তু ওরা যদি আগুন ধরিয়ে দেয় এখানে, কিছু একটা তো করা উচিত?'

নির্মল হাসল, 'এখন আর ঘুম আসবে না। আপনি শুয়ে থাকুন, তেমন বুঝলে আপনাকে ডেকে দেব। জ্যান্ত রোস্ট হতে আমারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

লাবণ্য চোখ বন্ধ করল। ঘুম তারও আসবে না। জীবনে প্রথম রাত কোন পুরুষের সঙ্গে একঘরে কাটাচ্ছে সে।

নির্বাচনে শাসকদল বিপুল সংখ্যাধিক্য পাওয়ায় সরকার গড়তে কোন **অসুবিধে হল** না। পুনঃনির্বাচিত রাজ্যমন্ত্রী ময়দানে বিরাট জনসভা করলেন বিজয়োৎসব পালন করতে। সেখানে তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষের মানুষ চিরকালই অন্যায়কে বর্জন করেছে, ন্যায়ের গলায় মালা পরিয়েছে। আমরা আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করেছি, করব। একমাত্র বিভেদকামী শক্তিছাড়া আর কারো সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। পশ্চিমবাংলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনা স্বচ্ছ। আমাদের বেছে নিয়ে আপনারা প্রমাণ করেছেন যেসব ব্যক্তি ধর্মের নামে মানুষকে উসকে দেয় তাদের কোন গুরুত্ব নেই। ধর্মগুরুরা আছেন, থাকবেন। তাঁরা তাঁদের কাজ শান্তিতে করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। এইমুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদলের কোন অস্তিত্ব নেই।'

কিন্তু যে খবর রাজ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছয়নি তা জেনে গেছেন সুধাময় সেন। নির্দিষ্ট সময়ে ছোটে মহারাজকে খুঁজে বের করতে পারেননি তিনি। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি শহরে কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় বড় মহারাজ তাঁকে বলেছেন, সন্ধান করতে হবে না। ছোটে মহারাজ সম্পর্কে বাবার আর কোন আগ্রহ নেই। সেইসঙ্গে সুধাময় আর একটি জিনিস লক্ষ করলেন। তাঁর কয়েকজন বড় পার্টি কন্ট্র্যাক্ট তুলে নিচ্ছে। অনেক বড় কোম্পানির সিকিউরিটির দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়। এজন্যে ভাল টাকা

pathagar.net

পাওয়া যাচ্ছিল। সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা। সেই পর্যায়ে পৌঁছবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুধাময় জানেন, বাবার কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালে কোন লাভ হবে না। হয়তো পৌঁছতেই পারবেন না সেখানে। তাছাড়া অসফল মানুষকে বাবা কখনই কৃপা করেন না।

একই অবস্থা ইউনিসের। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর পুলিশ তাকে হয়রানি করেই চলেছে। একটার পর একটা কেস তার ওপর চাপানো হচ্ছে। আশ্রমের সাহায্য চেয়ে বারংবার দরবার করে কোন কাজ হচ্ছে না। এবং তাকেও বড় মহারাজ জানিয়ে দিয়েছেন ছোটে মহারাজকে খুঁজতে হবে না আর। ব্যর্থতা বাবা ক্ষমা করেন না। ইউনিস জানে। কিন্তু ধ্যানেশকে যারা মারল, তাকে যারা এতদিন বিছানায় শুইয়ে রাখল,তাদের কোন শাস্তি হল না কেন? সুস্থ হবার পর ইউনিস চামচেদের নিয়ে নেমে পড়েছিল আততায়ীদের সন্ধানে। যারা সেদিন গুলি চালিয়েছিল তাদের সন্ধান পেয়েছিল একমাস পরে। দুটো লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল কৃষ্ণপুরের খালে। ধ্যানেশের মৃত্যু নিয়ে খবরের কাগজে খুব হৈচৈ হয়েছিল। এক জোড়া মৃতদেহ পাওয়ার পর সেটা সমাজবিরোধীদের দলীয় ঝগড়ার ফল বলে লেখা হল। এবং তার ঠিক সাতদিন পরে সনাতননাথের আশ্রমের সামনে বোমাবর্ষণ হল। সনাতননাথের প্রধান শিষ্য শ্রীনাথ তখন একটা লাল মারুতিগাড়িতে চেপে বের হচ্ছিলেন। গাড়িটা গুঁড়িয়ে গেল। রক্তাপ্লুত শ্রীনাথকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। আততায়ী ধরা পড়ল না।

অঙ্কটা সমান হয়ে যাওয়ার পর ইউনিস ভেবেছিল বাবার আশীর্বাদ পাবে। যাকে ওই কাজ করতে পাঠিয়েছিল তাকে পাকিস্তানে চালান করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্রম থেকে তার জন্যে অভিনন্দন তো দূরে থাক, কোন যোগাযোগ করল না কেউ। ইউনিস এইসময় সুধাময় সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। নিঃসঙ্গ সুধাময় ইউনিসকে পেয়ে স্বস্তি পেল। তারা দুজনেই স্থির করল, যে করেই হোক ছোটে মহারাজকে খুঁজে বের করবেই। একমাত্র ওঁকে খুঁজে নিয়ে বাবার কাছে গেলেই অবস্থা আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কানাই-এর সূত্র আগেই পাওয়া গিয়েছিল। প্যান্ট পরা মেয়েবন্ধু কানাই-এর বেশি না থাকায় লাবণ্যর খবর জানা গেল। ছোটে মহারাজ যখন উধাও হয়েছেন লাবণ্য তখন থেকেই আর বাড়িতে থাকছে না। সুধাময় লাবণ্যর বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। অর্থবান এই মানুষটি কখনও মেয়েকে শাসন করেননি। তিনি মনে করেন লাবণ্য কোন অন্যায় করতে পারে না। সে গিয়েছে দেশের মানুষের জন্যে কাজ করতে। কোন রাজনৈতিক চালু দলের আদর্শে তার বিশ্বাস নেই। সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানুষের বিশ্বাস অর্জন না করা পর্যন্ত ওরা একত্রিত ঘোষণা করবে না। দীর্ঘসময় আলোচনার পর সুধাময় এটুকু জানতে পারলেন। তাঁর ধারণা হল বৃদ্ধ মিথ্যে বলছেন না।

ইউনিস সেটা মানতে নারাজ। তার ধারণা, মেয়ে উগ্রপন্থী রাজনীতি করছে। কানাই এবং ছোটে মহারাজ সেই একই দলের সদস্য। বৃদ্ধকে চাপ দিলে মেয়ের হদিস পাওয়া যাবে। সুধাময় তাকে কাজটা করতে নিষেধ করলেন। দীর্ঘদিনের পুলিশের চাকরি তাঁকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল তাতে তিনি স্পষ্ট বুঝতে

পারছিলেন একটা অন্যরকম ঘটনা নিঃশব্দে ঘটছে। পশ্চিমবাংলার কোথাও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে না। এমন কি ডুয়ার্সের ওপরের দিকে জি এন এল এফের আক্রমণ এখন বেশ স্তিমিত। ইউনিসকে নিয়ে তিনি সোজা উত্তরবঙ্গে চলে এলেন। শহর নয়, ট্যাক্সি নয়, শিলিগুড়ি থেকে বাসে বাসে চষে বেড়াতে লাগলেন চা-বাগান অঞ্চল।

কানাই জানিয়েছিল, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গোপন বৈঠকে স্থির করেছেন দুশ চুরানব্বইটি বিধানসভার আসনভিত্তিক এলাকার জন্য নির্বাচিত কর্মীরা আরও ব্যাপকভাবে যেন কাজ শুরু করেন। আপাতত অর্থের সাশ্রয় কম। সাধ্যের মধ্যে প্রত্যেককে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারে। এবং কোন অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়া চলবে না। নেতৃত্ব আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, নির্মলের ডুয়ার্সের চা বাগান অঞ্চলে জনপ্রিয়তার কারণে সেখানেই কাজ করে যেতে হবে। লাবণ্যর সঙ্গে এলাকা সে যেন ভাগ করে নেয়।

বিশেষ কারণেই কানাই এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেদের গোপন রেখেছেন। তাঁরা সাধারণের সামনে কোনরকম রাজনৈতিক পরিচয় রাখছেন না। কানাই এখনও আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেটা নিজের প্রয়োজনে যতটা নয় তার থেকে অনেক বেশি নির্মলের কারণে।

সকালবেলায় নির্মল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। এখানে স্ট্যান্ড বলতে হয়তো কোন একটি বিশেষ গাছ নির্দিষ্ট করা। তার চেহারায় একটা তামাটে ছাপ পড়েছে। পোশাকও মলিন। রিয়াবাড়ি চা বাগান থেকে চলে আসার পর বেশ কয়েকটা জায়গা ঘুরে এখন সে আশ্রয় নিয়েছে লঙ্কাপাড়া বাজারে। সানু ব্যানার্জি ফিরে আসার পর ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা আমার কাছে অতিথি হিসেবে থাকতে পারেন কিন্তু কুলিকামিনদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। এতে আমার চাকরি চলে যাবেই।' প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইরাত্রে কাঁটা হয়ে বসে থেকেও আউটহাউসে কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। কিন্তু ফরেস্ট বাংলোটা জ্বলে গিয়েছে বলে পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল। মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে সেই সকালে দেখা হয়নি। ওরা দুজনে বেরিয়ে গিয়েছিল চা খেয়ে। সেদিন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। নির্মল কুলিলাইনের যেখানেই গিয়েছে সেখানেই ভিড় জমে গিয়েছে তাকে ঘিরে। গরীব অশিক্ষিত মানুষগুলো তাকে ঘিরে চিৎকার করছিল দেওতা দেওতা বলে। নির্মল এবং লাবণ্য দেখল মানুষগুলো ন্যূনতম চিকিৎসা এবং বেঁচে থাকার বেশির ভাগ সুব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। হয়তো সেই সকালেই এই তল্লাটের মানুষ ভালবেসে ফেলেছেন নির্মলকে।

বাস থামামাত্র নির্মল হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল ভেতর থেকে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। ছাদ তো বটেই, পেছনের সিঁড়িতেও মানুষ বাদুড়ের মত ঝুলছে। কিন্তু কন্ডাক্টরও উদ্যোগ নিল ওকে ভেতরে জায়গা করে নিতে। এখন নির্মল এইরকম ব্যবহারে অভ্যস্ত। মানুষের অনাবিল ভালবাসা পাচ্ছে সে। ভারতীয় রাজনৈতিক পার্টিগুলো এখানে সক্রিয়

নয় কিন্তু যারা সক্রিয় সেই জি এন এল এফ পর্যন্ত নির্মলকে কোন বাধা দেয়নি আর। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রধান মারা গিয়েছে এর মধ্যে। অথচ নির্মলকে আঁকড়ে ধরেছে প্রধানের মা। যতই উগ্র এবং বেহিসাবী রাজনীতি কেউ করুক না কেন, নিঃস্বার্থপর মানুষকে অসম্মানিত করার কথা চট করে কেউ ভাবে না। নির্মল ওপরে ওঠার আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে পাদানিতেই দাঁড়িয়ে রইল। বীরপাড়ায় বাস ঢুকতেই সে নেমে পড়ল। এলাকার জন্যে যেন কয়েকটা কাজ নিয়ে সে এসেছে। জি এন এল এফের ভয়ে কোন সরকারি কাজকর্ম ওদিকে হচ্ছে না। ঘটনা যা ঘটেনি তার চেয়ে গুজব এত বেশি ছড়িয়েছে,কিছু কর্মচারি ভয়ে সেটাকেই অছিলা করে কাজ বন্ধ করে রয়েছে। বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই দুটো মানুষকে দেখতে পেল নির্মল। এরা বীরপাড়ায় নতুন। লোকদুটো পরস্পরকে দেখে নিয়ে সামনে এগিয়ে এল। ফর্সা বয়স্ক ভদ্রলোক নমস্কার করলেন বেশ সমীহ নিয়ে, 'নমস্কার ছোটে মহারাজ। আপনার দর্শন পাওয়ার জন্যে আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছি। উফ্। আপনার, আপনার একি অবস্থা হয়েছে?'

'আপনাদের পরিচয় জানতে পারি?' নির্মল অত্যন্ত বিরক্ত হল।

'আজ্ঞে আমি সুধাময় সেন, আর ইনি ইউনিস। আমরা বাবার অনুগত শিষ্য।'

'আমাকে কি দরকার?'

'আজ্ঞে, আপনার অনুপস্থিতিতে বাবা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন আপনাকে খুঁজে বের করতে। আসলে নির্দিষ্ট সময়ে আপনাকে খুঁজে বের করতে পারিনি বলে তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' সুধাময়ের খুব আনন্দ হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি সাফল্য পেলেন। এবার বাবার কোন ক্ষোভ থাকবে না তাঁর ওপর।

'এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। আমি আশ্রম ত্যাগ করেছি। এখানে আমাকে বিরক্ত করবেন না।' আচমকা কথা শেষ করে নির্মল তার পথ ধরল। ইউনিস কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুধাময় তাকে বাধা দিলেন। তিনি ইউনিসকে নির্দেশ দিলেন দূরে থেকে ছোটে মহারাজকে অনুসরণ করতে। সেই সুদর্শন তরুণের এখনকার সঠিক অবস্থা তিনি আগে জানতে চান। কিন্তু সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। বাবার ছেলের পক্ষে আশ্রমকে অস্বীকার করা আর কোন যুবরাজের ইংলন্ডের রাজসিংহাসন ত্যাগ করা মোটামুটি একই ব্যাপার।

সরকারি কর্তাদের বুঝিয়ে স্পটে নিয়ে যেতে পারা আর হিমালয়কে নড়ানো প্রায় এক ব্যাপার। পাহাড়িদের আন্দোলন না থামা পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব নয়। প্রাণ হাতে করে ওখানে কাজ করা অসম্ভব। যে রেটে ফরেস্ট বাংলো পোড়াচ্ছে তাতে সরকারি কর্মচারি দেখতে পেলে হয়তো জ্যান্তই পুড়িয়ে ফেলবে। নির্মল তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করল, যারা আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তারা সমগ্র জনসাধারণের পাঁচ শতাংশ। বাকি পঁচানব্বই ভাগই কিন্তু শান্তিকামী। সে শুনেছে কলকাতা শহরকে একসময় নকশালরা আতঙ্কিত এলাকায় ভাগ করে ফেলেছিল। সন্ধ্যের পর কোন মানুষ সেইসব এলাকায় হাঁটাচলা করতে চাইত না প্রাণের ভয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিনের বেলায় মানুষ অফিস, ব্যবসা করেছে।

বোমা ফাটার পাঁচ মিনিট পরে মানুষ একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। তাহলে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ভয়ে সাধারণ মানুষের উপকার হবে, এমন কাজ থেকে সরকারি কর্মীরা কেন বিরত থাকবেন ? রাস্তার প্লানটা যখন অনুমোদিত হয়েই আছে তখন বর্ষা নামবার আগে সেটা শুরু এবং শেষ করা উচিত। বিডিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুটি নলকূপ চা বাগান এলাকার ঠিক বাইরে তৈরি করে দেওয়া হবে। যে সমস্ত মানুষ চা বাগানে কাজ করেন না তাঁরা জলের অভাবে বড় বিপাকে পড়েছেন। পাহাড়ি ঝরণার জল খেয়ে ওই এলাকায় ইদানিং পেটের অসুখ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসব কথা বলতে এসে প্রথম প্রথম যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হত তা হল, আপনি কোন পার্টির লোক ? যেই ওঁরা শুনলেন যে নির্মল কোন পার্টির সমর্থক বা কর্মী নয় অমনি অবিশ্বাসের চাহনি আসত চোখগুলোতে। ঘরের খেয়ে কেউ বনের মোষ তাড়ায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁরাও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে আরম্ভ করেছেন। খবরটা পৌঁছেছে পার্টি অফিসগুলোয় যারা সরতে সরতে জি এন এল এফ অধ্যুষিত এলাকার বাইরে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাচ্ছে। ইতিমধ্যে নির্মলের কাছে দুই বিপরীত মানসিকতার পার্টি তো বটেই, বামফ্রন্টের শরিকদলগুলো থেকে আলাদা করে প্রস্তাব এসেছে তাদের হয়ে কাজ করতে। কি ভাবে রটে গিয়েছে নির্মলকে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে বাধা দিচ্ছে না পাহাড়ি আন্দোলনকারীরা।

মালবাজারের ওপাশে লাবণ্য কিন্তু ঠিক এই সহায়তা পায়নি। ওখানে, বাগরাকোট-ওদলাবাড়ি এলাকায় প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে জি এন এল এফের সংঘর্ষ হচ্ছে। দুই-একজন করে প্রায় মারা যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ আরও ভীত হয়ে পড়েছে। লাবণ্য আশ্রয় পেয়েছিল বালুরঘাটের সুদীপ মণ্ডলের এক আত্মীয়র বাড়িতে, যিনি চালমায় মাস্টারি করেন। চালমার পার্টি অফিস এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। প্রায়ই তাদের সঙ্গে জি এন এল এফের জায়গা দখলের লড়াই হচ্ছে। সামসিং থেকে চাপড়ামারি আজ এর কাল ওর। এই অবস্থায় কাজ করতে গিয়ে দুই পক্ষ থেকে শাসানি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। সেই সঙ্গে সন্দেহ। রাতারাতি কিছু করা অসম্ভব হলেও হাতে যেহেতু সময় আছে, লাবণ্য দাঁত কামড়ে পড়ে আছে সেখানে। হয়তো মহিলা বলেই এখনও সে কিছুটা কাজ করে যেতে পারছে। কিছু কিছু মানুষ তার ওপর ভরসা করতে শুরু করেছে। এইসময় নির্বাচনে শাসকদল জয়ী হল। জলপাইগুড়ি জেলায় বিরোধীপক্ষ যেন পাতার মত ঝড়ের দোলায় উড়ে গেল। সাধারণ মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর করলে আজকাল ভোটে জেতা যায় না। এলাকার মানুষেরা কেউ ভালবেসে ভোট দেয়নি। যারা দিয়েছে তাদের একাংশ ভয়ে, একাংশ অভ্যেসে, একাংশে জি এন এল এফের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সংগঠিত দলকে সমর্থনের জন্যে ব্যালটে ছাপ মেরেছে। এরপরেও আজকের ভারতবর্ষে যেটা নিতান্তই সত্য বলে স্বীকার করতে হবে সেটা হল ভোটের দিন যে রাজনৈতিক দল সংগঠন শক্তিতে ক্ষমতাবান, যারা পুলিশকে কতটা নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম তার ওপর জেতা-হারা নির্ভর করে। শাসক দলের কাছে বিরোধীরা কোন অবস্থাতেই হালে পানি পাবে না নিজেদের অপদার্থতার কারণে। কিছুদিন থেকেই লাবণ্য যে অভাবটা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিল, তা হল

অর্থের। ইতিমধ্যে সে একটা ছোটখাটো সংগঠন তৈরি করতে পেরেছে। কিছু অরাজনৈতিক ছেলেমেয়েকে নিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এলাকার বিত্তবান মানুষেরা শাসকদল, বিরোধী দল এবং পাহাড়ি আন্দোলনকারীদের চাঁদা দিয়ে এমন জর্জরিত যে, তাদের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দু-একটা ছোটখাটো ঘটনা লাবণ্যকে উৎসাহিত করেছে। সামসিং-এর কাছাকাছি একটি প্রাইমারি স্কুল আন্দোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাতিল হয়েছিল। লাবণ্যরা সেই স্কুলটিকে কোনমতে মেরামত করে আবার চালু করার চেষ্টা করছিল। গ্রামের বাচ্চাদের পাঠানোর জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কিছু বাচ্চা এলে তাদের ভাঙা বারান্দায়, সামনের মাঠে বসে পড়ানো শুরু হল। এইসময় হঠাৎ মেটেলির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনি দশহাজার খাকা খরচ করে স্কুলটির চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। লাবণ্যর বিশ্বাস হল কোন সৎ প্রচেষ্টা যখন টাকার অভাবে আটকে যায়, তখন কিছু কিছু মানুষের বিবেক আক্রান্ত হয়।

চালসা থেকে সোজা বীরপাড়ায় চলে এল এক দুপুরের বাস ধরে লাবণ্য। এখন সে প্যান্ট আর সার্টের ওপর ভরসা রেখেছে। শাড়ি ব্যবহার করলে অনেক পরিস্থিতিতে তাকে ঝামেলায় পড়তে হত। জিনসের প্যান্টের মজা হল হাজার ময়লা হয়ে গেলে অথবা রঙ চটে গেলেও চট করে বোঝা যায় না। সুবিধেটুকু নিতে চেয়েছে সে। নির্মলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে কয়েকদিন থেকেই প্রবল হচ্ছিল। চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু চিঠি লেখার ব্যাপারে নির্মল বড় অলস।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছনো মাত্র লাবণ্যকে দেখতে পেল সুধাময়। এই প্যান্টসার্ট পরা মেয়েটির সঙ্গে ছোটে মহারাজ চলে এসেছেন বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। মেয়েটি হয়তো সুন্দরী ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে একধরনের কাঠিন্য সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মালবাজার অঞ্চলে তিনি একটি প্যান্টশার্ট পরা সমাজসেবিকার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু ছোটে মহারাজকে খোঁজার ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, সেবিকাকে দেখার বাসনা হয়নি। ইউনিস গিয়েছে অনেকক্ষণ। তার কিংবা ছোটে মহারাজের দেখা না পাওয়াতে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এইসময় লাবণ্যকে দেখে কিছু উৎসাহ ফিরে এল। সুধাময় এগিয়ে গেলেন লাবণ্যর সামনে। নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম সুধাময় সেন। আপনি কি ছোটে মহারাজের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'কে ছোটে মহারাজ?' লাবণ্য অবাক হল।

'ওঁর ভাল নাম নির্মল।'

'না। এখানে আমি কোন মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছি না।' লাবণ্য হাসল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার কৌতূহলের কারণটা জানতে পারি?'

সুধাময় বুঝলেন, এই মেয়ে সুবিধের নয়। অতএব ভনিতা না করে তিনি সরাসরি বললেন, 'আমি জানি নির্মলবাবু আপনার সঙ্গেই এই অঞ্চলে এসেছেন। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে চলে আসায় ওদিকে খুব অশান্তি হচ্ছে। আপনার কাছে আমি অনুরোধ করছি ওঁকে বুঝিয়ে বলতে যেন একটি বারের জন্যে হলেও আশ্রম থেকে ঘুরে আসেন।'

লাবণ্য মাথা নাড়ল, 'এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কেন কথা বলতে যাব?'

'দেখুন আমার ধারণা আপনার কথা উনি শুনবেন?'

'কি করে আপনার এমন ধারণা হল?'

'আপনার আগে কোন নারী ওঁর জীবনে আসেনি।' সুধাময় সতর্ক হয়েই বললেন। লাবণ্য বুঝতে পারল তার মুখে আচমকা রক্ত জমছে। সেটা কাটাতেই সে যেন রুক্ষ হল, 'আপনি আমাকে অত্যন্ত অভদ্র ইঙ্গিত করছেন। যান, এখান থেকে চলে যান।'

এই সময় একটি বাস এসে দাঁড়াল। সুধাময় দেখলেন মেয়েটি সেই বাসে উঠে বসল। এদিকের বাসের সঙ্গে চক্রধরপুর লাইনের বাসের কোন তফাত নেই। কিন্তু ভিড় ঠেলে উঠতে মেয়েটির কোন জড়তা দেখা গেল না। সুধাময় ফিরে গেলেন চায়ের দোকানে। দোকানদার ইতিমধ্যে যেন কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সুধাময় তাকে এই অঞ্চলের নানান বিষয়ে এর মধ্যে প্রশ্ন করে ফেলেছেন। জি এন এল এফদের বিষয়েও। আজকাল ছটার পর হাইওয়ে দিয়েও কেউ গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না। হ্যামিলটনের মজুমদার টকিস্ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বীরপাড়াতেই বেশ কয়েকটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। এইসব গল্প করে লোকটা এবার সতর্ক হয়েছে। সুধাময় আবার ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করল, 'বাসে উঠলেন না?'

'এত ভিড়, পরের বাসটায় যাব।' সুধাময় জবাব দিলেন।

'পরের বাসে এর চেয়ে বেশি ভিড় হবে। ওই দিদি উঠে গেলেন আর আপনি পারলেন না? আপনি তো ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

'উনি অভ্যস্ত। আমার বয়স হয়েছে।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মালকড়ি আছে। ট্যাক্সিতে চলে যান লঙ্কাপাড়ায়। ট্যাক্সি ডেকে দেব? দিন শেষ হলে ট্যাক্সিও যেতে চাইবে না।' দোকানদার বেরিয়ে এল।

সুধাময় একটু অসহায় বোধ করলেন। তাঁর সামনে বাসস্ট্যান্ডে গোটা পাঁচেক বাসের কন্ডাক্টর চিৎকার করে বিভিন্ন জায়গার জন্যে যাত্রী ডাকছে। ইউনিস চলে এলে আপাতত কোথাও চলে যাওয়া যেত। হঠাৎ দোকানদার চেঁচাল, 'এবার বলুন তো আপনার ধান্দাটা কি? সেই দুপুর থেকে বসে এর ওর খবর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল। লোকটা স্পাই, ধান্দাবাজ থেকে আরম্ভ করে নানান বিশেষণ বর্ষিত হতে লাগল। সুধাময় এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে সাজিয়ে মিথ্যে কথা বলতেও আর পারলেন না। জনতা যখন তাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে সেই সময় নির্মল ফিরে এল বাসস্ট্যান্ডে। ঝামেলা দেখে সে এগিয়ে গেল। সুধাময় তখন মাটিতে পড়ে গিয়েছেন, এখানকার কেউ কেউ নির্মলকে চেনে, কেউ নাম শুনেছে কিন্তু অনেকেই চিনতো বা জানতো না। ভিড় সরিয়ে কোনমতে সুধাময়ের সামনে পৌঁছে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল সে, 'কি হয়েছে? এঁকে মারছেন কেন?'

দোকানদার নির্মলকে দেখেছে আগে, পরিচয় নেই, গলা নামিয়ে বলল, 'আরে

এই লোকটা দুপুর থেকে কেবল এর ওর খোঁজ-খবর করছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলছে না।' নির্মল দেখল সুধাময়কে। বীরপাড়ায় নামামাত্র এই ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন। অবশ্যই বাবার শিষ্য এবং সম্ভবত পুলিশের লোক। সে সুধাময়কে বলল, 'উঠুন আপনি।' তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একে আমি অল্প অল্প চিনি। ওঁকে নিয়ে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। উনি খুব খারাপ লোক নন বলে মনে হচ্ছে।'

সুধাময় কিঞ্চিৎ আহত হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধপত্র লাগালো নির্মল। এবং তখনই ইউনিসকে দেখতে পেল। বুঝতে পারল এই দুজনের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। নির্মল বলল, 'এবার চলে যান আপনারা।'

সুধাময় মরীয়া হয়ে বলে ফেললেন, 'ছোটে মহারাজ, আপনাকে ফিরিয়ে নিতে না পারলে হয়তো আশ্রম আমাদের ত্যাগ করবে। আর আশ্রমের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলে ব্যবসা মাথায় উঠবে। একটাও কেস পাবো না আমি।'

ইউনিস বলল, 'আপনাকে পাচ্ছি না বলে এর মধ্যেই বাবা বোধহয় বিরক্ত হয়েছেন। আমি কিছু দুনম্বরী কারবার করলেও বাবাকে ভগবানের মত ভক্তি করি। কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে ফেল করছি বলে পুলিশ এরমধ্যেই আমার পেছনে লাগতে শুরু করেছে। আমি মরে যাব ছোটে মহারাজ।'

ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সুধাময়কে নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখানে কোথায় উঠেছেন?'

সুধাময় বললেন, 'জলপাইগুড়ির একটা হোটেলে জিনিসপত্র রেখে এসেছি।'

'আমাকে খুঁজে বের করতে আপনাদের বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন বা পুলিশকে দায়িত্ব দেননি কেন বলুন তো? আমি তো তাই আশা করেছিলাম।'

'বাবা ব্যাপারটা গোপন রাখতে চান। অবশ্য বড় মহারাজ আর আপনাকে খুঁজে বের করতে চান না। কিন্তু আমাদের মনে হয় বাবা চাইছেন।'

'বড় মহারাজ আর আমাকে খুঁজতে চান না? কেন?'

'সেটা আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন না।'

নির্মলের মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, 'আর আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। শেষ বাস এখনই ছাড়বে। নমস্কার।' আর কথা না বাড়িয়ে সে চলে এল বাস স্ট্যান্ডে। ভিড় বাসটা দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে কন্ডাক্টর ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে দিল। সেখানে অবশ্য কিছু লোক রয়েছে তবু কোনমতে বসা যায়। চলন্ত বাসে বসে নির্মল হেসে ফেলল নিজের মনে। বড় মহারাজের সিংহাসন অধিকারের পথে এখন মাত্র একটাই কাঁটা। মেজ মহারাজ । অবশ্য তিনি কখনও বাধা হয়ে উঠবেন না। বাবা যা এক্সপ্লয়েট করেছেন বড় মহারাজ সিংহাসনে বসলে সেটা দ্বিগুণ হবে। হঠাৎ পাশে উবু হয়ে বসে থাকা দেহাতি লোকটা বলে উঠল, 'দেওতাকা দিল আজ খুশ হ্যায়?' চমকে উঠল নির্মল। লোকটা তাকে হাসতে দেখেই প্রশ্ন করেছে। সে মাথা নেড়ে আর একবার হাসল। রোদ নেই। দুপাশের চা বাগানে হু হু করে ছায়া নেমে আসছে। কিন্তু যাত্রীবোঝাই বাসটায় কোন মানুষের শব্দ নেই। নিরাপদে

ঘরে ফেরার জন্যে সবাই কাঁটা হয়ে রয়েছে। নির্মলের সামনে বসা লোকটা হঠাৎ তার পা জড়িয়ে ধরল। চমকে উঠে তার হাত জোর করে ছাড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'মেরা লেড়কাকো জলপাইগুড়িসে চালান কর দিয়া, দেওতা। থানাকো বড়বাবুকো কিতনা বোলা, নেহি শুনা। তুম বাঁচাও দেওতা।' লোকটা ডুকরে উঠল।

'কি করেছে তোমার ছেলে ?'

'চা পাতি লেকে নিকালা থা গোদামসে।'

'কোন বাগান ?'

'লঙ্কাপাড়া।'

'অন্যায় করলে তো শাস্তি পেতেই হবে। তবে এই অন্যায়ের জন্যে বেশিদিন জেলে থাকবে না ও। চাপাতা চুরি করতে গেল কেন তোমার ছেলে ?'

'ঘরমে চাপাতি নেহি থা। হামলোগ বাগানসে পাতি তুলতা হ্যায়, গোদামমে কাঁচা পাতি পাকা করনে কো কাম হামলোগ করতা হ্যায়, বাকি থোড়াসে পাতি ঘরমে লিয়া, কিঁউ জেল হোগা ?' লোকটার চোখে মুখে অভিযোগ, 'ওই শালা গোদাম জ্বালা দেনেকে ঠিক হ্যায়।'

'তারপর খাবে কি ? তুমি কাজ করো না ?'

'নেহি। বুড্ডা হো গিয়া, কাম ভি খতম হো গিয়া।'

নির্মল লোকটার হাড়-জিড়জিড়ে শরীরটা দেখল। কয়েকপুরুষ আগে রাঁচী হাজারিবাগ অঞ্চল থেকে এরা এসেছিল এখানে খাবারের সন্ধানে চা বাগানের কাজে। এখনও সেই সন্ধান শেষ হয়নি, শুধু মাঝখান থেকে সেই দেশটাই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর সমস্যা সমাধান করার কোন ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া সে ঠিক করেই নিয়েছে কোথাও কোন অন্যায় সুবিধে আদায় করতে যাবে না। এই কারণে তাকে একটা টিউশ্যনি ছেড়ে দিতে হয়েছে। এলাকার বিখ্যাত টিম্বার মার্চেন্টের ছেলেকে সে পড়াত। ভদ্রলোক তার গোদামে নিজেই আগুন ধরিয়ে জি এন এল এফের ওপর দায় চাপিয়ে ইন্সুরেন্স থেকে টাকা আদায়ের ফিকিরে ছিলেন। প্রতিবাদ করেছিল নির্মল। ভদ্রলোক তাঁর পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে যে অনুরোধ করেছিলেন তা রাখতে পারেনি সে। ফলে এখন মাত্র দেড়শ টাকায় তার খাওয়া-থাকা চলছে। এখানে ওই টাকাও ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। যদিও এই লাইনের বাসে উঠলে কোন কন্ডক্টর তার কাছ থেকে ভাড়া নিতে চায় না। একটি বাইরের মানুষ এখানে এসে নিঃস্বার্থভাবে গরীবের সেবা করে চলেছে, এই খবরটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

বাস থেকে নামতেই সন্ধেটা জেঁকে এল। পেছনের দুটো দরজা দিয়ে অনেকেই নামাওঠা করল, নির্মল সেটা লক্ষ করেনি। বুধন নামের একটি বালক ছুটে এসে জানাল, 'মালবাজারসে দিদি আ গিয়া।' নির্মল ওর তেলচিটচিটে চুলে হাত বোলাল। লাবণ্য হঠাৎ চলে এল কেন ? কোন সমস্যা হয়েছে ? বেচারাকে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে ওই এলাকায়। কিন্তু একজন বাঙালি মেয়ে হিসেবে লাবণ্য চমৎকার দৃষ্টান্ত রাখছে। হরিরামের মুদির দোকানের পেছনে আট বাই বারো দরমার দেওয়াল দেওয়া ঘরটি নির্মলের রাত

কাটানোর জায়গা। দরজায় তালা থাকে না কারণ চুরি যাওয়ার মত সম্পত্তি কিছু নেই। উল্টোদিকে, হরিরামের মুদিখানায় দিনভর বিক্রি দেড়শটাকার বেশি হয় কিনা সন্দেহ। হরিরাম তাকে বলেছে মাস গেলে হাজার টাকা রোজগার হয়। ওই পেছনের ঘরে একসময় হরিরাম থাকত। কিন্তু বউ বাচ্চা মুলুক থেকে এসে যাওয়ায় অন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। হরিরামের দোকানের সামনে মাটিতে পোঁতা বেঞ্চিতে বসে জমিয়ে গল্প করছিল লাবণ্য। তার শ্রোতার দলে যেমন মদেশিয়া নারীপুরুষ রয়েছে তেমনি নেপালিরাও। নির্মলকে হরিরামের হ্যাজাকের আলোয় দেখতে পেয়ে সে হাত তুলে একটু অপেক্ষা করতে বলল। তারপর শ্রোতাদের দিকে ফিরে কথা শেষ করল, 'এদিকে বাঙালিবাবুরা তোমাদের থেকে বেশি রোজগার করে। তা ঠিক। কিন্তু একটা বাঙালি পরিবারে একজন রোজগার করে, দশজন খায়। আর তোমরা দশজনের পরিবার হলে নজন রোজগার কর। মাসের শেষে ওদের অবস্থা তোমাদের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। তোমাদেরটা যে ভাল তাও বলছি না। এখন কথা হল রোজগার বাড়াতে হবেই। মালিককে যদি বল মাইনে ডাবল করে দাও তো সে ফ্যাক্টরি লকআউট করে দেবে। তাতে তোমাদের ক্ষতি। আমি আমার ওখানকার জি এন এল এফ নেতাদের রোজ বলি, তোমরা আন্দোলন কর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু গরীবমানুষগুলোর রোজগার বন্ধ করে দিও না।'

কেউ একজন বলল, 'দেওতা এখানে আসার পর আর কোন বাংলোয় আগুন জ্বলেনি।'

লাবণ্য বলল, 'কিন্তু কিছুদিন আগে এখানে একটা বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে।'

একজন নেপালি বলল, 'ওই শালা বাসের মালিক পুলিশ নিয়ে গাড়ি চালাত।'

'কিন্তু বাস পুড়িয়ে তোমাদের কি লাভ হল? একটা বাস কমে যাওয়া মানে রোজ কমপক্ষে দুশ মানুষ যাতায়াত করতে পারবে না।' লাবণ্য উঠে দাঁড়াল। লোকগুলো ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর বল?'

'নাথিং। কেন্দ্রীয় কমিটিকে তিন তিনটে চিঠি পাঠিয়েছি। নো রিপ্লাই।'

'টাকা চেয়ে পাঠিয়েছ নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ।'

'ওইটেই বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু খাবে?'

'খুব খিদে পেয়েছে।'

নির্মল হরিরামকে বলল, 'এক টাকার মুড়িতে একটু তেল ছড়িয়ে দিন তো।' তারপর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কেউ মুড়ি খাবে?'

লাবণ্য অবাক হয়ে দেখল, মানুষগুলো সবাই একসঙ্গে মাথা নেড়ে না বলল। নির্মল হাসল, 'ওরা খুব ভাল মানুষ। আমার কাছে যে বেশি পয়সা নেই তা ওরা জানে।'

জনতাকে পেছনে রেখে নির্মল নিজের ঘরে ঢুকে কুপি জ্বাললো। এই অঞ্চলে কুপিকে বলে ঢিবরি। এই কয়মাসে নির্মলের সম্পত্তি বেশি বাড়েনি। ঘরের একপাশে মাটিতে বাঁশ পুঁতে তার ওপর তক্তা ফেলে সুন্দর শোওয়ার জায়গা

কন্না হয়েছে। ওপাশে মুখোমুখি ছোট ছোট বাঁশের দুটো বেঞ্চি। লাবণ্য খাটের ওপর উঠে বসতেই মুড়ি পাঠিয়ে দিল হরিরাম এক বালকের হাত দিয়ে। লাবণ্য তাকে কিছুটা দিতে চাইল কিন্তু সে নিল না। সে চলে গেলে লাবণ্য নির্মলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিও নিতে অস্বীকার করবে?'

'মাথা খারাপ! আজ সকাল থেকে শুধু চা গিলে যাচ্ছি।'

মুড়ি দু' ভাগ করে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, 'সকাল থেকে খাওনি?'

'না। আসলে রোজ রাত্রে রান্না করি। ভাত আলু সেদ্ধ, ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ,কখনও ডিমসেদ্ধ। বেশি করে করি যাতে সকালে খেতে পারি।'

'ভাল।'

'ওভাবে বললে কেন?' নির্মল হাসল, 'অভ্যেস হয়ে গেলে সব কিছু মানিয়ে যায়।'

'আমার কথা মনে পড়ে না?' চোখ না তুলে জিজ্ঞাসা করল লাবণ্য।

'পড়ে।'

এইসময় দরজার বাইরে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। নির্মল বেঞ্চিতে বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে? ভেতরে আসুন।'

দরজা খোলাই ছিল। সুধাময় সেন এবং তাঁর পেছনে ইউনিস হাত জোড় করে সেখানে এসে দাঁড়াল। নির্মল কিছু বলার আগেই লাবণ্য প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি এখানে?'

সুধাময় বললেন, 'না এসে পারলাম না। ছোটে মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন।'

'কিসে এলেন বীরপাড়া থেকে?' নির্মল অবাক।

'আপনি যে বাসে এসেছেন সেই বাসেই।'

'অত ভিড়ে উঠতে পারলেন?'

'উঠতে হল। প্রাণের দায়।'

'প্রাণের দায়? কার জন্যে ভয় পাচ্ছেন? কি করতে পারেন আপনাদের বাবা?'

'আপনি তো জানেন। উনি কিছুই করবেন না। সেটাই আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

'আপনাকে আমি তখন স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে, আশ্রমের ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করার কাজে সাহায্য করতে চাই না আমি।'

সুধাময় জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ এই ঘর এবং দুজনের সামনে রাখা কাগজের ঠোঙার ওপর ঘুরছিল। এটাকে কি একধরনের সন্ন্যাস বলা যায়? ওই প্রাচুর্য ছেড়ে এই রিক্ততায় চলে আসা কোন সুখের জন্যে? মানুষ বৈভব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় ধর্মের আকর্ষণে। আর ধর্ম ছেড়ে মানুষ যখন পথে নামে বেগার খাটতে তখন তাকে কি বলে? সুধাময়ের মত দুঁদে পুলিশ অফিসারের চোখেও জল এসে গেল।

নির্মল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নিজে কি করেন?'

'এককালে পুলিশে চাকরি করতাম। এখন প্রাইভেট ইনটেলেজিন্সি কোম্পানি

খুলেছি।'

'আপনার সাহস তো খুব। পুলিশে ছিলেন জানলে এখানে বিপদে পড়বেন।'

'জানি। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসতেই হল।' সুধাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা একটু বসতে পারি? ইনি ইউনিস, বাবার ভক্ত।'

'বসুন। নাম শুনে মনে হচ্ছে আপনি মুসলমান। বাবার শিষ্য হলেন— ।'

ইউনিস বাধা দিয়ে বলল হাত জোড় করে, 'না, না। আমি শিষ্য নই। কিন্তু ওঁর ভক্ত। ওঁর কাছে জীবনে অনেক উপকার পেয়েছি যার জন্যে জান দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'বীরপাড়ায় ফেরার কোন বাস আর নেই। এখানে কোথায় থাকবেন?'

সুধাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাছাকাছি কোন রেস্টহাউস নেই?'

'ছিল। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

নির্মল দেখল কথাটা শুনে দুজনে দুজনের মুখ দেখলেন। সে স্পষ্ট বলল, 'দেখুন, আমি জেনে শুনেই আশ্রমের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছি। আমি একটা সমাজ চাই যেখানে ধর্মপ্রচারক এবং রাজনৈতিকদের শোষণ থাকবে না। এতদিন যাদের আমরা শোষক বলে জেনে এসেছি সেই ব্যবসায়ীরা আসলে ওই দুই সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল। এ দেশের যা অবস্থা তাতে আমাদের ভাবনার বাস্তব রূপ পেতে দীর্ঘসময় লাগবে। কিন্তু আমি হাল ছাড়ব না। ধরুন এখানে বিখ্যাত এক কমরেড বক্তৃতা দিতে এলেন। এবং সেই দিন একই সময়ে এক মাইল দূরে মির‍্যাকল্ দেখাতে সক্ষম এক ধর্মগুরু সভা করছেন। পার্সেন্টেজ অফ দর্শক কমরেডের সভায় হাস্যকর ভাবে কম হবে। চল্লিশ বছর ধরে এদেশে যাঁরা রাজনীতি করছেন তাঁরা তাদের মতবাদে সাধারণ মানুষ শতকরা পাঁচভাগকেও বিশ্বাস করাতে সক্ষম হননি। কারণ তাঁদের মতবাদ যতই শ্রদ্ধার্হ হোক না কেন, তাঁদের কথাবার্তা, সুবিধেমত নিজেদের চেহারা পরিবর্তন করা এবং কাজ এবং কথার ব্যবধান সাধারণ মানুষকে দলে টানতে পারেনি। আর ধর্মগুরুদের কাছে মানুষ যায় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। বাবার শিষ্য হয় কারণ আশ্রমে এলে এমন গুরুভাই-এর সান্নিধ্য পাবে যার কাছে এমনিতে পৌঁছানো অসম্ভব। স্বার্থসিদ্ধি না হলেই তারা সরে আসে। আমরা এই দুই ভ্রান্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চাই।'

সুধাময় মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি আর ইউনিস এখন বেঞ্চিতে নির্মলের মুখোমুখি বসে আছেন। নির্মলের কথা শেষ হলে বললেন, 'আপনার বিশ্বাস সত্য হলে বলব আপনি ভুল করছেন। সহজ পথ, যা কিনা একমাত্র আপনার পক্ষেই পাওয়া সম্ভব, ছেড়ে জটিল পথ ধরছেন। আমরা প্রায় পাঁচ কোটি শিষ্য বাবার মুখ চেয়ে আছি। আশ্রমে থেকে আপনি এতগুলো মানুষকে নিজের মত চালনা করার সুযোগ পেতেন।'

নির্মল হো হো করে হেসে উঠলেন, 'বাবা, বড় মহারাজ আমাকে ওসব করতে দেবেন? জানেন না, রাজনীতিকের চেয়ে ধর্মগুরুরা বহুগুণ নিষ্ঠুর!'

'আপনি সবাইকে এক জায়গায় বসাচ্ছেন কেন?'

'না। আমি তা করছি না। খুব কম ধর্মগুরুই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান করেন। সেই সন্ধানের নামই ধর্ম। আপনাদের আশ্রমে সেই সন্ধানের

কোন বালাই নেই।'

'কিছু হতে তো পারে। বাবার বয়স হয়েছে। তিনি বলেন প্রকৃতির নিয়মে তাঁকেও চলে যেতে হবে।'

'আর একজন, বড় মহারাজ তখন বাবা হয়ে বসবেন। তিনি গেলে মেজমহারাজ আছেন।'

'মেজ মহারাজ না থাকলে ?' সুধাময় হাসলেন।

'কি বলতে চান ?' নির্মল তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'সমস্ত কিছু কি এক হিসেবে চলে ? তিনুমহারাজ কত প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি আজ মৃত। ধ্যানেশকুমারকে সবাই বাবার এক পুত্র বলে জানত। তিনি আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়েও আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। অন্যান্য সংগঠনগুলো বাবার ক্ষমতা খর্ব করতে সক্রিয়। আমি জানি না, বাবা বড় মহারাজের ওপর কতটা আস্থা রাখেন। কারণ রাজ্যমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী যখন বাবাকে দর্শনের জন্যে যান তখন সেখানেবড় মহারাজ ছিলেন না। আমরা এও শুনেছি যে বাবা বগলাচরণ সেনগুপ্তকে আশ্রমে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'তিনি কে ?'

'হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল।'

'কেন ?'

'তা জানি না।'

'আমাকে নতুন কিছু শোনাবেন না আর কারণ তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আজ রাত্রে এই ঘরেই থাকুন আপনারা। কারণ কয়েক মাইলের মধ্যে কোন থাকার জায়গা নেই। আমি আপনাদের এই রাতে বের করে দিতে পারছি না। তবে কাল ভোরের প্রথম বাসেই দয়া করে ফিরে যাবেন।'

'বেশ। কিন্তু আমরা এখানে থাকলে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না তো ?'

'অসুবিধে মানে ?' নির্মল মুখ তুলল, 'ও, লাবণ্য আছে বলে কথাটা বললেন ? লাবণ্য আমার মতই একজন কর্মী। ও এরকম পরিবেশে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার কাছে যে বাসন আছে তাতে চারজনের ভাত হবে না যে।'

লাবণ্য ঠোঁট কামড়াল। কি সহজে নির্মল লোকদুটোকে এখানে থাকতে বলল। অথচ সে মনস্থির করে আজ এখানে এসেছিল। সেই বয়সটায় পৌঁছনোর পর থেকেই সে কেবল ছেলেদের চোখে মুগ্ধতা দেখে এসেছে। বেশির ভাগই অবশ্য সাহস পায়নি সেটা মুখে বলতে। হয়তো তার ছেলেমি চালচলন, কথাবার্তা, সাজগোজ দেখে শেষপর্যন্ত সামলে নিত সবাই। শাড়ি ইচ্ছে করেই পরত না লাবণ্য। কারণ দেখেছে সে শাড়ি পরলেই ছেলেদের মানসিক দূরত্বটা চলে যায়। এমন কি কানাই পর্যন্ত প্রথম দিকে নরম হয়ে যাচ্ছিল। লাবণ্য তাকে পরিষ্কার বলেছিল, ওসব ভাবনা মাথায় না রাখাই ভাল। তাছাড়া প্রেমিক হিসেবে কানাই তার পছন্দসই নয়, বন্ধু হিসেবে অনেক বেশি গ্রহণীয়। কানাই বুঝেছিল। কিন্তু নির্মলের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে থেকেও লোকটার ব্যবহার পরিবর্তিত হতে দ্যাখেনি সে। নির্মলকে শালগ্রামশিলা বলে ভাবতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু কিছুদিন থেকেই নির্মলের কথা মনে হলেই

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে বুক টনটনিয়ে ওঠে। অনেক লড়াই করেছে ওই বোধের সঙ্গে। ব্যাপারটা মন যেভাবে নিচ্ছে তা এই অবস্থায় কখনই অভিপ্রেত নয়। অথচ একা হলেই কেবলই মনে হয় নির্মল কি ইচ্ছে করেই নির্লিপ্ত হয়ে আছে। দেশবিখ্যাত বাবার সন্তান হয়ে এতকাল বড় হয়েছে যে ছেলে, যার জীবনে কোন নারী আসেনি কখনও; যে আশ্রমজীবনের বাইরে এসে নাগরিকজীবনে মিশে গিয়েও যখন নিজেকে সংযত করে রাখে তখন তার ওপর শ্রদ্ধা আসেই। কিন্তু সবটাই কি অভ্যেসজাত সংযম? নাকি কোথাও অভিনয় করে নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা আছে? লাবণ্য ঠিক করেছিল আজ রাত্রে নির্মলের সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করবে। কিন্তু নির্মল যেভাবে এই লোকদুটোকে থাকতে বলল তাতে আর ওসব চিন্তা মাথায় রাখার উপায় রইল না। বীরপাড়ায় ওই লোকটা তাকে যে ইঙ্গিত দিয়েছে তারপরে এখন সে আর আপত্তি তুলতেই পারে না।

সুধাময় চারপাশ দেখছিলেন। ইউনিস বলল, 'ছোটে মহারাজ, যদি অপরাধ না নেন তো বলি, আমাদের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এখানকার রাস্তা দিয়ে রাত্রে ট্রাক যায় না?'

'আগে যেত। এখন সন্ধের পর সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'পুলিশের গাড়ি?' প্রশ্নটা সুধাময় করলেন।

'কনভয় আসে টহল দিতে। কিন্তু কোন সময় বাঁধা নেই।'

'ওপাশের চা বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললে তিনি সাহায্য করতে পারেন?'

'ইচ্ছে করলে পারেন। তবে সেটা আপনাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। আমাকে দেখলে হিতে বিপরীত হবে। মাইলখানেক হেঁটে যেতে পারলে—। মনে হচ্ছে এই ঘরের আরাম আপনারা পেতে চাইছেন না। আসুন আমার সঙ্গে।' নির্মল কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুধাময় এবং ইউনিস ওকে অনুসরণ করল। মুদির দোকান তখন বন্ধ হচ্ছে। হঠাৎ গোটা ছয়েক লোক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হল। ওদের দেখে যারা তখনও দোকানের সামনে বসে ট্রানজিস্টর শুনছিল, তারা হাওয়া হয়ে গেল। ছয়জনের দুজন রাস্তার দিকে মুখ করে পজিশন নিল। তাদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। চারজন দোকানদারকে বলল, 'চাল আর আটার বস্তা কোথায়?' দোকানদার ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মর যায়েগা, হাম মর যায়েগা।'

'চোপ। শালা কুত্তা।' দোকানের ভেতর দুজন ঢুকে গেল।

নির্মল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। সে ইশারা করল সুধাময়দের সরে যেতে। তারপর এগিয়ে গেল আলোয়। লোকগুলো তাকে দেখল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পোশাক মলিন। দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত খাওয়াদাওয়া হয় না। কাছের ভুটানের পাহাড়ে এরা পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে থাকে দিনভর। মাঝে মাঝে রাত্রে বেরিয়ে এসে আন্দোলন এবং লুটপাট করে। নির্মল মাথা নাড়ল। যে লোকটাকে ওদের নেতা মনে হল তাকে বলল, 'দাজু, ইউ রামরো ছইনা।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ওর হাতে রিভলভার। নির্মল হাসল, 'প্রধানদাজু

মেরো দোস্ত ছ।' পাশে দাঁড়ানো লোকটা নেতাকে বলল, 'দেওতা! রামরো আদমি ছ।'

নেতা চিৎকার করল, 'ক্যা বোলতা তুম?'

নির্মল আবার হাসল, 'আজ তুমলোগ ইয়ে মাল লে যানেসে কাল দোকান বন্ধ হো যায়েগা। সারে লাইনকো আদমি ভুখা মরেগা। ইহাঁ মদেশিয়া যিতনা হ্যায় নেপালি হ্যায় উসকো ডাবল। আপনা জাতভাইকো মুস্কিলমে গিরা দেতা হ্যায় আপলোগ।' লোকটা একটু অন্যমনস্ক হল যেন। আর তখনই পাহারাদারদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'কনভয়!' সঙ্গে সঙ্গে ছটা লোক দোকান ছেড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দোকানদার তখনও থরথর করে কাঁপছে। পুলিশের টহলদারি জিপগুলো সামনের রাস্তায় ব্রেক কষল। একটি গলা চিৎকার করল, 'সব ঠিক হ্যায়?'

নির্মল জবাব দিল, 'ঠিক হ্যায়।' জিপগুলো বেরিয়ে গেল।

তখনও আটার বস্তাটা দোকানের সামনে নামানো। নির্মল দোকানদারকে বলল, 'ওদের দশ কেজি আটা কিংবা চাল দিয়ে দাও।' দোকানদার বলল, 'উনলোগ ভাগ গিয়া?' আর তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে ওরা ফিরে এল। নেতা নির্মলকে বলল, 'শুক্রিয়া। হামলোগ ভুখা হ্যায়। কুছ খানে দেও।'

দোকানদার ততক্ষণে দশ কেজি চাল আর আলু প্যাকেট করে এগিয়ে দিয়েছে। নেতা বলল, 'ইসমে ক্যা হোগা। ষাট রুটি আউর সবজি বানাও। হামলোগ এক ঘণ্টাকা বাদ আয়েগা।' ওরা চলে যাচ্ছিল। নির্মল পেছন থেকে ডাকল, 'শুনিয়ে। ইনলোগ মেরা দোস্ত হ্যায়। ম্যানেজারকো কুটিমে যানে মাংতা।'

লোকটা বলল, 'আইয়ে।' সুধাময় তখন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আচমকা ব্যাপারটা হতে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। নির্মল বলল, 'যান। কোন ভয় নেই। এখনও এখানে বেইমানিটা চালু হয়নি তেমন করে।' প্রায় বলির পাঁঠার মত ইউনিস সুধাময়ের সঙ্গে ওদের অনুসরণ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে দোকানদার ছুটে এসে নির্মলের দুই হাত জড়িয়ে ধরল, 'আপ দেওতা হ্যায়। মুঝে বাচায়া আপনে। হনুমানজী আপকো ভালা করেগা।'

নির্মল বলল, 'ঠিক আছে। এখন দোকান বন্ধ করে ওদের জন্য রুটি তরকারি তৈরি করে আন। অনেক কমে হয়ে গেল।'

দোকানদার মাথা নাড়ল। 'জী। দেওতা, আউর এক বাত হ্যায়। আপ আজ মত পাকাইয়ে।'

নির্মল হাসল, 'আমার কাছে এক অতিথি আছে যে।'

'দিদিভি মেরা মেহমান আজ। ব্যস।' লোকটা চলে গেল দোকান বন্ধ করতে।

নির্মল আবার ফিরে এল পেছনের ঘরে। এসে দেখল লাবণ্য তার তক্তাপোশের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে চোখে হাত চাপা দিয়ে। ওর জন্যে যে মুড়ি আনানো হয়েছিল, তা আধখাওয়া হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘুমন্ত মানুষকে ডাকা উচিত নয় ঠিক করে নির্মল বাঁশের বেঞ্চিতে বসে নিজের মুড়ি এক মুঠো তুলে মুখে দিতেই বুঝতে পারল এরই মধ্যে কিছু মিইয়ে এসেছে। মুড়ি চিবোতে

চিবোতে সে অন্যমনস্কভাবে সুধাময়ের কথা ভাবতে শুরু করল। রাত আটটার সময় দুজন অজানা লোককে চা বাগানের ম্যানেজার আতিথ্য দেবেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি সুধাময় তার পুরোন এবং বর্তমান পরিচয়পত্র দিতে পারেন তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। লোকদুটো কোন স্বার্থে এত কষ্ট করে এখানে এসেছে বোধগম্য হচ্ছিল না। যদি বাবার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কাই বড় হয়ে থাকে ওদের কাছে, তা হলে বলতে হবে বাবার ক্ষমতা আরও প্রবল হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে সেটা ছিলই, সে-ই জানত না। ওরা ফিরে গেলে বাবা জানতেই পারবেন তার অস্তিত্বের কথা। তখন কি তিনি তাঁর অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে তাকে আশ্রমে টেনে নিয়ে যাবেন? নির্মলের সেটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্নেহ-ভালবাসা যে মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেই, নিজের তৈরি আদর্শে যাঁর আস্থা প্রবল তিনি কিছুতেই বদনামের ঝুঁকি নিতে পারেন না।

কিন্তু সুধাময় তাকে আর একটা কথা বলেছে। বাবা বেঁচে থাকতেই কি তাঁর সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে? বড় মহারাজ তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন। মেজ মহারাজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। পাঁচ কোটি মানুষের অধিকার অর্জন করার জন্যে বড় মহারাজ এখন ব্যগ্র। অথচ এই পাঁচ কোটি মানুষকে যদি সামাজিক সচেতন করা হত, যদি তাদের মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা হত তাহলে আখেরে দেশেরই লাভ হত। হঠাৎ একটা বিদ্যুতের ঝলকানি যেন নির্মলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে আলো ফেলল। কেবলমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা এই কাজ করতে পারেন না। কারণ তাঁর ওপর জনসাধারণের ভক্তি নেই, আস্থা নেই। হয়তো সাময়িক বিশ্বাস আছে। অন্যদিকে একজন ধর্মগুরু ভক্তি এবং আস্থার অধিকারী হয়েও কাজটি করতে পারবেন না কারণ মানুষ তাঁকে ওই ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত নয়। তিনি তাঁর জীবনযাত্রাই বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করে জনসাধারণ থেকে আলাদা হয়ে রয়েছেন চিরকাল। হঠাৎ নির্মলের একটি মুখ মনে পড়ল। চট করে গিয়ে সে তক্তাপোশের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে কুপির কাছে চলে এল। দ্রুত আঙুলে পাতা উলটে উলটে আকাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে আসতেই পেছন থেকে লাবণ্য বলে উঠল, 'হঠাৎ কি পড়তে ইচ্ছে হল?'

নির্মল উদ্বেলিত স্বরে বলল, 'শোন, পড়ছি। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান—সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি, এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আর আমার সর্বাধিক উপাস্য—আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির, সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।' নির্মল উঠে দাঁড়াল, 'লাবণ্য, আমি বিবেকানন্দ পড়লাম। ধর্ম এবং রাজনীতিকে একত্রিত না করলে এদেশের মানুষের মুক্তি অসম্ভব। আমি এ দুটোকে মেলাতে চাই। অধ্যাত্মভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নীতিগুলোকে সম্মিলিত করাই এখন একমাত্র প্রয়োজন। আমাকে এটাই করতে হবে।'

লাবণ্য উঠে বসল, 'কিভাবে?'

বই রেখে দিয়ে দুহাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরল নির্মল, 'আমি জানি না।

এখন পর্যন্ত জানি না। আমরা শরীরের চিকিৎসা করতে চাইছি মন উপেক্ষা করে। কিন্তু মনের শুদ্ধি ছাড়া শরীর কখনই সুস্থ হতে পারে না।'

লাবণ্য এগিয়ে এল, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, নির্মল।'

হতাশায় মাথা নাড়ল নির্মল, 'আমিও পারছি না। শুধু আমার মনের ভেতর একটা শক্তি উদ্ধত হয়ে বলছে তোমাকে করতেই হবে, করতেই হবে। কিভাবে করব, তা জানি না।'

'শান্ত হও। এসব নিয়ে আর চিন্তা করো না। ওঠো।' নির্মলের দুটো হাত ধরল লাবণ্য।

নির্মল মুখ তুলে তাকাল। সহসা দুটো মুখের ছবি ভেসে উঠল লাবণ্যের মনে। যীশুখ্রীস্ট এবং যুবক রবীন্দ্রনাথ। সেই উজ্জ্বল চোখ, কপাল নাকে দুরন্ত জীবন স্থির, দাড়ির আড়ালে প্রজ্ঞার প্রকাশ। লাবণ্য সম্ভবত অবচেতনের ছবির সঙ্গে বাস্তবের মুখটিকে মেলাচ্ছিল, নির্মল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল তোমার?'

'কিছু না। বইটা দাও।'

বিবেকানন্দের বইটি তুলে দিল নির্মল। লাবণ্য সেটিকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল?'

নির্মল বলল, 'ওঁরা ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়েছেন। বড়দা চান না আমি ফিরে যাই, বাবার মন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এঁরা এসেছেন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নিজেদের তাগিদে। ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমার ওখানে কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে?'

হচ্ছে। খুব আশাপ্রদ নয়। কোথাও একটা গলদ থেকে যাচ্ছে। প্রথম থেকেই লোকে সন্দেহ করছে। স্বাধীনতার একচল্লিশ বছরে কেউ তো স্বার্থহীন হয়ে মানুষের জন্যে কিছুই করেনি। সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুটো বড় পার্টিও আমাকে মেনে নিতে পারছে না। তারা নিশ্চয়ই আমার অতীত খুঁড়েছে। এছাড়া যে সব কাজ শুধু টাকার জন্যে আটকে আছে, সেখানে তো আমিও অসহায়। বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে কিছু কাজ করতে পারতাম কিন্তু সেক্ষেত্রে এরাই প্রশ্ন তুলবে টাকাটা আমি পাচ্ছি কোথায়? ঘরের টাকা নিশ্চয়ই এভাবে পাঁচ ভূতের জন্যে কেউ ঢালে না। তা হলে আমার পেছনে কোন মতলববাজের স্বার্থ কাজ করছে। এদেশে এখনও সি আই এ-র দালাল শব্দটা বেশ কাজ দেয়।'

'এসবই তো আমরা জানতাম।' নির্মল বলল।

'জানতাম। থিওরি আর প্র্যাকটিসের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না? আমার কেবলই মনে হচ্ছে, পরিচয় গোপন করে নয়, দল নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করুক। নেতারা বলে দিন, আগামী দশ বছর এই দল কোন রাজনৈতিক কাজকর্ম করবে না। দশ বছর ধরে মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করে যাবে। এতে সুবিধে হবে বেশি। চাঁদা তোলা থেকে অনেক কাজ প্রকাশ্যে করতে পারবে। সমাজসেবী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হলে রাজনৈতিক দলগুলো উপেক্ষা করতে আরম্ভ করবে। এতে কাজের সুবিধে হবে।' লাবণ্য গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি এই প্রস্তাব কলকাতায় পাঠিয়েছি।'

নির্মল চুপচাপ শুনছিল। এইসময় কুপির আলো দপদপ করে উঠল। নির্মল বলল, 'সেরেছে!'

'তেল নেই?'

'না। অবশ্য এটা ওয়ার্নিং। এখনও মিনিট পনের আলো দেবে। ও হ্যাঁ, রাঁধতে হবে না আজ। রুটি তরকারি আসছে। তুমি খেয়েদেয়ে ওই তক্তাপোশে শুয়ে পড়ো। ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে একটা শেড আছে টয়লেটের জন্য।'

'তুমি কোথায় শোবে?'

'আমি এখানকার মাঠেঘাটে শুতে অভ্যস্ত। চিন্তা করো না।'

লাবণ্য অবাক হল। সে না বলে পারল না, 'তোমার মনে আছে নির্মল, পালিয়ে আসার পর রিয়াবাড়ি চা-বাগানে প্রথম রাতটা আমরা একসঙ্গেই কাটিয়েছিলাম। তোমার কোন সঙ্কোচ ছিল না। আমরা এক বিছানা ব্যবহার করেছিলাম স্বচ্ছন্দে। সেই মনটা তোমার নষ্ট হয়ে গেল?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। এবং তার জন্যে দায়ী সেই রাতটাই।'

লাবণ্যর মনে হল নির্মল তাকে খোঁচা দিল, 'তার মানে?'

নির্মল বলল, 'দ্যাখো, আশ্রমে বা কলকাতায় থাকতে কখনই চিন্তা করিনি কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছি। এসব ভাবনা আমার মাথায় কখনও আসেনি। মেয়েদের নিয়ে চিন্তা করার অভ্যেস আমার ছিল না। হয়তো যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেই পরিবেশই এমনটা না ভাবতে শিখিয়েছিল। তাই তোমার সঙ্গে যে রাত্রে এক খাটে শুয়েছিলাম আমার কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ওই ঘটনাটার প্রতিক্রিয়া হল পরে। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, আমি আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। একা শুলেই তোমার শোওয়ার ভঙ্গী চোখে ভাসতো। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই চলেছে অনেকদিন। এখন আর নিজের ওপর আস্থা নেই আমার।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা নেই?' লাবণ্য নির্মলের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল।

'তুমিও আজ সেই রাতের লাবণ্য নও।'

'না, নই। সেই রাত্রে তুমি আমার কাছে গাছ পাথর কিংবা শুধুই একটা মানুষ ছিলে। অথচ তারপর থেকে আমি তোমাকে ভুলতে পারছি না। নির্মল, আই নিড ইউ এমোশনালি।'

ঠিক এইসময় দোকানদার এসে দাঁড়াল খোলা দরজায়। তার হাতে একটা বড় ঠোঙা আর বাটি। দোকানদার হেসে বলল, 'উনলোগ খানা লে গিয়া।'

নির্মল এগিয়ে গিয়ে খাবার নিল।

সুধাময় এবং ইউনিসকে ম্যানেজারের গেটে পৌঁছে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ি মানুষগুলো। গেটের ভেতরে দুজন রক্ষী তখন বন্দুক উঁচিয়ে পাহারায় রয়েছে। গেটে কথাবার্তা শুনেই তারা চ্যালেঞ্জ করল। ইউনিস চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যানেজারসাব হ্যায়?'

'কৌন হ্যায় আপলোগ?'

'কলকাত্তাসে আয়া হ্যায়।'

'গেট খুলকে সিধা আইয়ে।'

উনি হুকুম মান্য করলেন। তারও মিনিট সাতেক বাদে সুধাময় এবং ইউনিস আখাওাজি ম্যানেজারের মুখোমুখি বসেই চমকে উঠলেন। ভদ্রলোকের গলায় যে লকেট ঝুলছে তাতে বাবার ছবি সাঁটা। সুধাময় আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'জয় বাবা!'

ম্যানেজারের মুখের বিরক্তি, সন্দেহ চট করে উধাও হয়ে গেল, তিনিও বললেন, 'জয় বাবা।'

কলকাতার বাড়িতে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। বছরে একবার বাবা আসেন কলকাতায়। তিনদিন থাকেন। এই তিনদিন ভক্তদের ভিড়ে সামনের রাজপথে ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যায়। নো এনট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দেয় পুলিশ। সমস্ত বাড়ির ঝাড়পোঁছের কাজ শেষ। এই বাড়ির চারতলায় ছোটে মহারাজ ছিলেন। তিন এবং চারতলায় কোন সিঁড়ি নেই। তিনতলাটি এয়ারকণ্ডিশণ্ড। বাবা ছাড়া কারো পদধূলি সেখানে পড়ে না। আশ্রম থেকে দুজন সেবিকা আসেন বাবার সঙ্গে। অবস্থানের সময় তাঁরাই ফ্ল্যাটটি দেখাশোনা করেন। একতলায় বিশাল উপাসনাগৃহ। কিন্তু বাবা এ বাড়িতে এলে সেটি ভক্তদের চাপে নিতান্তই ছোট হয়ে যায়।

গতকাল বাবা এখানে এসেছেন। সঙ্গে বড় মহারাজ। মেজ মহারাজ আশ্রমের দায়িত্বে রয়ে গিয়েছেন। গতকাল ঘরে ঢোকার পর বাবা আর তিনতলা থেকে বের হননি। আজ সকালে তাঁর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামনে ভিড় করে থাকা জনতার উদ্দেশে হাত নেড়েছেন একবার। তাঁকে দর্শন করার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ এবং সেবকরা ভিড় সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বড় মহারাজ ইন্টারকমে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন চারতলা থেকে, 'সুধাময় এবং ইউনিস কলকাতায় নেই। তারা কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারছে না।'

'সুধাময় যেন এলেই আমার কাছে চলে আসে।'

'ঠিক আছে। সনাতননাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে যথেষ্ট আগ্রহী। এ ব্যাপারে আপনার কোন আদেশ আছে?'

'ভেবে দেখছি। ছোটের ঘর ভাল করে দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানে কিছু কাগজপত্র পেয়েছি। রাজনীতি সংক্রান্ত।'

'রাজনীতি?' বাবার গলায় বিস্ময়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং বিবেকানন্দের বইপত্তর এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনা গ্রন্থ। দেখতে পাচ্ছি বিবেকানন্দ যেখানে রাজনীতির কথা বলেছেন সেই লাইনের নিচে দাগানো রয়েছে।' বড় মহারাজ জানালেন।

'বিবেকানন্দ? আশ্চর্য! বিবেকানন্দের বই কে ওকে যোগান দিল?'

'তিনু বলতে পারত। সে বেঁচে নেই, জানা যাবে না।'

'কোন মহিলা সংক্রান্ত কিছু?'

বড় মহারাজ কথা খুঁজে পেলেন না। সঠিক উত্তরটা দিতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মিথ্যে কথাটা কিভাবে বলা যায়, তা বুঝতে পারছিলেন না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ?'

'আপনার পুত্র হয়ে কিভাবে উচ্চারণ করব ?'

'সেকি ? ওর ফ্ল্যাটে মহিলা এসেছে নাকি ?'

'না। কিন্তু মহিলাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে।'

'হুঁ। শোন। তুমি বগলাচরণকে খবর দেবে যাতে সে আগামীকাল সকালে প্রার্থনার পর আমার সঙ্গে দেখা করে।' ইন্টারকম-এর সুইচ বন্ধ হতেই বড় মহারাজের মুখে হাসি ফুটল। বগলাচরণ! ইতিমধ্যে তিনি খবর পেয়েছেন বাবা বগলাচরণকে দিয়ে একটা উইল করিয়েছেন। উইলের বিষয়বস্তু এখনও তিনি জানেন না। কিন্তু ওই ব্যাপারে তাঁর মনে অস্বস্তি ছিল। আজ ছোটের কথা শোনার পর বাবা যখন বগলাচরণকে আবার ডেকে পাঠালেন, তখন নিশ্চয়ই ওই উইল বদল করবেন। বড় মহারাজের মনে হল ছোটে সম্পর্কে বাবার যাবতীয় দুর্বলতার আজ অবসান হল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাবৎ ভক্তবৃন্দকে সন্তুষ্ট করতে বাবা তাঁর ব্যালকনি থেকে বিকেলে বক্তৃতা দেবেন। খবর কলকাতা শহরে বাতাসের আগে দৌড়োয়। দুপুর থেকেই লোক জমছে রাজপথে। বিকেলের আগেই কালো মাথায় ভরে গেল চারদিক। এমনকি আশেপাশের সমস্ত বাড়ির জানলা, ছাদ লোকে ঠাসা। তিনতলার ঘরে বাবা স্নান সেরে উঠলেন। সেবিকারা তাঁকে পোশাক পরিয়ে দিল। এরপর বাবা বড় মহারাজকে ডেকে পাঠালেন। তিনতলার ঘরে সাধারণত কারো যাওয়ার হুকুম নেই। কথাবার্তা ইন্টারকমেই হয়ে থাকে। বড় মহারাজ বিচলিত হলেন। দ্রুত লিফটে তিনতলায় নেমে এসে বাইরের ঘরে বাবার সামনে নতজানু হয়ে বসলেন তিনি। বাবা হাসলেন, 'তোমার ছোটভাই তাহলে অধঃপতিত হয়েছে ?'

সুযোগ ছাড়লেন না বড় মহারাজ, 'ব্যাপারটা দুঃখজনক কিন্তু প্রমাণিত।'

'হুঁ! মন আমার ভাল নেই বড়। মেজ মানুষ হিসেবে ভাল, কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন। আমার অবর্তমানে এত মানুষের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা তার নেই। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এই যোগ্যতা অর্জন করেছ ?' বাবা সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি আপনার আদর্শে নিজেকে তৈরি করেছি।' দীপ্ত স্বরে জানালেন বড় মহারাজ।

'অর্থাৎ তুমিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কি বল ?'

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না বড় মহারাজ। সেটা নিজের কাছেই ঔদ্ধত্য বলে মনে হবে।

বাবা বললেন, 'দেখি, ভেবে দেখি। বগলাচরণ এলে তোমাকে ডাকবো মানুষজন কি এসেছে আমার কথা শুনতে ?'

পুলকিত বড় মহারাজ দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'এক লক্ষ মানুষ আগ্রহে অপেক্ষা করছে কোনরকম প্রচার ছাড়াই। তারা আপনার দর্শন চায়।'

'বেশ, বল।' বাবা উঠলেন।

'ছোটের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?'

'দেখি, ভেবে দেখি।'

'যদি আপনি তাকে ত্যাগ করেন, তাহলে সেটা খবরের কাগজ মারফত

জানিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। এতে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।' অত্যন্ত সাহসী হলেন বড় মহারাজ।

'হুম্।' বাবা আর কোন কথা বললেন না। ধীরে ধীরে তিনি ব্যালকনির দিকে এগিয়ে এলেন। সেবিকারা সেখানে মাইক চালু রেখেছিল। মানুষের সামান্য কথাই সম্মিলিত হয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে। বড় মহারাজ আগে এগিয়ে গেলেন ব্যালকনিতে। দুটো হাত ওপরে তুলে সবাইকে ইঙ্গিত করতে লাগলেন শান্ত হতে। তবু কথার আওয়াজ কমল না। শেষে তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার আমাদের পরমপূজনীয় বাবা আপনাদের দর্শন দিতে আসছেন। এই পবিত্র সময়ে আপনারা অবশ্যই নীরবতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।' কথা শেষ করে বড় মহারাজ দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে রেখে সরে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে বাবা ব্যালকনিতে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াতেই সমস্ত কলকাতা যেন হাততালিতে ফেটে পড়ল। সেইসঙ্গে ধ্বনি উঠল, 'জয় বাবা কি জয়।' বাবার মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল। তিনি ডান হাত মাথার ওপরে তুললেন হাস্যমুখে। মানুষজন সেই দৃশ্য দেখে যেন পাগল হয়ে উঠল। কেউ কেউ সাক্ষাৎ ভগবানকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এক বৃদ্ধ সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বাবা, দয়া কর, দয়া কর।' বাবা ধীরে ধীরে তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন ঈষৎ। তাঁর মুখ থেকে হাসি সরছিল না। তিনি হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁর হাতের মুদ্রায় বরাভয় ফুটে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সমস্ত শব্দ যেন অন্তর্হিত হল। সহস্র সহস্র মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি মাইকের দিকে তাকিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিলেন। বাবা যেই কথা বলতে ঠোঁট খুললেন, অমনি তাঁর হাত [illegible]। শরীরটা যেন প্রচণ্ড আলোড়ন খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল [illegible] এখন ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা নির্বাক। কিন্তু [illegible] বাবার মাথা থেকে রক্ত ছিটকে বেরোতে লক্ষ করেছেন [illegible]। চেতনা ফিরে আসতেই চিৎকার এবং কান্না আকাশ ফাটাল। বড় মহারাজ নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এইসময় সেবিকারা ভেতর থেকে ছুটে এসে বাবার শরীর আঁকড়ে ধরতেই বড় মহারাজ চেতনা ফিরে পেলেন। আকুল স্বরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাক্তার, ডাক্তার।' এই চিৎকার মাইক গ্রহণ করে চারধারে ছড়িয়ে দিল। বড় মহারাজ বাবার মাথায় হাত দিয়েই বুঝলেন কোন সম্ভাবনা নেই বেঁচে থাকার। সমস্ত শরীরে কাঁপন এল তাঁর। সময় হয়ে গেল, সময় এসে গেল।

ভেতরে টিভি চলছিল। ম্যানেজার বললেন, 'আপনাদের দেখে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু এই অসময়ে কি করে এলেন, জানতে আগ্রহ হচ্ছে। এখন এখানকার পরিস্থিতি এমন যে, কেউ সন্ধের পর বের হয় না।'

সুধাময় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমাদের সৌভাগ্য আপনি আমাদের গুরুভাই। তাই আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলার কোন কারণ দেখছি না।'

ম্যানেজার একটু ঝুঁকে বসতেই টিভিতে দিল্লী থেকে খবর আরম্ভ হল। সংবাদপাঠক প্রথমেই বললেন, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ কলকাতায় এক ভক্তসমাগমে বক্তৃতা করার সময় পাঁচ কোটি শিষ্যের পরমপূজ্য গুরু যিনি বাবা নামেই পরিচিত ছিলেন, অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন। আততায়ীরা কাছাকাছি কোন বাড়ির ছাদ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভক্তদের বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় কলকাতা রওনা হয়েছেন। বাবার উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্ভাব্য প্রার্থী বড় মহারাজ অল্পের জন্য রক্ষা পান। তিনি এই ঘটনাটিকে ধর্মের ওপর অধর্মের অত্যাচারের বর্বর নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন।'

তিনজন মানুষ আচমকা বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে গেলেন। ভেতরের ঘরে সংবাদপাঠক তখনও এই খবর পড়ে যাচ্ছেন। ইউনিসের চেতনা প্রথমে স্বচ্ছ হল, 'কি বলল ? বাবা ?'

সুধাময় কথা খুঁজে পেলেন না। তাঁর মুখ থেকে একটা তীব্র চিৎকার ছিটকে এল। দু হাতে মুখ ঢেকে তিনি কেঁদে উঠলেন। আর ম্যানেজার দৌড়ে চলে গেলেন ভেতরের ঘরে টিভির উদ্দেশে। ইউনিস উঠে এসে সুধাময়কে ঝাঁকাতে লাগল, 'খতম কর দিয়া ? বাবা মর গিয়া ?'

সুধাময় মুখ থেকে হাত সরাচ্ছিলেন না। ম্যানেজার আবার ফিরে গেলেন বাইরের ঘরে। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বাবা ইজ কিলড্। কিন্তু কে বাবাকে মারবে ? কেন মারবে ? ওঃ।'

সুধাময় তখনও আবেগে থরথর করে কাঁপছিলেন, 'যীশুখ্রীস্টকেও তো মানুষই মেরেছে। যাদের স্বার্থ ছিল, তারাই বাবাকে মেরেছে। এখন কি হবে ?'

ম্যানেজার বললেন, 'বড় মহারাজ বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন।'

'কেন ?'

সুধাময় মুখ থেকে হাত সরালেন।

'সেসব কিছু বলল না খবরে।'

সুধাময় উঠে দাঁড়ালেন, 'ইউনিস, আমাদের এখনই ছোটে মহারাজের কাছে যেতে হবে।'

'ছোটে মহারাজ ?' ম্যানেজার অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। আপনারা যাঁকে নির্মল বলে জানেন, তিনিই ছোটে মহারাজ।'

'সেকি ?'

'হ্যাঁ। আমাদের একটা গাড়ি দিতে পারেন ?'

'নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু এত রাত্রে রাস্তায় গাড়ি চালানো খুব রিস্কি।'

'ওসব ভেবে কোন লাভ নেই।'

'চলুন। আমিই গাড়ি বের করছি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটা জিপ তীব্র গতিতে চা-বাগান থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ল। ম্যানেজার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কেউ কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ সুধাময় বললেন, 'আপনি বাবার শিষ্য, এটা যেমন বিস্ময়ের বিষয়

তেমনি আপনার ওখানে মৃত্যুর ঘটনাটা শোনাটাও অদ্ভুত ব্যাপার। যেন বাবার ইচ্ছেতেই এগুলো ঘটল।'

'যিনি এত জানতেন তিনি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেননি?' ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন, এই প্রশ্নের কেউ কোন উত্তর দিল না।

সবে খাওয়া শেষ হয়েছে। লাবণ্য টয়লেটে গিয়েছে। এই সময় ওঁরা ঘরে ঢুকলেন ঝড়ের মত। নির্মল তখন জল খাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? যাননি?'

সুধাময় দুটো হাত জোড় করে কেঁদে উঠলেন। অন্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

'কি হয়েছে?' নির্মল এগিয়ে এল।

ম্যানেজার বললেন, 'বাবা ইজ মার্ডারড্। আজ বিকেলে।'

নির্মল বড় বড় চোখে লোকটিকে দেখল। তার ঠোঁট নড়ল, 'মার্ডারড্?'

'ইয়েস।' ম্যানেজার বললেন, 'সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে গুলিতে মারা যেতে হয়েছে তাঁকে।'

নির্মল চোখ বন্ধ করল। মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা জানলেন কি করে?'

'টিভিতে বলল।' ইউনিস জবাব দিল।

'কে মেরেছে?'

ম্যানেজার বললেন, 'ধরা পড়েনি কেউ।'

এইসময় লাবণ্য ঘরে ফিরল। এদের দেখে সে অবাক। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

[illegible] ওর দিকে ফিরল, 'এঁরা টিভিতে শুনেছেন বাবা নিহত হয়েছেন [illegible]?' লাবণ্য অবাক হল।

pathagar.net

সুধাময় এবার এগিয়ে গেলেন, 'ছোটে মহারাজ, সময় হয়েছে। এবার আপনি ফিরে চলুন।'

'তার মানে? ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে আমার ফিরে যাওয়ার কি সম্পর্ক?'

'আপনি না গেলে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তাতে আমার কি? ধর্মের নামে যে এক্সপ্লয়টেশন চলছিল, তা আরও কিছুদিন চলবে। এতে আমার কি ভূমিকা থাকতে পারে?'

'পারে।' সুধাময় বললেন, 'এবং আমার বিশ্বাস আছে। পাঁচ কোটি মানুষের আনুগত্য পেলে আপনি এইভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করে যা করতে চাইছেন তা অনেক সহজেই করতে পারবেন। দশবছর ধরে মানুষের উপকার করার পরও তারা আপনাকে ঠকাতে পারে, আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু পাঁচ কোটি মানুষ যদি আপনাকে গুরুর আসনে বসায় তাহলে তাদের আনুগত্য সবসময় পাবেন। এদেশে কখনই ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতা, এক ব্যক্তি হয়নি। সেই সুযোগ আপনি হাতছাড়া করবেন না।'

নির্মল চমকে উঠল। এইরকম একটা ভাবনা তার মাথাতেও এসেছিল। মন আর শরীরের চিকিৎসা একই সঙ্গে করার সুযোগ এসেছে। বড় মহারাজ চাইবেন

ক্ষমতা দখল করতে। সিনিওরিটির জোরে তিনি তা চাইতেই পারেন। কিন্তু। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সেখানে গেলেই যে ক্ষমতা পাব তার কোন স্থিরতা নেই। আমার ওপরে দুই দাদা আছেন।'

সুধাময় হাসতে চেষ্টা করলেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে জয়ী হবার সম্ভাবনাই বা আসবে কি করে? আমরা কেউ জানি না, বাবা তাঁর উইলে কি কথা লিখে গেছেন!'

নির্মল চোখ বন্ধ করল। তার শরীর শিহরিত হল। শরীরে কাঁটা ফুটল। গাঢ় স্বরে সে বলল, 'বাবা আমার জন্মদাতা। আর কিছু না হোক তাঁর পারলৌকিক কাজের সময় আমার উপস্থিতি মানুষ হিসেবে কর্তব্য।'

'তাহলে এখনই চলুন। এখন রাত বেশি নয়। এখনই রওনা হয়ে গেলে আমরা কাল এগারটার মধ্যে পৌঁছে যাব কলকাতায়। আর বাবার মৃত শরীর যদি আশ্রমে নিয়ে আসা হয় তাহলে তা পথেই পড়বে।'

নির্মল চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে গেল। লাবণ্য তাকে সাহায্য করল। এবং এইসময় সুধাময় বললেন, 'অপরাধ না নেন তো বলি। আপনি একা আমাদের সঙ্গে চলুন। ওঁকে সঙ্গে নেবেন না।'

নির্মল তীব্রস্বরে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

সুধাময় মাথা নত করলেন, 'আপনি বিচক্ষণ। আশ্রমের নিয়ম তো আপনার অজানা নয়। আমি যতদূর জানি, এখনও মহারাজ উপাধি আপনি পাননি।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে চাইছি। লাবণ্য সঙ্গে থাকলে অসুবিধে হবে কেন?'

'ওঁকে সঙ্গে দেখলে শত্রুদের হাত শক্ত হবে। তারা আপনার বদনাম করবে। মহারাজ হবার আগে কোনরকম স্ত্রীসংসর্গ রাখা আশ্রমের আইনবিরুদ্ধ। এমনিতেই আপনার চলে আসার সময় সার্টপ্যান্ট পরা এক মহিলা সঙ্গে ছিল বলে গল্প চালু আছে। কানে শোনা এক ব্যাপার আর চোখে দ্যাখা অন্য জিনিস। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনার যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আপনি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হঠকারিতা করেন না।'

সুধাময় খুব শান্ত স্বরে কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন।

নির্মল একমুহূর্ত চুপ করে থাকল। সুধাময়ের কথাগুলো কঠোর হলেও সত্য। পাঁচ কোটি মানুষের শ্রদ্ধার্জনের জন্যেই লাবণ্যকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু সমস্যা মিটে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই কিছু করার স্বাধীনতা থাকবে তার। সে বলল, 'আপনারা পাঁচ মিনিটের জন্যে যদি বাইরে অপেক্ষা করেন তাহলে খুশি হব। লাবণ্যর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

তিনটে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। নির্মল লাবণ্যর দিকে তাকাল, 'সমস্ত ঘটনা তুমি শুনেছ। এই পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?'

লাবণ্য হাসল, 'সিদ্ধান্ত তো তুমি নিয়েই ফেলেছ।'

'হ্যাঁ। তবু, এখনও সময় রয়েছে।'

'তুমি কেন ফিরে যাচ্ছ তা তোমার কাছে কি স্পষ্ট?'

'হ্যাঁ। পাঁচ কোটি মানুষের আনুগত্য পেলে অনেক কাজ করা সহজ হয়ে যায়।'

'শুনেছি সিংহাসনে বসলেই রাজার মত ব্যবহার করতে হয়। সেক্ষেত্রে— ।'

'সিংহাসন ছেড়ে যে একবার সরে আসে সে সিংহাসনে বসলেও নিজেকে সমর্পণ করে না। লাবণ্য, আমি চাই এই মানুষগুলোকে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের হাত থেকে বাঁচাতে। তুমি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ?'

নীরবে মাথা নাড়ল লাবণ্য, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, কিন্তু তুমি যোগাযোগ করবে কি করে ?'

'আমি করে নেব। তুমি চিন্তা করো না।'

নির্মল তবু দাঁড়িয়ে রইল। সে ঠিক জানে না তাকে কোন অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করে রাখছিল কিনা। সে বলল, 'এখন রাত। তুমি আমাদের সঙ্গে চল। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে হবে না।'

'আমার হবে। এত রাত্রে সেখানে দরজা খোলানো মুস্কিল হবে। তাছাড়া এখন আমি ভাবতে পারব না যে রাত বলেই তুমি আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ। দ্বিধা করো না। আমরা যা করতে যাচ্ছিলাম তা তুমি যদি আরও সহজে করতে পার তাহলে তার চেয়ে খুশির ব্যাপার আর কি হতে পারে ?'

'তুমি এইঘরে একা থাকতে পারবে ?'

'একটাই তো রাত। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

নির্মল তবু ইতস্তত করছিল। লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না।'

[illegible] পৌঁছে আর একবার পেছন ফিরে তাকাল নির্মল। শূন্য ঘরে লাবণ্য [illegible] দুহাতে পেছন দিকে শরীরের ভর করে শূন্যে চেয়ে আছে। [illegible] ভেতরটা ফাঁকা লাগছিল নির্মলের। এই সময় সুধাময় চাপা [illegible] ডাকলেন, 'ছোটে মহারাজ!'

নির্মল দ্রুত জিপের দিকে পা চালাল।

মধ্যরাত্রে শিলিগুড়িতে পৌঁছে ম্যানেজার একজন সাপ্লায়ারকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন, পথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। নির্মল ম্যানেজারের পাশে গম্ভীর মুখে বসেছিল। এই লোকটা এতদিন তার অনেক কাজই অসন্তোষের চোখে দেখেছে। চা কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে চা বাগানে ম্যানেজার একজন ব্যুরোক্র্যাট। সেই লোক বাবার শিষ্যত্ব নিয়েছিল কি কারণে, তা তিনিই জানেন। হয়তো ওঁর কোম্পানির মালিকদের কেউ বাবার শিষ্য। চাকরিতে উন্নতির প্রয়োজনে তাঁকে শিষ্যত্ব নিতে হয়েছে। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তিনিই জিপ চালিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। শিলিগুড়িতে আসার পথে তাঁর মনে পড়ল কোন অনুমতি ছাড়া তিনি চা-বাগান ছেড়ে বাইরে যেতে পারেন না। সেই কারণেই সাপ্লায়ারকে ডেকে মধ্যরাতে আর একটা গাড়ির ব্যবস্থা করলেন ভদ্রলোক। চা-বাগানের সাপ্লায়াররা ম্যানেজারকে খুশি করতে পারে না, এমন কাজ নেই।

শিলিগুড়িতেই বিদায় নিলেন ম্যানেজার। রাত সেখানেই কাটিয়ে ভোরে

ফিরবেন। জি এন এল এফের ভয়ে মাঝরাতে একা গাড়ি চালাবার সাহস নেই। বিদায় নেবার আগে হঠাৎ তিনি প্রায় নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন নির্মলকে। ছিটকে সরে গেল নির্মল। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার বললেন, 'হয়তো একসময় অনেক অন্যায় করেছি কিন্তু তা না জেনেই ঘটেছে। আপনার কৃপা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।'

তিনজন যাত্রী নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে রওনা হল গাড়ি। সুধাময় হিসাব করছিলেন যদি পথে কোন বিভ্রাট না হয়, তাহলে কলকাতায় পৌঁছাতে বারোটা বেজে যাবে। তবে ভোর ছটা নাগাদ পথেই আশ্রম পড়বে। সেখানে খোঁজ নেওয়া দরকার। এমনও হতে পারে বাবাকে সবাই সকালে আশ্রমে ফিরিয়ে আনছে।

নির্মল কোন কথা বলছিল না। তার মুখ গম্ভীর, ঠোঁট শক্ত। লাবণ্যর মুখ মনে পড়ছিল শিলিগুড়ি পর্যন্ত। ওরা একসঙ্গে উত্তর বাংলায় এসেছিল। আলাদা ছিল কিন্তু দূরত্বে বেশি নয়। যদি তাকে ফিরতে না হয় এখানে তাহলে লাবণ্যকে দশ বছর এখানে একাই থাকতে হবে। বুকের ভেতর আরও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। লাবণ্যকে সে বন্ধুর মত নিয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে আর একটা মন যে বড় হচ্ছিল চুপচাপ, তাকে আজ টেনে সামনে নিয়ে আসছিল লাবণ্য!

কিন্তু এসব চিন্তা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল যেই ম্যানেজার তাকে প্রণাম করলেন। অত বয়স্ক একটি মানুষ নিশ্চয়ই স্বার্থচিন্তা করে তাকে প্রণাম করেছে। তা সত্ত্বেও কেন নিজেকে মূল্যবান মনে হচ্ছে। লোকটা তার কাছে কৃপা চাইল। মানুষ কৃপা চায় ক্ষমতাবানের কাছে। তার তো কোন ক্ষমতাই নেই। সুধাময় যা বলছেন তা সম্ভব না হবার সম্ভাবনাই বেশি। সে যাচ্ছে শুধুই একটা সুযোগ নেওয়ার জন্যে। বাবা যা নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাই মান্য করবে সবাই। যতদূর মনে পড়ছে দশজন মহারাজ সিদ্ধান্ত নেবেন যদি বাবার কিছু ঘটে, এইরকম একটা আভাস পেয়েছিল সে একসময়।

বাবা চলে গেলেন। পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটিকে গুলি করে হত্যা করা হল। তিনু মহারাজ তাকে প্রায়ই সতর্ক করতেন বাবার শত্রুদের সম্পর্কে। কলেজ থেকে বেরিয়ে একা যেন কোথাও না যায় সে। সনাতননাথ, আনন্দ সরস্বতী প্রভৃতি নামগুলো সেইসময় শুনেছে সে। শুধু ঈর্ষা থেকেই গুরু পরিবারগুলো কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে বাবা খুন হবেন ওঁদের হাতে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল নির্মলের। এবং তখনই তার মনে হল, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোন রাজনীতির খেলা নেই তো? ধর্ম চিরকাল এদেশে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু রাজনীতি সেটা মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়ে। আর যে বাধ্য হয় তার ভেতরে একটা জ্বালা থাকেই। সেই জ্বালা থেকেই প্রতিশোধ কিংবা কাঁটা সরিয়ে দেবার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। সমগোত্রীয় অন্যান্য ধর্ম-শরিকরা হয়তো এ ব্যাপারে রাজনীতিকে মদত দিতে পারে। নির্মলের চোয়াল শক্ত হল।

সকাল সাতটায় গাড়ি পৌঁছে গেল আশ্রমে। নির্মলের মনে হল সে শ্মশানপুরীতে ঢুকছে। কোথাও কোন মানুষ নেই। কিন্তু দূর থেকে আনন্দভবনের দিকে তাকিয়ে সে গাড়ি থামাতে বলল। হাজার হাজার মানুষ

নীরবে বসে আছে উপাসনামন্দিরের সামনের মাঠে। কেউ কোন কথা বলছে না। বসার ভঙ্গী এতদূর থেকেও যা বোঝা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট ওরা ওই অবস্থায় রয়েছে অনেকক্ষণ।

সুধাময় বললেন, 'ছোটে মহারাজ, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে মেজ মহারাজের কাছে যাওয়া উচিত।'

নির্মল বলল, 'আমার মনে হয় না কালকের ঘটনার পর তিনি আশ্রমে আছেন। চলুন।'

গাড়ি ঘুরিয়ে মেজ মহারাজের ভবনের কাছে নিয়ে আসা হল। সেখানে তিনজন সেবক গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তারা সতর্ক হল। যেহেতু ছোটে মহারাজ সম্পর্কে কোন নির্দেশ নেই তাই কি করবে বুঝতে পারছিল না। দ্রুত ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে সুধাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেজ মহারাজ কি কলকাতায়?'

একজন সেবক জবাব দিল, 'কাল খবর পেয়েই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আজ ভোরে আবার ফিরে এসেছেন। ভবনেই আছেন।'

'বাবার পারলৌকিক কাজ কোথায় হবে?'

'আশ্রমেই। বারোটা দশ মিনিটে তাঁকে নিয়ে আসবে হেলিকপ্টার।'

সুধাময় ছুটে এলেন ছোটে মহারাজের কাছে, 'বাবাকে এখানেই আনা হবে বারোটার সময়। আমাদের আর কলকাতায় যেতে হবে না। খানিকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। আপনি মেজ মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি আজ ভোরেই ফিরে এসেছেন কলকাতা থেকে।'

'কেন?' ছোটে মহারাজ চোখ তুললেন।

'অপরাধ নেবেন না। আমি জানি না আপনি দীক্ষিত কিনা। যদি না হন, তাহলে বাবার কাজ হয়ে যাওয়ার আগে আপনার দীক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যাপারটা সাহায্য করবে। বাবার আশীর্বাদ থাকবে আপনার ওপর।'

'বাবার আশীর্বাদ! আমি দীক্ষায় বিশ্বাস করি না।'

'ছোট মুখে বড় কথা বলছি। যুদ্ধে কখনও কখনও অপছন্দের কাজ করতে হয় কৌশলের কারণে। দীক্ষা হল একটা পথে হাঁটার স্বীকৃতি।' সুধাময় বিনীতস্বরে বললেন।

ছোটে মহারাজ মাথা নেড়ে হাঁটতে লাগলেন। একজন সেবক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটু নার্ভাস বোধ করছিলেন তিনি।

বাবার ছবির সামনে পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে ছিলেন মেজ মহারাজ। সেবককে চলে যেতে ইঙ্গিত করে ছোটে মহারাজ সেই ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পায়ের আওয়াজে চোখ খুললেন মেজ মহারাজ। প্রথমে বিস্ময় পরে হাসি ফুটে উঠল মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেটা নিভে গেল, 'সেই এলে কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেললে।'

ছোটে মহারাজ বাবার ছবির দিকে তাকালেন। যেন শান্ত মুখে তাঁকে লক্ষ করছেন বাবা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছিল?'

'কলকাতার বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে যাওয়ার মুখে কেউ

বিপরীত দিকের বাড়ির ছাদে বসে তাঁকে গুলি করে।'

'কে?'

'জানা যায়নি। কেউ ধরা পড়েনি।'

'কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না। কারণ মিথ্যে বলা হবে। ওঁকে আজ দুপুরে এখানে আনা হবে। বড় মহারাজ সেই থেকে সঙ্গে আছেন। আমি কিছু ভাবতে পারছি না ছোটে। এইভাবে পিতৃহীন হব।' ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেজ মহারাজ। 'এখন এই আশ্রমের কি হবে?'

'আপনি শক্ত হন।'

চোখ মুছলেন মেজ মহারাজ, 'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে তিনি কিরকম উতলা হয়েছিলেন তা আমিই জানি। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'মানুষ দেখতে।'

'অর্থাৎ?'

'দেশের মানুষ কি অবস্থায় আছে, তা দেখতে চেয়েছিলাম আমি।'

'আমাদের কাউকে না জানিয়ে, চোরের মত পালিয়ে গিয়ে?'

'আপনি এমন ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল।' ছোটে মহারাজ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

'কি ব্যাপার?' বিস্ময় ফুটে উঠল মেজ মহারাজের মুখে।

'আমাকে দীক্ষা দিন। আজ এবং এখনই।'

'না! অসম্ভব। এখন দীক্ষা হতে পারে না। এখন আমাদের কালাশৌচ চলছে।'

'কালাশৌচ? এই সময়ে মানুষ আহার গ্রহণ করে না? প্রাকৃতিক কাজগুলো বন্ধ রাখে? দীক্ষা মানে নিজের পথ খুঁজে পাওয়া। কালাশৌচ বলে আপনি কি আমাকে পথ দেখাবেন না? ওই ছবির দিকে তাকিয়ে বলুন, না।' ছোটে মহারাজের গলা চড়ছিল।

'তুমি, তুমি আমার সঙ্গে এই গলায় কথা বলছ?'

'আমি আপনাকে অশ্রদ্ধা করছি না। আমাকে দীক্ষিত করা উচিত, আপনার নিজের স্বার্থে।'

'তার মানে?'

'আজ বাবা নেই। আশ্রমের দায়িত্ব নিশ্চয়ই নিতে চাইবেন বড় মহারাজ। তিনিই শাসন করবেন পাঁচ কোটি মানুষকে। আমি জানি, তাঁর সঙ্গে আপনি সব ব্যাপারে একমত নন।'

'না। বাবা উইল করে গেছেন কে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবে। গতকাল সকালে তিনি উইল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আর সময় পাননি। বড় মহারাজ যে ক্ষমতা পাবেনই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি পেতে পারেন, আমি পারি, আবার দশজন মহারাজের যে কেউ পেতে পারেন।'

'ভাল। কালাশৌচের অজুহাত দিচ্ছেন। কোন পরিবারের কেউ মারা যাওয়ার খানিকবাদে যদি কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহলে কি তার মুখে মধু দেওয়া হয় না?'

'হয়।' মাথা নাড়লেন মেজ মহারাজ।'

'তাহলে আমাকে দীক্ষা দিতে আপনার বাধা কোথায় ?'

'তুমি পবিত্র নও বলে অভিযোগ উঠেছে।'

'পবিত্র নই মানে ?'

'তোমার সঙ্গে কোন নারীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।'

'প্রমাণ ?'

'না, কোন প্রমাণ নেই।'

'তাহলে ? আমার সম্পর্কে কুৎসা ছড়িয়ে আপনার কি লাভ ?'

'আমি ছড়াইনি। বড় মহারাজ কলকাতায় তোমার ঘরে নারীদের ব্যবহার্য জিনিস পেয়েছেন।'

'বাজে কথা। তিনি বানিয়েছেন ঘটনাটা।'

'তুমি সত্য বলছ ছোটে ?'

'আমি জ্ঞানত মিথ্যে বলি না। আজ পর্যন্ত কোন নারীকে আমি স্পর্শ করিনি শুধু আমার মা ছাড়া।'

'বেশ। তোমার দাবী আমি মেনে নিচ্ছি। তোমার মন্দ ভাগ্য। পরম পূজনীয় বাবার কাছ থেকে দীক্ষা নেবার অধিকার ছিল তোমার। পেলে না।'

'মানুষের মৃত্যুতেই তার সব শেষ হয়ে যায় না। আমি আপনার মাধ্যমে তাঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছি। আপনি আয়োজন করুন।'

ঠিক বারোটা দশে মৃতদেহ নিয়ে হেলিকপ্টার নামল আশ্রমের হেলিপ্যাডে। সমস্ত মহারাজদের নিয়ে মেজ মহারাজ দাঁড়িয়েছিলেন সামনে। পেছনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। মৃতশরীর নামানো মাত্র কান্নার রোল উঠল। বড় মহারাজকে অত্যন্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি, মেজ মহারাজ এবং অন্যান্যেরা সুদৃশ্য খাটে বাবাকে শুইয়ে ফুলমালায় সাজাতে লাগলেন। হঠাৎ বড় মহারাজ যেন ভূত দেখলেন, 'তুমি ? এখানে ?'

ছোটে মহারাজ বাবার নিথর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'যে অধিকারে আপনি এখানে, সেই অধিকারেই আমি এসেছি।'

'তুমি কার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলছ জানো ?'

'জানি। বাবার এক শিষ্যের সঙ্গে।' ছোটে মহারাজ বাবার পাশে দাঁড়ালেন।

'না। তুমি স্পর্শ করবে না। দীক্ষিত মানুষেরাই শুধু ওঁকে স্পর্শ করতে পারেন।'

'নিয়মটা যদি তাই হয় তাহলে আমি বেনিয়ম করছি না। আমি দীক্ষিত।'

'কার কাছে দীক্ষা নিয়েছ তুমি ? পরিবারের গুরুজনদের বাইরে কারো কাছে দীক্ষা নিলে সেটা অবৈধ হবে।'

'এটাও অযৌক্তিক। তবু আমি পরিবারের গুরুজনের কাছেই দীক্ষিত হয়েছি। মেজ মহারাজ আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। দোহাই, একটু সংযত হন। বাবা এখনও সামনে রয়েছেন।' মেজ মহারাজ তখন বাবার খাট কাঁধে নিচ্ছিলেন অন্য মহারাজদের সঙ্গে। ছোটে মহারাজ এগিয়ে গিয়ে কাঁধ দিলেন। বড় মহারাজ স্তম্ভিত।

বাবার শরীর সমস্ত দুপুর উপাসনামন্দিরের সামনে সযত্নে শায়িত রইল। হাজার হাজার ভক্ত লাইন দিয়ে এসে শেষ দেখা দেখে যাচ্ছেন। চিৎকার কান্নায় চারধার ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ছোটে মহারাজ চুপচাপ বাবার পায়ের কাছে বসে ছিলেন। বড় মহারাজ কোন কথা বলছিলেন না। মেজ মহারাজই ব্যস্ততার সঙ্গে পরবর্তী কাজগুলো তদারকি করছিলেন। এইসময় ভিড় ঠেলে কোনরকমে সুধাময় ছোটে মহারাজের পাশে এসে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ইউনিস একটি লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছে যার সঙ্গে আপনি কথা বললে সুবিধে হবে।'

ছোটে মহারাজ উঠলেন। সেবকরা তাঁকে রাস্তা করে দিল। বড় মহারাজ তাঁর যাওয়াটা লক্ষ করলেন, কিছু বললেন না। জনতার মধ্যে দিয়ে বাইরে আসতে অনেক সময় লাগল। বটগাছতলায় একটি বৃদ্ধ তখন মুখে দুই হাত রেখে বসে। পাশে ইউনিস দাঁড়িয়ে। কয়েকজন উৎসুক মানুষ তাদের দেখছে। ছোটে মহারাজ পৌঁছনো মাত্র ইউনিস বলল, 'এই বুড়ো বাবার কাছে যেতে চাইছিল। যেতে না দেওয়ায় গালাগাল করছে।'

'কেন যেতে দেওয়া হয়নি? ভক্ত শিষ্যদের বাবাকে অন্তিমদর্শনের অধিকার আছে।'

ইউনিস মাথা নিচু করল, 'এর মাথা ঠিক নেই।'

'কেন?' ছোটে মহারাজ প্রশ্নটা করেই ঈষৎ ঝুঁকলেন, 'কি হয়েছে?'

বৃদ্ধ মুখ তুলল, 'সর্বনাশ। সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। আমি ওঁকে দেবতা মনে করতাম। আমার মেয়েকে পাঠিয়েছিলাম আশ্রমে। সে ফেরত গেল পেটে বাচ্চা নিয়ে। প্রতিকারের জন্যে ছুটে এলাম এখানে। ওরা আমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। মেজ মহারাজ আমাকে উদ্ধার করলেন। তিনি এক হারামজাদার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। সেই বদমাস টাকার লোভে আমার মেয়েকে বিয়ে করল। কিন্তু যেই কাল শুনতে পেল বাবা নেই, অমনি মেরেধরে মেয়ে আর নাতিকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।'

'কেন?'

'নাতিটা ওর বাচ্চা নয়। বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই সে জন্মেছিল। আমার দেবতা আজ মরে গেছে। তার শরীরকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব যদি সে এর প্রতিকার না করে।' চিৎকার করে উঠল বৃদ্ধ।

ছোটে মহারাজ অবাক হয়ে সুধাময়ের দিকে তাকালেন। সুধাময় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আশেপাশের মানুষগুলোর চোখ চকচক করছে গল্প পেয়ে। ছোটে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় কাজ করছিল মেয়ে?'

'আশ্রমের কাজে ছিল সে।'

'আশ্রমের কোন কাজে?'

'আমার আর কোন ভয় নেই। মেরে ফেলুক তবু বলব। বড় মহারাজের ভবনে সে কাজ করত।'

'সে কিছু বলেছে? কে দায়ী?'

'উঃ। দুপুর বেলায় মেঘ না থাকলে কোত্থেকে রোদ পড়ছে তা কি বলে দিতে হয়?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কামড়ালেন ছোটে মহারাজ ,'মেজ মহারাজ এই ঘটনা জানেন যখন তিনি তোমার মেয়ের বিয়ে দিলেন ?'

'না। তিনি জিজ্ঞাসা করেননি।'

'তুমি যে অভিযোগ করছ, তা সত্যি ?'

'নিজের মেয়ের নামে কোন অভাগা বদনাম দেয় ?'

'বেশ। কিন্তু চিৎকার করে এর সুরাহা হবে না। তুমি এখনই গ্রামে ফিরে যাও। তোমার মেয়ে আর নাতিকে আজই এখানে নিয়ে এস। এঁরা তোমাকে সাহায্য করবেন। আজ থেকে ওদের সমস্ত দায়িত্ব আশ্রমের।' ছোটে মহারাজ ইউনিসকে ইঙ্গিত করতেই বৃদ্ধ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল , 'আজ থেকে তুমিই আমার দেবতা।'

পা সরিয়ে নিলো ছোটে মহারাজ। কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল যেন। দেবতা! শব্দটি সমস্ত শরীরে মনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দ্রুত পা চালালেন তিনি। এখন আর পেছন ফিরে তাকাবার সময় নেই।

গোধূলি লগ্নে বাবার শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। ঠিক চারটের সময় উকিল বগলাচরণ এলেন। আনন্দভবনের একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁর সামনে বড় এবং মেজ মহারাজ বসে আছেন। প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত। দশজন মহারাজ তাঁদের পেছনে। এই বিশেষ সভা যেহেতু মহারাজদের নিয়েই তাই ছোটে মহারাজ প্রবেশাধিকার পাননি। তিনি দীক্ষিত হলেও বাবা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাজ পদে স্বীকৃতি দেননি। ছোটে মহারাজ ছিল তার নিতান্তই আদরের ডাক। পরিবেশ খুব গম্ভীর। বগলাচরণ কান্না জড়ানো স্বরে বললেন, 'এখনও বাবার শরীর আমাদের মধ্যে রয়েছে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দাহ করার আগে যেন আমি আপনাদের সামনে তার উইল পড়ে শোনাই। বাবার শিষ্য হিসেবে এই পবিত্র দায়িত্ব আমার ওপর তিনি অর্পণ করেছেন। আপনারা সবাই আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। এই অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তিনি একটা সিল করা খাম খুললেন।

বগলাচরণ বাবার উইল পড়তে লাগলেন, 'আমার জীবদ্দশায় আমি মানুষের সেবা করতে চেয়েছি আমার মত করে। আমি যখন থাকব না, তখন যে দায়িত্ব নেবে তাকে সেই কাজ করতে হবে।' বগলাচরণ পড়ে চললেন। নানান ব্যাপারে বাবা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। ধর্মীয় অনুশাসন যেন কঠোর ভাবে রক্ষা করা হয়, অর্থনৈতিক ব্যাপারে যেন কোন অনাচর না হয়—সব ব্যাপারেই তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। বগলাচরণ শেষ পরিচ্ছেদে এলেন, 'সমস্ত ব্যাপার এবং পরিস্থিতি চিন্তা করে আমি আদেশ দিচ্ছি আশ্রমের আচার অনুষ্ঠান পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিচ্ছি বড় মহারাজকে। সে যতদিন সত্যনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ থাকবে ততদিনই এই কাজের দায়িত্ব পাবে। মেজ মহারাজকে আশ্রমসংবাদ সম্পাদনা, শিষ্যদের সঙ্গে আশ্রমের তরফে যোগাযোগ এবং অর্থ কমিটির একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত করছি। মহারাজ ক, খ, গ, ঘ ওই অর্থকমিটিতে থাকবে। মহারাজ ঙ, চ, ছ, জ একটি কমিটি তৈরি করবে যার ওপর আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকবে।

'আমার এই উইল পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব আমি বগলাচরণকে দিচ্ছি। এটি পাঠ করতে হবে আমার মুখাগ্নি হবার আগে। সেই মুহূর্তে যদি আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান নির্মল আশ্রমে উপস্থিত থাকে, তবে সে আমার মুখাগ্নি করবে। মুখাগ্নি করবার আগে সে যদি দীক্ষিত হয় তাহলে তাকে মহারাজ পদে গ্রহণ করার আদেশ দিলাম। আমার মৃত্যুর পরে সে অর্থকমিটি এবং নিয়মশৃঙ্খলা রূপায়ণের কমিটির প্রধান হবে। এবং সে যদি নিজের গুণ ও ক্ষমতায় শিষ্যদের শ্রদ্ধার্জন করতে পারে, তাহলে আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আমার শরীর বিনষ্ট হবার আগে তার কোন সন্ধান না পাওয়া গেলে অথবা দীক্ষিত না হলে সে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সেক্ষেত্রে আমার মুখাগ্নি করবে বড় মহারাজ জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবেই এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার তার ওপর বর্তাবে। আমার শরীর যেন আশ্রমপ্রাঙ্গণেই ভস্মীভূত হয়। যে ধর্মজীবনের স্বপ্ন আমি দেখে এসেছি, তা যেন আমার উত্তরাধিকারী বাস্তবে রূপায়িত করে।'

বগলাচরণ পড়া শেষ করে বললেন, 'এই উইলের আরও দুটো কপি যথাস্থানে সুরক্ষিত আছে। এখন আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

কয়েক মুহূর্ত ঘরে এমন নৈঃশব্দ্য এল যেন নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত 'ক' মহারাজ বললেন, 'তাহলে ছোটে মহারাজকে এখানে আসতে বলা উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে বড় মহারাজ তীব্র প্রতিবাদ করলেন, 'না। এ অসম্ভব। আশ্রমের পবিত্রতার সঙ্গে ছোটের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মাচরণের কোন তত্ত্ব সে জানে না। সে এখনও অস্থিরমতি, বাস্তবজ্ঞান শূন্য, আধ্যাত্মিকবোধ রহিত। বাবা এই দিকটি চিন্তা করেননি।'

'কিন্তু মৃতের উইল অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই কি?' 'ক' মহারাজ প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়ই। বাবা বলেছেন মৃত্যুর সময় ছোটেকে এখানে উপস্থিত থেকে দীক্ষিত হতে হবে।' বড় মহারাজ হাসলেন, 'না। সে ছিল না। সে তখন নিরুদ্দিষ্ট। আশ্রমের এই ক্ষমতা অর্জন করবে যে তার কানে বাবার জীবদ্দশায় বীজমন্ত্র প্রবেশ করেনি। এক্ষেত্রে বাব তো স্পষ্টই বলে গিয়েছেন কি করতে হবে।'

বগলাচরণ বললেন, 'একটু ভুল হল বোধহয়। মৃত্যুর আগে শব্দদুটি তিনি বলেননি, উইলে লেখা আছে মুখাগ্নির আগে এই উইল পাঠ করার মুহূর্তে তিনি যদি আশ্রমে উপস্থিত থাকেন এবং দীক্ষিত হন তাহলেই হবে। তিনি উপস্থিত জানি কিন্তু দীক্ষিত কিনা তা জানি না। বাবার মৃত্যুর আগে যদি তিনি দীক্ষিত না হন তাহলে সেটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আপনাদের নিয়ম পরিবারের গুরুজনদের কাছে দীক্ষিত হওয়া।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'আজ সকালে ছোটে আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে।'

বড় মহারাজ চিৎকার করলেন, 'এই দীক্ষা অবৈধ। এখন আমাদের কালাশৌচ চলছে। এই অবস্থায় দীক্ষা দিয়েও তুমি অন্যায় কাজ করেছ।'

মেজ মহারাজকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'বাবা এইরকম নির্দেশ কখনও দেননি। বরং একবার এক সদ্য বিধবাকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তার

স্বামীর শ্রাদ্ধ হবার আগেই। বলেছিলেন, তোমাকে **পথ করে** দিলাম বেঁচে থাকার।'

'ক' মহারাজ বয়সে সবার প্রবীণ। তিনি বললেন, 'বাবার শেষ ইচ্ছা মান্য করা আমাদের কর্তব্য।' বড় মহারাজ মাথা নাড়লেন, 'না। এসব বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল না। মৃত্যুর দিন তিনি উইল পাল্টাতে চেয়েছিলেন। সেইমত বগলাচরণকে সন্ধ্যায় দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কি বগলাচরণ, বল?'

বগলাচরণ স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, ঘটনা সত্য। তবে জানি না বদলে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাতিল না হওয়ায় এই উইল এখন আইনসম্মত।'

মেজ মহারাজ এবার সোজা হয়ে বসলেন, 'আমাদের কিছু করা উচিত নয় যাতে বাবার অসম্মান হয়। তিনি যে আদেশ দিয়েছেন তা মাথা পেতে নিতে হবে। আপনারা অনুমতি দিলে ছোটেকে ডাকা যেতে পারে। মুখাগ্নির সময় হয়ে এল।'

বড় মহারাজ পাগলের মত চিৎকার করলেন, 'না। সে লম্পট। চরিত্রহীন। এতবছর ধরে আমরা আশ্রমের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করলাম আর সে এসবের বাইরে থেকেও আজ হঠাৎ সিংহাসনে বসবে, তা হতে পারে না।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'আপনি এমনভাবে বিচলিত হবেন না। বাবা ছোটেকে আপাতত মুখাগ্নি করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু বলেছেন উত্তরাধিকার অর্জন করতে হলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আপনি ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন তা সামনাসামনি বলুন। একজন লম্পট নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার্জন করতে পারে না।'

বড় মহারাজ হতাশায় ভেঙে পড়ছিলেন। ছোটে মহারাজকে ডেকে পাঠালেন **তিনি, হতাশ গলায়** বলে উঠলেন, 'কে কবে শুনেছে বড় ছেলে থাকতে ছোট **মুখাগ্নি করে**।'

'**মুখাগ্নিতে** এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?'

'চুপ করো। তোমার বিষয়জ্ঞান কোনদিন হবে না।'

এইসময় ছোটে মহারাজ ধীরে ধীরে ঘরে এল। বলল, 'এইসময় আমি কাউকে নমস্কার করতে পারছি না। আমার পিতৃদেব এখনও শায়িত।'

বগলাচরণ তাঁকে বললেন, 'আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

ছোটে মহারাজ খানিকটা দূরত্ব রেখে বসলেন। বগলাচরণ 'ক' মহারাজের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ক' মহারাজ বললেন, 'আমরা পূজ্যপাদ বাবার উইল শ্রবণ করেছি। আপনি তা পাঠ করুন।'

ছোটে মহারাজ বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি পাঠ করতে চাই না। সেই মানসিকতাও নেই। প্রয়োজনীয় যদি কিছু থাকে শুনলেই চলবে।'

'ক' মহারাজ বললেন, 'বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি মুখাগ্নি করবেন। কিন্তু আপনি কি আজ সকালে দীক্ষা নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। মেজ মহারাজ আমাকে পবিত্রতা দান করেছেন।'

'বেশ। এখন থেকে আপনি মহারাজ হিসেবে স্বীকৃত হলেন। বাবাই এই আদেশ দিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী বড় মহারাজ আবার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্ব নেবেন। মেজ মহারাজকেও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। অর্থকমিটি

এবং প্রশাসন কমিটির প্রধান আপনি। তাছাড়া তিনি আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন। এই পবিত্র সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আপনার ওপর। কারণ আপনিই আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করবেন।'

'ক' মহারাজের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজ মহারাজ বললেন, 'কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে বড় মহারাজ কয়েকটি অত্যন্ত মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন।'

'কি অভিযোগ ?' ছোটে মহারাজ তখন সমস্ত শরীরে কম্পন অনুভব করছেন।

'তুমি চরিত্রহীন, লম্পট। তোমার নিরুদ্দিষ্ট হওয়া এবং নানারকম গুজব আমাদের কানে আসায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত।' মেজ মহারাজ জানালেন।

'এসব আলোচনা মুখাগ্নির পরে করলে হয় না ?' ছোটে মহারাজ বললেন।

'না!' বড় মহারাজ মাথা নাড়লেন। তাঁর মুখে রক্ত জমেছিল।

'বেশ। অভিযোগকারীকে প্রমাণ করতে হবে আমার জীবন ওই খাতে বয়ে গিয়েছিল কিনা। প্রমাণিত হলে আপনারা যা বলবেন তা মান্য করব।'

বড় মহারাজ বললেন,'সুধাময় জানিয়েছিল তুমি একটি প্যান্টসার্ট পরা মেয়ের সঙ্গে বর্ধমান স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেছিলে। উত্তরবঙ্গে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ছিলে। তোমার কলকাতার ঘরে আমি মেয়েদের জিনিস পেয়েছি। আর কি প্রমাণ চাও ? অবিবাহিত জীবনে নারী-সংসর্গ করেছ তুমি, তোমার কোন অধিকার নেই।'

ছোটে মহারাজ হাসলেন, 'সুধাময় এখানে আছেন। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক তিনি বর্ধমানে আমার সঙ্গে কোন নারীকে দেখেছেন কিনা। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে সুধাময় গিয়েছিলেন। আমার জীবনযাত্রা তিনি দেখে এসেছেন। সেব্যাপারেও তিনিই সাক্ষী হতে পারেন। বাংলাদেশের গরীব মানুষ লাম্পট্য বরদাস্ত করতে পারে না। কোন লম্পটকে তারা দেবতা বলে ডাকতে পারে না।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'কলকাতার বাড়িতে মেয়েলি জিনিসপত্র ?'

'কে দেখেছেন ? বড় মহারাজ! ওগুলো তিনিই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। আপনারা কেউ নির্বোধ নন। কলকাতার বাড়ির চারতলায় কোন সিঁড়ি নেই। লিফটে ওঠা-নামা করতে হয়। নিচে সেবকরা দিনরাত পাহারায় থাকে। কোন নারী আমার ঘরে গেল লিফটে চড়ে আর কেউ তাকে দেখল না, এমন হাস্যকর অভিযোগ আপনারা শুনছেন কি করে ?'

'ছোটে, তুমি আমাকে অপমান করছ! তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়াচ্ছে।'

'না। অভিযুক্ত হওয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। এবার আমি মেজ মহারাজকে প্রশ্ন করব। আপনার কি মনে পড়ে, এক বৃদ্ধের সন্তানসম্ভবা কন্যার সঙ্গে আপনি বাবার খুব গরীব শিষ্যকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হতে আবদ্ধ করেছিলেন, যাজক পদ পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে ?' ছোটে মহারাজ সরাসরি প্রশ্ন করলেন। মেজ মহারাজের চোয়াল শক্ত হল, 'সেইসময় আমার অন্য কোন উপায় ছিল না।'

'কারণ ?'

'তা নাহলে আশ্রমের দুর্নাম বাড়তো।'

'আপনি কি খোঁজ নিয়েছিলেন মেয়েটির শরীরে সন্তান আসার জন্যে কে দায়ী?'

'না। আমার প্রবৃত্তি হয়নি। আমি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'আপনার বক্তব্য আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই লোকটি তার স্ত্রী ও সন্তানকে ত্যাগ করেছে। ওই বৃদ্ধ এসে বিলাপ করছে এখন। সে তার মেয়েকে সরল বিশ্বাসে এই আশ্রমের সেবিকা হতে পাঠিয়েছিল। আমি জানি না লম্পট ও চরিত্রহীনের সংজ্ঞা কি? আশ্রিত সেবিকাকে সন্তানসম্ভবা করাটা কি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? আপনারা কি বলেন?'

বড়মহারাজ অবাক হয়ে বললেন, 'এসব কি কথা? কে করেছে এ কাজ?'

ছোটে মহারাজ বললেন, 'ওঁকে এই প্রশ্ন করুন।'

বড় মহারাজ উন্মাদের মত বলে উঠলেন,'মিথ্যে কথা। আমার চরিত্রে নোংরা ছেটানো হচ্ছে। তুই ধ্বংস হবি।'

হঠাৎ একটি গলা চিৎকার করে উঠল, 'করেছে, করেছে।'

সবাই অবাক হয়ে ঘরের একটি বিশেষ কোণের দিকে তাকাল। সেখানে কাপড় ঢাকা অবস্থায় খাঁচায় বসে আছে আত্মারাম। একটা ছোট্ট ফাঁক দিয়ে সে এদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।বড় মহারাজ আক্রোশে ফেটে পড়লেন, 'চুপ কর হতভাগা!'

আত্মারাম ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'খচ্চর।'

ঘরে যেন বজ্রপাত হল। ছোটে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ পাখি কার?'

মেজো মহারাজ জবাব দিলেন, 'বড় মহারাজের। ওর নাম আত্মারাম।'

'আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া করুন।'

একজন মহারাজ উঠে আত্মারামকে খাঁচাশুদ্ধ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ছোটে মহারাজ বললেন, 'আমি কারো নামে নোংরা ছড়াচ্ছি না। সেই বৃদ্ধকে আমি অনেক কষ্টে শান্ত করেছি তাকে এখানে নিয়ে এলে প্রকৃত সত্য জানা যাবে। আপনি বিবাহিত, বাবার আশীর্বাদধন্য। কিন্তু লম্পট কে? আপনি না আমি? বড় মহারাজের চিবুক তখন বুকে এসে ঠেকেছে। আত্মহত্যার বাসনা জেগেছে তাঁর। ছোটে মহারাজ বললেন, 'নিজেদের মধ্যে বিভেদ ঘটুক, তা আমি চাই না। বাবার মৃত্যু যার জন্যে হয়েছে, তাকে আমি ছেড়ে দেব না। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। চলুন সবাই। ছোটে মহারাজের সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। বড় মহারাজ শুধু মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ছোটে মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হয়, আপনার এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। আর একটি হত্যাকাণ্ড কাম্য নয়। সেই বৃদ্ধ আপনাকে দেখলে আবার উন্মাদ হয়ে যেতে পারে।'

শব্দ আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। মুখাগ্নির আগেই ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। কেউ খুশি হল, কেউ বিস্মিত, কেউ সমালোচনা করল। কিন্তু প্রধান সচিব, রাজ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক ও পুলিশপ্রধানের উপস্থিতিতে মুখাগ্নি করলেন ছোটে মহারাজ। মুখাগ্নির সময় ভক্তশিষ্যরা বিলাপ শুরু করল। কলকাতায় আজ দাঙ্গা বেঁধে

গেছে খবর আসায় পুলিশ কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে মুখাগ্নির সময়। বাবা চাইতেন আশ্রমে যেন পুলিশ না প্রবেশ করে। মরদেহ ভস্মীভূত হওয়ামাত্র ছোটে মহারাজ জেলাশাসককে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে পুলিশ প্রত্যাহার করতে। সবাই যখন শোকে বিহ্বল তখন তিনি পূর্ণ মর্যাদায় প্রধান সচিব এবং কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে বাবার প্রতি শেষ সম্মান দেখানোর জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। ঘোষণা করা হল আগামীকাল দুপুর বারোটায় নবনির্বাচিত উত্তরাধিকারী ছোটে মহারাজ শিষ্যভক্তদের উদ্দেশে তাঁর বাণী দেবেন। দাহ শেষ হলেও আশ্রম–প্রাঙ্গণে বিলাপ বন্ধ হল না।

সুধাময় ভাবতে পারছিলেন না, একটি মানুষ রাতারাতি কতটা বদলে যেতে পারে! যে ব্যক্তিত্ব এবং নির্লিপ্ততা ছোটে মহারাজের আচার-আচরণে ফুটে উঠেছে তা তিনি গতকাল পর্যন্ত দ্যাখেননি। ক্ষমতার সিংহাসনে বসলে পরিবেশ কোন কোন মানুষকে নিজের মত তৈরি করে নেয়। এইসময়ে আনন্দভবনে সুধাময়ের ডাক পড়ল।

ছোটে মহারাজের সামনে তখন মহারাজরা উপস্থিত। শুধু বড় মহারাজকে দেখা যাচ্ছে না। খবর পাওয়া গিয়েছে, তিনি নীরবে আশ্রম ত্যাগ করেছেন। ছোটে মহারাজ বলছিলেন, 'বাবার আততায়ীকে খুঁজে বের করতেই হবে। তিনটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। এক প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় সংগঠন, দুই, রাজনৈতিক দল আর তিন নম্বর হল যার স্বার্থ ছিল। বড় মহারাজ আশ্রম থেকে কাউকে না বলে চলে গিয়েছেন। বাবার উইল আমি দেখলাম। তিনি লিখেছেন : যতদিন বড় মহারাজ সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকবেন ততদিন আশ্রমের আচার-অনুষ্ঠান পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি পাবেন। বৃদ্ধের কন্যার প্রতি ওই কাজ করে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে চলে গিয়ে তিনি শর্তভঙ্গ করেছেন। তাঁকে আর আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত রাখা সঠিক মনে করছি না। আশ্রম তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করছে। বাবার জীবদ্দশায় আশ্রমের কাজ যেমন চলছিল তেমন চলবে।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'কিন্তু বড় মহারাজের সেবার ইতিহাস মনে রেখে এতবড় শাস্তি না দিলে হয় না? লোকে গুজব রটাবে। তুমি ভেবে দ্যাখ।'

'পচে যাওয়া আলুর সঙ্গে টাটকা ফসল রাখার ঝুঁকি আমি নেব না। আমরা জনসাধারণের জন্যে নিবেদিত। ব্যক্তিবিশেষের মান রাখতে নয়। আর হ্যাঁ, আপনি আমার দীক্ষাগুরু। কিন্তু বাবার হয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। তাই মনে রাখবেন আপনারা বয়সে বড় হলেও পদমর্যাদার সম্মানে আমি আপনাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আশা করব। আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করবেন না। অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনারা। এবার বিশ্রাম করুন।' ছোটে মহারাজ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে বাবার ইজিচেয়ারের দিকে এগিয়েও মন পাল্টে পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। এইসময় সেবক এসে জানাল সুধাময় অপেক্ষা করছেন।

ঘরে ঢুকে সুধাময় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ছোটে মহারাজ বললেন, 'জয় বাবা।'

সুধাময় আপ্লুত স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'জয় বাবা।'

ছোটে মহারাজ সুধাময়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কি তুমি কলকাতায়

ফিরে যাবে?'

'যদি আজ্ঞা করেন—।'

'না। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি যদি আমাকে না নিয়ে আসতে, যদি সকালে দীক্ষা নেবার পরামর্শ না দিতে তাহলে—।'

'আপনি আসতে চাননি মহারাজ।'

'হ্যাঁ। নির্বোধের মত কাজ করেছিলাম। আমি তোমাকে আশ্রমে চাই। তোমার ব্যবসা তুলে দাও। আমার ব্যক্তিগত সচিব হয়ে কাজ করো।'

'আমি কৃতজ্ঞ।'

'আর সেইসঙ্গে ইউনিসকেও আমার দরকার। আশ্রমের রক্ষী ও সেবক বাহিনীর সে দায়িত্ব নেবে। তোমাদের দুজনকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

'অপরাধ না নিলে কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'ওই যে বললাম, কৃতজ্ঞতা। তাছাড়া আমার কাছাকাছি বিশ্বাসভাজন মানুষ চাই। ভক্ত শিষ্যদের, অচেনা মানুষদের আমি চট করে গ্রহণ করতে পারি না। এবার এসো। আমি বিশ্রাম নেব।'

ছোটে মহারাজ ইঙ্গিত করতেই আবার প্রণাম করে সুধাময় প্রফুল্লচিত্তে বেরিয়ে গেলেন। ছোটে মহারাজ হাসলেন, সাক্ষীদের কখনই নজরছাড়া করতে নেই।

এইসময় দুজন সেবিকা সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারা আদেশের জন্যে নম্রতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ছোটে মহারাজ তাদের দেখলেন। দুজনই যুবতী। একজন সুন্দরী।

'তোমরা এখানে কি করতে?'

'সেবা।'

'আমার সেবিকার প্রয়োজন নেই।'

সেবিকারা মাথা নিচু করল।

'তাই বলে তোমাদের চলে যেতে বলছি না। তোমাদের জন্যে অন্য কাজের ব্যবস্থা করতে আমি মেজ মহারাজকে বলব। আপাতত সরবৎ দিয়ে যাও।'

ট্রে থেকে গ্লাস তুলে নিতেই যুবতীরা চলে গেল। চেয়ারে বসে সরবতে মৃদু চুমুক দিতে লাগলেন ছোটে মহারাজ।

সকাল থেকেই উপাসনামন্দিরের সামনের মাঠে জনসমাগম হচ্ছিল। এগারটার মধ্যে সমস্ত স্থান ভরে গেল। কিন্তু কারো মুখে কোন শব্দ নেই। মহারাজরা অনুষ্ঠানমঞ্চের তদারকিতে ছিলেন। মেজ মহারাজ আনন্দভবনে গিয়ে অবাক হলেন। ছোটে মহারাজ গেরুয়া আলখাল্লা পরেছেন। কোমরে হলুদ কোমরবন্ধ। চেতনা ফিরে আসতেই তিনি নমস্কার করে বললেন, 'জয় বাবা।'

ছোটে মহারাজ উত্তর দিলেন, 'জয়বাবা।'

মেজ মহারাজ বললেন, 'মানুষজনে প্রাঙ্গণ ভরে গেছে।'

'কিন্তু এখনও বারোটা বাজতে বিলম্ব আছে। আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল। ভালই হল, হাতে কিছুক্ষণ সময় রয়েছে। আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলা কঠোরভাবে যাতে পালিত হয়, তা আপনি দেখবেন। আমার এখানে যেসব

pathagar.net

সেবিকা রয়েছে তাদের অন্য কাজে নিয়োগ করুন। 'ক' মহারাজকে দায়িত্ব দেবেন আচার-অনুষ্ঠান পালন করার। আর আশ্রম-সংবাদের সম্পাদকীয় এখন থেকে আমিই লিখব।'

'আদেশ মান্য হবে।'

'সুধাময়কে আমি আমার সচিব হিসেবে নির্বাচিত করেছি। সরকার এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সে আমার হয়ে যোগাযোগ করবে। সনাতননাথের সঙ্গে কোন আপোস নয়। কিন্তু প্রভু জনার্দন চক্রবর্তী ও আনন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আমি আলোচনায় বসতে চাই। এই দায়িত্ব আপনি নেবেন। শত্রুপক্ষে ভাঙন সৃষ্টি না করলে জয়লাভ দুরূহ হয়ে ওঠে।' মেজ মহারাজ বিহ্বল হয়ে পড়েন, 'আঃ। আমার আর সংশয় নেই। শেষবার তোমায় তুমি বলছি। তোমার যোগ্যতা তুমি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছ।'

ঠিক বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে মহারাজদের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন ছোটে মহারাজ। তাঁর পোশাক এবং আকৃতি দেখে একটা গুঞ্জন উঠল শুধু। মেজ-মহারাজ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ এই শোকের মুহূর্তে আমাদের একটা পবিত্র কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। পরমপূজণীয় বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ছোটে মহারাজ মনোনীত হয়েছেন। এখন থেকে তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন। ছোটে মহারাজ এবার আপনাদের বাণী দেবেন।'

ধীর পায়ে ছোটে মহারাজ মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। সবাই নির্বাক।

নম্র গলায় তিনি বললেন, 'আজ আমরা পিতৃহারা। তিনি নেই। বর্বর ঘাতক তাঁকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি আছেন। আমাদের কাছে, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে। আমাদের অস্তিত্বে। যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন কেউ তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। বাবা বলতেন ভগবান আছেন মানুষের কর্মে, যে কর্ম শুভফল প্রসব করে। অশুভের সঙ্গে থাকেন শয়তান। সেই শয়তানদের হাতেই বাবা নিহত হলেন। যীশুখ্রীস্টকে শয়তানরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। যীশু বেঁচে আছেন মানুষের মনে, মানুষের ভালবাসায়। আপনারা, যাঁরা বাবার সন্তান, আমার ভাই, অথবা বোন, এখন থেকে প্রতিদিনের বেঁচে থাকা সার্থক করে তুলুন বাবার নির্দেশিত পথে এগিয়ে গিয়ে।

গত রাত্রে মুখাগ্নির পর আমি যখন ক্লান্ত তখন আমার জন্মান্তরের দীক্ষা হয়ে গেল। সেই মধ্যরাত্রে বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি বিহ্বল। বাবা হেসে বললেন, 'জানিস না আত্মা অবিনশ্বর? আমার মরদেহ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু আমি রয়ে গেছি।' আমি কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাবা বললেন, 'অনেক কাজ বাকি আছে। আমি তোর মাধ্যমে সেই কাজগুলো শেষ করতে চাই।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কাজ? কি আমায় করতে হবে?' বাবা বললেন, 'মানুষকে ভালবাসা দিতে হবে। এদেশের মানুষের বড় কষ্ট।'

আমি বললাম, 'তোমাকে কে মেরেছে?'

তিনি হাসলেন, 'যারা চিরকাল মেরে থাকে। তুই এগিয়ে যা।' ব্যস। তিনি

চলে গেলেন। আমার চোখে আর তন্দ্রা এল না। তারপর থেকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আছেন বাতাসের মত। তিনি যদি আমাকে তাঁর মুখপাত্র করতে ইচ্ছে করেন তাহলে তার জন্যে যে গুণের ও শক্তির প্রয়োজন তিনিই তা জুটিয়ে দেবেন।'

ছোটে মহারাজ সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চুপ করলেন। এখনও তিনি মানুষের কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন না। ছোটে মহারাজ আবার কথা শুরু করলেন, 'সহস্র বছরের দাসত্বের জন্যে আমরা আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছি। নিজের গুরুত্ব অনুভব করার শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়নি। আমরা কখনই মহান জাতিতে পরিণত হতে পারব না যতক্ষণ না আমাদের ধর্মকে ভালবাসতে পারব, নিজের সমাজ আর দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করতে পারব। আমাদের জাগাতে হবে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে রাজনৈতিক সত্যজ্ঞানকে। ধর্ম কি? বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের জন্যে যে চেষ্টা তারই অন্য নাম ধর্ম। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযোগ এবং জ্ঞান, এসবই ওই চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

'কিন্তু আমি বিষ্ঠায় বাস করলে আমার মন বেশিক্ষণ ফুলের স্বপ্ন দেখতে পারে না। মানুষের জন্যে এমন একটা সমাজব্যবস্থা চাই, যেখানে প্রতিনিয়ত তাকে আত্মমর্যাদাহীন হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব? ধর্ম তো কর্ম ছাড়া নয়। শুধু অধ্যাত্মচিন্তা করলে তো আত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। এখন চারপাশে রাজনীতির বাহুবল এমনই প্রবল যে সহস্র বছরের দাসত্ব মাঝে মাঝেই ফিরে আসে। যাঁরা নেতা, তাঁরা দলের নেতা, মানুষের নেতা নন। তাঁরা রাজনীতির কথা বলেন, জননীতির ধারেকাছে যান না। এঁরা কারা? রাজনীতি বা নেতৃত্ব করার জন্যেই কি এঁদের জন্ম? একজন চিকিৎসক, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন কেরানি, একজন কৃষক সমাজকে যা দিচ্ছেন তা দেওয়ার যোগ্যতা এঁদের নেই। এঁরা শুধু দলের জোরে মোড়লি করে যাচ্ছেন। পাঁচ বছরের জন্যে ইজারা নিয়ে শুধু নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করছেন। আমরা মুসলমানদের দাস ছিলাম, ইংরেজদের গোলাম ছিলাম, এখন রাজনৈতিক দলগুলোর পুতুল হয়েছি। জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা ভারতের অবনতির প্রধান কারণ। যত রাজনীতিই করা যাক না কেন, তাতে কিছুই হবে না যতক্ষণ না জনগণের উপযুক্ত শিক্ষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই কাজ কারা করবে? আমি মনে করি, এই কাজ করতে পারে উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়। তাদের ভেতর থেকেই কর্মীদল আসবে। স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ধ্বংস হবেই। সাধারণ মানুষের মুক্তির যুগ আসছে। কেউ তার প্রতিরোধ করতে পারবে না। ধর্মের সঙ্গে সেই যুগের আত্মিক সম্পর্ক। ধর্মের মূল কথাটা মানুষকে বোঝাতে হবে। ধর্মের বাহ্যিক কতগুলো আচরণকে ধর্ম নাম দিয়ে ধর্মধ্বজীরা স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে বহুযুগ ধরে। সেই শোষকদের মানুষ বর্জন করবেই। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে মানুষকে আত্মানুসন্ধানে সাহায্য করার জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করলাম

আমি। বাবার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। বলুন সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে—'জয় বাবা।'

সঙ্গে সঙ্গে যে জয়ধ্বনি উঠল তা যেন আকাশ স্পর্শ করল। জয়ধ্বনি থামতে চাইছে না। এবং ক্রমশ সেই ধ্বনি পাল্টে যেতে লাগল। জনতা এখন বলছে 'জয় মহারাজ।'

আনন্দভবনের সাধনকক্ষে ছোটে মহারাজ পদ্মাসনে বসেছিলেন। এক ঘণ্টা মনঃসংযোগ করে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন সুধাময় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। পাশে মেজ মহারাজ। মেজ মহারাজ বললেন, 'আমি আপ্লুত।'

'সাধারণ মানুষ?'

'তারা একজন নেতাকে পেল যিনি তাদের ধর্ম ও সমাজচেতনা দান করবেন।'

ছোটে মহারাজ বললেন, 'এই আশ্রমের প্রতি যারা অনুগত তাদের নির্দেশ দিন যেন প্রতিমাসে তারা একদিন এমন কোন কাজ করে যাতে একজন নিঃস্ব মানুষের উপকার হয়। বাবা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কর্তব্য সেই চেষ্টা করে যাওয়া।'

মেজ মহারাজ বিদায় হবার পর সুধাময় বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা নিবেদনের ছিল।'

ছোটে মহারাজ লক্ষ করলেন, সভার পর থেকেই 'ছোটে' শব্দটি বর্জিত হয়েছে।

'বল।'

'তিনি দর্শন প্রার্থনা করছেন।'

'কে?'

'লাবণ্যদেবী।'

ছোটে মহারাজ চমকে উঠলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি চারপাশে তাকালেন। চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষের শ্রদ্ধাবনত মুখ এবং কানে তাদের দেওয়া জয়ধ্বনি বেজে উঠল। এখন কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া মানে মানুষের সন্দেহের শিকার হওয়া। বিশেষ করে বড় মহারাজ যত দূরেই যান তাঁর অনুগতরা নিশ্চয়ই এখানে রয়ে গেছেন।

ছোটে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার পোশাক?'

'একই। প্যান্ট-সার্ট?'

'বেশ। তাকে জানাও আমার সাক্ষাৎ পেতে হলে বাঙালি নারীর পোশাকে আসতে হবে। যা ওর কাছে সুবিধেজনক তা সাধারণ মানুষের প্রিয় নাও হতে পারে।'

সুধাময় বেরিয়ে গেলেন। ছোটে মহারাজ অস্থির হয়ে উঠলেন। লাবণ্য কেন এল? ও কি তাকে ওই প্রশ্ন করবে সেই রাত্রে যার উত্তর দেওয়া হয়নি? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি তার কি জবাব দেবেন? ছোটে মহারাজ জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এখান থেকে সামনের চাতাল স্পষ্ট দেখা যায়। সুধাময় ও লাবণ্য কথা বলছে। লাবণ্যকে আরও কৃশ আরও মলিন দেখাচ্ছে। মাথা নাড়ল লাবণ্য। একবার ওপরের দিকে তাকাল। না, সে দেখতে পায়নি তাঁকে।

pathagar.net

তারপর ধীর পায়ে চলে যেতে লাগল ফটকের দিকে। ছোটে মহারাজের বুকের ভেতর একটা বাষ্প জন্মাচ্ছিল। তিনি আশা করছিলেন লাবণ্য নিশ্চয়ই আর একবার পিছু ফিরে তাকাবে। লাবণ্য তাকাল না।

—

pathagar.net

OTHER REALEASES

1.AGNEOGIRIR PETER MODHYE
2.AMADER SADA BARI
3.PROTHOM PROHOR
4.SADHA SIDHE KOTHA